Peace কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে

রমযানের ৬০ শিক্ষা

৩০ ফতোয়া

http://islamiboi.tk

সূচিপত্র

১. রমযানের ইতিহাস ও বিভিন্ন নবীদের রোযা

২. রমযানের ৬০ শিক্ষা

http://islamiboi.tk

http://islamiboi.tk

http://islamiboi.tk

http://islamiboi.tk

http://islamiboi.tk

http://islamiboi.tk

http://islamiboi.tk

১. রমযানের ইতিহাস ও বিভিন্ন সময় নবীদের রোযা যেমন ছিল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ -

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের ওপর। (বুখারী ও মুসলিম)

তন্মধ্যে একটি রমাযানের সিয়াম। আরবি সিয়াম শব্দের যথার্থ ভাব প্রকাশক শব্দ বাংলা নেই। যদিও কেউ কৃচ্ছসাধনায় ও উপবাস প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সিয়ামের ভাব প্রকাশ করে। সিয়ামের প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসী ভাষাতে রোযা শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যদিও তা সিয়ামের সঠিক ভাব প্রকাশক শব্দ নয়। রোযা শব্দ দ্বারা সিয়ামের প্রকৃতভাব প্রকাশ পাক বা না পাক, বাংলার মুসলিমগণ রোযা শব্দটি দ্বারা সিয়ামকেই বোঝে। কিন্তু সিয়াম বললে বেশীর ভাগ লোকই বুঝতে পারেন না যে, এটি আরবি একটি পরিভাষা। তাই আমি সিয়ামের বদলে রোযা শব্দটিরই বাধ্য হয়ে ব্যবহার করছি।

আরবি সিয়াম শব্দের শাব্দিক অর্থ বিরত হওয়া এবং শরীয়তের পরিভাষায় সিয়াম হল কতিপয় বিশেষ শর্তসাক্ষেপে বিশেষ বিষয় হতে নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষভাবে বিরত থাকা। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২)

এ রোযা কবে থেকে চালু হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ পাওয়া খুবই মুশকিল। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো যেমন তোমাদের

পূর্বেকার লোকদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর রোযা ফরয ছিল।

১. আদম (আ)-এর রোযা

কোনো কোনো সুফী বলেছেন যে, আদম (আ) যখন নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন এবং তারপর তাওবা করেছিলেন তখন ৩০ দিন পর্যন্ত তার তাওবা কবুল হয়নি যতক্ষণ তার দেহে ঐ ফলের কিছু অংশ ছিল। অত:পর তাঁর দেহ যখন তা থেকে পাক পবিত্র হয়ে যায় তখন তাঁর তাওবা কবূল হয়। তারপর তাঁর সন্তানদের ওপরে ৩০টি রোযা ফরয করে দেয়া হয়। হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, একথা প্রমাণে সনদ নেই। এর কোনো দলীল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

(ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০২-১০৩ পৃষ্ঠা)

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রোযা কে রেখেছিলেন– এ বিষয়ে সাধক শিরোমনি শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (র) বর্ণনা করেছেন, যির ইবনে হুবাইশ (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে আইয়্যামে বীয (চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলে) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম (আ)-কে একটি ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আদম (আ) সেই ফল খেয়ে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নেমে আসতে বাধ্য হন। সে সময় তাঁর শরীরের রং কালো হয়ে যায়। ফলে তাঁর এ দুর্দশা দেখে ফেরেশতাগণ কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আদম তোমার প্রিয় সৃষ্টি!!! তুমি তাঁকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলে, আমাদের দ্বারা তাকে সিজদাও করালে, আর একটি মাত্র ভুলের জন্য তার দেহের রং কালো করে দিলে? তাদের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আদম (আ)-এর কাছে এ ওহী প্রেরন করলেন, তুমি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখ। আদম (আ) তাই করলেন। ফলে তার দেহের রং আবার উজ্জ্বল হল। এ জন্যই এ তিনটি দিনকে আইয়্যামে বীয বা উজ্জ্বল দিন বলে। (গুনইয়াতুত-ত-লিবীন, বাংলা অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭)

আব্দুল কাদির জিলানী (র) উক্ত বিষয়টির প্রমাণে কোনো হাদীস বা তফসীরের উদ্ধৃতি দেননি। কাজেই বিষয়টি কতটা সত্য তা চিন্তা সাপেক্ষ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ও সফরে আইয়্যামে বীযে কখনো সিয়াম না করে থাকতেন না। (নাসায়ী, মিশকাত ১৮০ পৃষ্ঠা)

২. নূহ (আ)-এর রোযা

আদম (আ)-এর পর নূহ (আ)-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়। এ যুগেও সিয়াম ছিল। কারণ, নবী করীম ﷺ বলেন নূহ (আ) ইয়াওমুল ফিতর ও ইয়াওমুল আযহা ছাড়া গোটা বছর রোযা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ ১২৪ পৃষ্ঠা)

মুআয, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আতা, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত, নূহ (আ)-এর যুগ থেকে প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা ছিল। পরিশেষে রমযানের এক মাস সিয়ামের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা রহিত করে দেন। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৪)

ইবনে কাসীর (র)-এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, নূহ (আ)-এর যুগ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগ পর্যন্ত রমযানের রোজা ফরয হবার আগে কমপক্ষে তিনটি করে সিয়াম ফরয ছিল।

৩. ইবরাহীম (আ) ও বিভিন্ন জাতির রোযা

নূহ (আ)-এর পর নামকরা নবী ছিলেন ইবরাহীম (আ)। তাঁর যুগে ক'টা রোযা ছিল তার কোন বর্ণনা আমি পাইনি। ইবরাহীম (আ)-এর যুগে ৩০টি সিয়াম ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু তারা কোনো প্রমাণ দেননি। সে জন্য আমরা ঐসব লেখকদের উপরে আস্থা রাখতে পারিনি। ইবরাহীম (আ)-এর কিছু পরের যুগ বৈদিক যুগ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বেদের অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত অর্থাৎ উপবাস ছিল। প্রত্যেক হিন্দী মাসের ১১ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর 'একাদশীর' উপবাস রয়েছে। এ হিসেবে তাদের উপবাস ২৪টি হয়। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবারে উপবাস করেন। কখনো কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০ দিন পানাহার ছেড়ে চল্লিশে ব্রত পালন করেন।

হিন্দুদের মত জৈনরাও উপবাস রাখেন। তাদের মতে সুদীর্ঘ ৪০ দিন ধরে একটি করে উপবাস হয়। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের জৈনরা কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতি বছরে একটি করে উপবাস রাখেন। প্রাচীন মিসরীয়রাও উপবাস করতো। গ্রীস দেশে কেবল মেয়েরা থিমসোফিয়ার ৩রা তারিখে উপবাস করতো। ফার্সীদের ধর্মগ্রন্থের একটি শ্লোক দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের ধর্মেও উপবাস ছিল। বিশেষ করে তাদের ধর্মগুরুদের জন্য পাঁচ সালা উপবাস আবশ্যক ছিল।

(ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকা ১০ম খণ্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা, সীরাতুন নাবী ৫ম খণ্ড ২৮৬ পৃষ্ঠা)

ইবরাহীম (আ)-এর পর কিতাবধারী প্রসিদ্ধ নবী মূসা(আ) তাঁর যুগেও সিয়াম ছিল। আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মদীনায় (হিজরত করে) এসে ইয়াহূদীদেরকে আশুরার দিনে (মুহাররম চাঁদের ১০ তারিখ) রোযা অবস্থায় পেলেন। তাই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমরা কিসের রোযা করছো? তারা বলল, এটা সেই মহান দিন যেদিনে মহান আল্লাহ মূসা (আ)-ও তাঁর কওমকে মুক্ত করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বরূপ মূসা (আ) ঐদিনে রোযা রেখেছিলেন। তাই আমরা আজকে ঐ রোযা করছি। (বুখারী , মুসলিম, মিশকাত ১৮০ পৃষ্ঠা)

ব্যাবিলনে বন্দী যুগে শোক ও মাতম প্রকাশের জন্য ইয়াহূদীরা রোযা রাখতো। কেউ বিপদের সম্ভাবনা থাকলে কিংবা কোনো গণকের ইলহাম ও নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রস্তুতিকল্পেও রোযা রাখতো। যখন তারা মনে করত যে, আল্লাহ তাদের প্রতি নারায হয়ে গেছেন তখন ও তারা রোযা রাখতো। দেশের প্রতি যখন কোন মহামারী ও বিপদ আসতো কিংবা দুর্ভিক্ষ দেখা দিত অথবা বাদশাহ কোন বড় অভিযানে বের হতেন তখনও রোযা রাখতো। এ সব সিয়ামের সংখ্যা ছিল পঁচিশ। বছরের ১লা তারিখে অনেক ইয়াহূদীদের মধ্যে রোযার প্রচলন আছে। ইয়াহূদীদের রোযা সূর্যোদয়ের সময় থেকে আরম্ভ করে রাতে প্রথম তারকা উদয় পর্যন্ত চলতো। কাফফারা বা শরয়ী জরিমানার রোযার নিয়ম অবশ্য আলাদা। মে মাসের ৯ম তারিখে ইয়াহূদীরা রোযা রাখে। এ রোযা সন্ধ্যা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। সাধারণ রোযার জন্য তাদের বিশেষ কোনো বিধি-বিধান নেই। অর্থাৎ এদিনে গোশত ও মদ পান নিষিদ্ধ। (জিউশ ইনসাইক্লোপেডিয়া দ্রষ্টব্য)।

উপরের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, মূসা (আ)-এর যুগে এবং তার আগে ও পরে ইয়াহুদীদের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল।

৪. দাউদ (আ)-এর রোযা

মূসা (আ)-এর আসমানী কিতাবধারী বিখ্যাত নবী ছিলেন দাউদ (আ)। তাঁর যুগেও রোযার প্রচলন ছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোযা দাউদ (আ)-এর রোযা। তিনি (আ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিনা রোযায় থাকতেন।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড ২৫০ পৃষ্ঠা, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ দাউদ (আ) অর্ধেক বছর রোযা রাখতেন এবং অর্ধেক বছর বিনা রোযায় থাকতেন।

৫. ঈসা (আ)-এর রোযা

দাউদ (আ)-এর পর আসমানী কিতাবধারী বিশিষ্ট নবী হলেন ঈসা (আ)। তাঁর যুগে এবং তার জন্মের আগেও রোযার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনে আছে, ঈসা (আ)-এর যখন জন্ম হয় তখন জনগণ তাঁর মা মারইয়ামকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন–

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا .

আমি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে মানতের রোযা রেখেছি। আজকে আমি কোনো মানুষের সাথে মোটেই কথা বলব না। (সূরা মারইয়াম ১৯ : ২৬)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ) রোযা রাখতেন।

ঈসা (আ) জঙ্গলে বা বনে ৪০ দিন রোযা রেখেছিলেন। একদা ঈসা (আ) -কে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করে যে, আমরা অপবিত্র আত্মাকে কি করে বের করব? জবাবে তিনি বলেন, তা দুআ ও রোযা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না। (সীরাতুন নাবী ৫ম খণ্ড ২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা)

সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদভী লিখেছেন, মূসা (আ)-এর যুগে যে রোযা ফরযের পর্যায়ে ছিল ঈসা (আ) নিজে রোযার কোন বিধিনিষেধ দিয়ে যাননি। তিনি শুধু সিয়ামের নীতি ও কিছু নিয়ম বর্ণনা করেন এবং তার ব্যাখ্যা ও সমন্বয়ের ভার গির্জাওয়ালাদের ওপর ছেড়ে দেন। খৃষ্টীয় ২য় শতক থেকে ৫ম শতকের মধ্যে খৃষ্টানদের রোযার নিয়মকানুন তৈরির অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে ইস্টার এর পূর্বে দুটি দিন রোযার জন্য নির্দিষ্ট হয়। উক্ত দু'টি সিয়ামই অর্ধেক রাতে শেষ হত। ঐ দিনে যারা অসুখে থাকতো তারা শনিবারে রোযা রাখতে পারতো।

খৃষ্টীয় ৩য় শতকে রোযার দিন নির্দিষ্ট করা হয়। তখন ইফতারের সময় নিয়ে মতভেদ ছিল। কেউ মোরগ ডাক দিলে ইফতার করতো, আবার কেউ অন্ধকার খুব ছেয়ে গেলে রোযা ভাঙ্গতো। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক পর্যন্ত ৪০টা রোযার খোঁজ পাওয়া যায়। রোমকদের সিয়াম, আলেকজান্দ্রিয়া লাসানদের গির্জাগুলো রোযার দিন নির্দিষ্ট করে। কিন্তু রোযার নিয়মাবলী ও বিধিনিষেধ রোযাদার ব্যক্তির বিবেক ও দায়িত্বানুভূতির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। অবশ্য ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, প্রথম এলিজাবেথের যুগে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট রোযার দিনগুলোতে গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা এর কারণ দর্শান যে, মাছ শিকার ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিষয়ে উপকৃত হওয়া একান্ত দরকার।

(ইলমী ইন্তেখাব ডাইজেস্ট, রমাযান সংখ্যা -৫৯-৬২ পৃষ্ঠা)

৬. জাহিলী যুগে আরবদের রোযা

ঈসা (আ)-এর পর শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর যুগ। তাঁর নবী হবার আগে আরবের মুশরিকদের মধ্যেও রোযার প্রচলন ছিল।

যেমন আয়েশা (রা) বলেন–

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ـ

আশুরার দিনে কুরাইশরা জাহিলী যুগে রোযা রাখতো এবং নবী করীম ﷺ জাহিলী যুগে ঐ রোযা রাখতেন। অত:পর যখন তিনি মদীনায় আসেন তখনও ঐ রোযা নিজে রাখেন এবং (সাহাবীদেরকে) রোযা রাখার আদেশ দেন। পরিশেষে রমযানের রোযা যখন ফরয হয় তখন তিনি আশুরার রোযা ছেড়ে দেন।

(মুসলিম ১১২৫, বুখারী ১৫৯২, তিরমিযী ৭৫৩, আবু দাউদ ২৪৪২, ইবনে মাজাহ ১৭৩৩)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্য রোযা প্রচলন ছিল। জাহিলী যুগে মক্কার কাফিরদের রোযা রাখা সম্বন্ধে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম মতে আশুরার দিনে কাবাগৃহে নতুন গিলাফ ছড়ানো হতে। তাই আরবরা ঐদিনে রোযা রাখতো। (মুসনাদ আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৪ পৃষ্ঠা)

অন্য মতে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, একদা এ রোযার বিষয়ে ইকরিমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কুরাইশরা একবার কোন গুনাহ করে। অতপর তাদের মনে ঐ পাপটা খুব বড় মনে হয়। তখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আশুরার রোযা রাখ তাহলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড-২৪৬ পৃষ্ঠা)

উপরিউক্ত সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, রমযানের একমাস রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মক্কার কাফির, মদীনার ইয়াহুদী, রোমের খৃষ্টান, ভারতের হিন্দু ও জৈন, গ্রীসের গ্রীক পৃথিবীর অন্যান্য প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল। অতপর ঐসব সিয়াম সাধনাকারী জাতির প্রতি ইঙ্গিত করে উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর রমযানের রোযা ফরয করা হল। যেমন তোমাদের পূর্বের লোকদের ওপর তা ফরয করা হয়েছিল। (সূরা আল-বাকারা ২ : ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের লোকদের ওপরও রোযা ফরয ছিল। কিন্তু পূর্বেকার লোকদের ওপর কোন রোযা ফরয ছিল সে সম্পর্কে কুরআনে কোনো উল্লেখ নেই। হাদীস বা ইতিহাস দ্বারাও জানা যায় না যে, আদম (আ), নূহ (আ), ইবরাহীম (আ) প্রমুখদের ওপর কোন রোযাটি ফরয ছিল। এ বিষয়ে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, সালাফরা এ বিষয়ে একমত নন যে, রমযানের সিয়াম ফরয হবার পূর্বে লোকদের ওপর কোনো রোযা ফরয ছিল কি না? জমহুর (অধিকাংশ আলিম) ও শাফিঈদের প্রসিদ্ধ মত এই যে, রমযানের পূর্বে কোনো সিয়ামই কখনো ওয়াজিব বা অপরিহার্য ছিল না। হানাফীদের মত, সর্বপ্রথম আশুরার রোযা ফরয ছিল। অত:পর রমাযানের রোযা ফরয হলে আশুরার রোযা রহিত হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে ১৩ শতকের মুজাদ্দিদ ইমাম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (র) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে প্রত্যেক মাসে ৩টি সিয়াম এবং আশুরার রোযা ওয়াজিব ছিল। তারপর রমাযানের রোযা ফরয হবার কারণে ঐ সিয়াম রহিত হয়ে যায়। ইমাম বুখারী তদীয় তারীখে এবং তাবারাণী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেন, খৃষ্টানদের ওপর রমাযানের একমাস রোযা ফরয ছিল। অত:পর তাদের এক বাদশাহ অসুখে পড়ে। তখন তারা বলে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি একে আরোগ্য দান করেন তাহলে আমরা আরো ১০টি রোযা অবশ্যই বাড়িয়ে দেব। তারপর তাদের আরেক বাদশাহ গোশত খেলে তার মুখে খুব ব্যথা হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি আমাকে রোগমুক্ত করেন তাহলে আমি ৭টা রোযা নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেব। এরপর এক বাদশা এসে বললেন এ ৩টি রমযান ছাড়া হবে না। ৫০টি পুরো করে দেব এবং আমরা আমাদের সিয়াম বসন্তকালে করব। অতপর তিনি তাই করেন। ফলে ৫০টি রোযা পূর্ণ হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী-১ম খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আবু সউদ (র) বলেন, বর্ণিত আছে রমাযানের সিয়াম ইয়াহুদী ও নাসারা উভয়ের ওপরে ফরয ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা সব রোযা বাদ দিয়ে গোটা বছরের যে কোন ১টি দিনে রোযা রাখতে থাকে। তারা মনে করে যে, ঐদিন ফিরআউন ডুবে মরেছিল। এ বিষয়ে তারা মিথ্যাবাদী। কারণ, ঐ দিনটি ছিল আশুরার দিন, বছরে যে কোন ১টি দিন নয়। আর খৃষ্টানরা রমযানে রোযা পালন করতে থাকে। অত:পর তাদের একবার রমযানে প্রচণ্ড ক্ষুধা পায়। ফলে তাদের আলিমরা গ্রীষ্ম

ও শীতের মাঝখানে একটি ঋতুতে ঐ সিয়ামকে সীমাবদ্ধ করতে একমত হয়। অতপর তারা ওকে বসন্তকালে রেখে দেয় এবং সেই সাথে আরো ১০টি সিয়াম বাড়িয়ে দেয় তাদের ঐ মনগড়া কার্যকলাপের কাফফারা হিসেবে। তারপর তাদের এক বাদশাহ্ অসুখে পড়ে কিংবা তাদের মধ্যে দুটি মৃত্যু সংঘটিত হয় তখন তারা আরো ১০টি রোযা বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে ৫০টি সিয়াম হয়ে যায়।

(তাফসীর আবুস সউদ-১ম খণ্ড-৪৬৪পৃষ্ঠা)

ইমাম রাযী (র) বলেন, তাদের এক বাদশাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মানত করে ৭টি রোযা বাড়ান। তারপর আর এ বাদশাহ বলেন এ ৩টির কী হল। তাই ৫০টি পুরো করে দেন। এ বর্ণনাটি হাসান থেকে বর্ণিত।

(তাফসীরে কাবীর ২য় খণ্ড, ১১৩ খণ্ড)

ইবনে আবু হাতিম হতে ইবনে উমার (রা) মারফু'ভাবে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উম্মাতে মুহাম্মাদীর পূর্বে অন্যান্য উম্মাতদের ওপরে রমাযানের রোযা ফরয করেছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনার সনদে একজন রাবী মজহুল বা অজ্ঞাত পরিচয় আছেন। (ইরশা-দুস সা-রী ৩য় খণ্ড-৩৩১ পৃষ্ঠা) সুতরাং বর্ণনাটি নির্ভরযোগ্য নয়।

হাসান বাসরী (র) বলেন, আগের উম্মাতদের ওপরেও পুরো একমাস রোযা ফরয ছিল। (তাফসীর ইবনে কাসীর-১ম খণ্ড-২১৪ পৃষ্ঠা)

যা হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে অন্যান্য নবীর উম্মতের ওপরে রমযানের সিয়াম ফরয থাক বা না থাক আমাদের ওপর রমযানের একমাস রোযা ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ (রমাযান) মাস পাবে সে যেন অবশ্যই সিয়াম সাধনা করে।" (সূরা বাকারাহ : আয়াত-১৮৫)

৭. ইসলামে রোযা

দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তার পরের মাস রমযান থেকে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার ফরয সিয়াম চালু হয়। ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, যখন রোযার নির্দেশ প্রথম চালু হয় তখন আমাদের সিয়ামের নির্দেশ খৃষ্টানদের মতই ছিল। (তাফসীরে তাবারী-২য় খণ্ড, ৭৩ পৃষ্ঠা)

বুখারী, আবু দাঊদ ও নাসায়ী প্রভৃতিতে বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের বাদ ইফতার করার পর পানাহার ও স্ত্রী সহবাস এশা পর্যন্ত জায়েয ছিল। যদি কেউ তারও পূর্বে ঘুমিয়ে পড়তো তাহলে তার ওপর খাওয়া দাওয়া ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আর পানাহার করতে পারত না। ঐ রাত ও পরের দিন না খেয়ে সিয়াম অবস্থায় কাটিয়ে মাগরিবের সময় তার জন্য পানাহার হালাল হত। এমন পরিস্থিতিতে কায়স ইবনে সিরমাহ আনসারী (রা) একবার সিয়াম অবস্থায় দিন ভর চাষের কাজ করে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরেন। অত:পর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি? তিনি বললেন, না। তবে আমি যাই এবং কিছু খুঁজে আনি। তাঁর স্ত্রী গেলেন। এদিকে তাঁর চোখ লেগে যায়। ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

অত:পর স্ত্রী এসে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে আফসোস করতে লাগলেন। এভাবে গোটা রাত ও পরের দিন না খেয়ে থাকা যায় কি? তাই পরের দিন দুপুর বেলায় তিনি বেহুশ হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ দেয়া হল। এদিকে এ কাহিনী ঘটল আবার অন্যদিকে উমর (রা) এক রাতে ঘুমাবার পরও স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেন। অত:পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দু:খ ও আক্ষেপ করে নিজের ভুলের কথা শোনালেন। ফলে সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۔

রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ জায়েয করা হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অত:পর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং অপরাধ ক্ষমা করলেন।

কাজেই এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পার এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। (সূরা বাকারা ২ : ১৮৭)

ফলে মাগরিব থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য জায়েয করে দেয়া হয়। এ জন্য সাহাবীরা অত্যন্ত খুশী হলেন।
(তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা -২১৫)

মোটকথা, আদম (আ) থেকে ঈসা (আ) পর্যন্ত সমস্ত উম্মাতের জন্য সিয়ামের যে নির্দেশ ছিল সে নির্দেশই উম্মাতে মুহাম্মদীকে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ উম্মাতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেহেরবানী করে পূর্ববর্তী উম্মাতদের সিয়ামের তুলনায় নির্দেশ সহজ করে দিয়েছেন। তথাপি এ উম্মাত যদি রমাযান মাস পেয়ে নিজের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে ধন্য না হতে পারে তাহলে তাদের চেয়ে অভাগা আর কে আছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সিয়াম পালন করে সত্যিকার পরহেযগার-মুত্তাকী হবার তাওফীক দিন-আমীন।

৮. রোযা শব্দের বিশ্লেষণ

আমাদের দেশে রোযা বলতে মানুষেরা যা বোঝেন তার আরবি প্রতিশব্দ সিয়াম। আরবি সিয়াম শব্দের শাব্দিক অর্থ কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকা, চাই তা পানাহার হোক কিংবা কথাবার্তা অথবা চলাফেরা । তাই তো ঘোড়া খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে তাকে খায়লে সায়েম বলে।
(মুফরাদাতে ইমাম রাগেব, ২য় খণ্ড-২৯৯ পৃষ্ঠা)

রমাযান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম মুসলিম নারী ও পুরুষকে সুবহে সাদিক (কাক ভোর) থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পানাহার ও যৌনসম্ভোগ, এবং অশ্লীল ও গর্হিত প্রভৃতি কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকতে হয় বলে ঐ বিশেষ বিরতির নাম দেয়া হয়েছে রোযা বা রমযান। (ফাতহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, ১০২ পৃ.)

রমযানের এগুরুত্বের কারণেই সাহাবায়ে কিরাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকেও রোযা রাখার অভ্যাস করাতেন। যেমন রুবাইয়্যি বিনতে মুআয (রা) বলেন, আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতাম এবং তাদের জন্য খেলনা রাখতাম। অত:পর তাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার জন্য কাঁদতে তখন আমরা তাকে ওটা দিতাম। পরিশেষে ইফতারের সময় হয়ে যেত। (বুখারী হা: ২৬৩ পৃষ্ঠা)

তথ্য সূত্র : সিয়াম ও রমাযান, হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী,

২. রমযানের ৬০ শিক্ষা

শিক্ষা-১

রমযানের পূর্বে সাওমের নিষেধাজ্ঞা

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

অর্থ : তোমাদের কেউ যেন একদিন বা দু'দিনের সাওমের মাধ্যমে রমযানকে এগিয়ে না আনে, তবে কারো যদি পূর্বের অভ্যাস থাকে, তাহলে সে ঐ দিন সাওম রাখবে। (বুখারী হা: নং ১৮১৫, মুসলিম হা: নং ১০৮২)

তিরমিযী শরীফে হাদীসটি এভাবে এসেছে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَاتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ بِيَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يُوَافِقَ ذٰلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ اَحَدُكُمْ .

অর্থ : তোমরা একদিন দু'দিনের মাধ্যমে (রমযান) মাস এগোবে না, তবে সেদিন যদি সাওমের দিন হয়, যা তোমাদের কেউ পালন করত....।

শিক্ষা ও মাসায়েল ৭টি

১. রমযানের সতর্কতার জন্য তার পূর্বে সাওমের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন : হাদীসের অর্থ তোমরা সাওমের মাধ্যমে রমযানের সতর্কতার নিয়তে রমযানকে এগিয়ে আনবে না।

(ফাতহুল বারি-৪/১২৮)

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : "আহলে ইলমের আমল এ হাদীস মোতাবেক। তারা রমযান মাস আসার আগে রমযান হিসেবে সওম পালন

করা পছন্দ করতেন না। হ্যাঁ কেউ যদি পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট দিন সাওম পালন করে, আর সেদিন রমযানের আগের দিন হয়, তবে এতে তাদের নিকট কোন সমস্যা নেই।" (সুনানে তিরমিযী-৬৮৪)

২. রমযানের পূর্বে (রমযানের সাথে লাগিয়ে) নফল সওম রাখা নিষেধ।
(ফাতহুল বারি : ৪/১২৮)

৩. এদিন যার সওমের দিন, সে এ থেকে ব্যতিক্রম, যেমন কাফফারা বা মান্নতের সওম এবং যার এ দিন নফল সওমের অভ্যাস রয়েছে, যেমন সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

৪. এ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সবচেয়ে' যৌক্তিক যে হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, রমযানের সওম শরয়ী চাঁদ দেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যে শরয়ীভাবে চাঁদ দেখার এক বা দু'দিন আগে সওম রাখল সে শরিয়তের চাঁদ দেখার সাথে সওম সম্পৃক্ত করা হয়েছে বিধায় তা সে প্রত্যাখ্যান করল।
(ফাতহুল বারি : ৪/১২৮)

৫. এ হাদীসে 'রাফেযি' সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ রয়েছে, যারা চাঁদ না দেখে সওম পালন বৈধ বলে। (ফাতহুল বারি : ৪/১২৮)

৬. এ হাদীস থেকে জানা গেল, নফল ও ফরয ইবাদতের মাঝে প্রাচীর ও বিরতি রয়েছে, যেমন শাবানের নফল ও রমযানের ফরযের বিরতি সন্দেহের দিন সওম পালন করা হারাম। অনুরূপ রমযানের শেষ ও শাওয়ালের প্রথম দিন তথা ঈদের দিন সওম পালন করা হারাম। ইবনে আব্বাস (রা) একদল সলফ ফরয ও নফল সালাতের মাঝে বিরতি সৃষ্টি করা মুস্তাহাব বলেছেন, যেমন কথাবার্তা বলা বা নড়াচড়া করা বা সালাতের স্থানে আগ-পিছ হওয়া। (আল-ইস্তেযকার-৩/৩৬৭১)

৭. শরীয়ত আকঁড়ে ধরা ওয়াজিব, তাতে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা বৈধ নয়, কারণ তা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি অথবা দ্বীন থেকে বিচ্যুতির আলামত। সতর্কতামূলক রমযানের আগে রমযানের নিয়তে সওমের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

শিক্ষা-২

মাসের শুরু-শেষ নির্ধারণ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা রমযান প্রসঙ্গে বলেন-

لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوا الْهِلاَلَ، وَلا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ـ

অর্থ : তোমরা সওম রাখবে না যতক্ষণ না হেলাল (নতুন চাঁদ) দেখ, আর সওম ছাড়বে না যতক্ষণ না তা দেখ, আর যদি তোমাদের থেকে তা অদৃশ্য হয়, তাহলে মাস পূর্ণ কর।

বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে-

إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهٗ ـ

অর্থ : তোমরা তা (নতুন চাঁদ) দেখে সওম পালন কর, আর যখন তোমরা তা দেখ সাওম ভঙ্গ কর, যদি তা তোমাদের থেকে আড়াল হয়, তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। (বুখারী, হা: ১৮০৭, দ্বিতীয় হাদীস বুখারী, হা : ১৮০১ ও মুসলিম, হা: ১০৮০)

জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন : যদি ঊনত্রিশ তারিখ চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে **ত্রিশ** দিন পূর্ণ করবে। (শারহুন নববী আলা মুসলিম : ৭/১৮৬)

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে-

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهٗ ثَلاَثِيْنَ ـ

অর্থ : যদি চাঁদ তোমাদের থেকে আড়াল হয়, তাহলে তার ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।" **অপর** বর্ণনায় এসেছে; "ত্রিশ দিন গণনা কর।" অপর বর্ণনায় এসেছে : "সংখ্যা পূর্ণ কর।" এসব বর্ণনা মুসলিমে রয়েছে।

(দেখুন : সহীহ মুসলিম, হা : ১০৮০-১০৮১)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوْا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا۔

অর্থ : যখন তোমরা চাঁদ দেখ সওম পালন কর, আবার যখন তোমরা চাঁদ দেখ সওম ত্যাগ কর। যদি তা তোমাদের থেকে আড়াল হয়, তাহলে ত্রিশ দিন সিয়াম পালন কর।

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ۔

অপর বর্ণনায় আছে : "তোমরা চাঁদ দেখে সওম রাখ ও চাঁদ দেখে সওম ত্যাগ কর, যদি তোমাদের থেকে আড়াল হয়, তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ۔

অপর বর্ণনায় আছে : যদি তা তোমাদের থেকে লুকিয়ে থাকে, তাহলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। (বুখারী-১৮১০, মুসলিম, হা: ১০৮১)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَتَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ۔

অর্থ : লোকেরা চাঁদ দেখছিল, আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ সংবাদ দিলাম, আমি চাঁদ দেখেছি, অত:পর তিনি সওম পালন করেন ও লোকদের সওম পালনের নির্দেশ দেন। (আবু দাউদ : ২৩৪৩, দারামি : ১৬৯১, দারাকুতনি; ২/১৫৬, বায়হাকি: ৪/২১২, তাবরানি ফিল আওসাত; ৩৮৭৭, ইবনে হিব্বান, ৩৪৪৭ ও হাকেম: ১/৫৮৮৫)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. রমযানের সওম শরয়ী চাঁদ দেখার ওমর নির্ভরশীল। যদি মেঘ, ধুলো, ধুঁয়া ইত্যাদি চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়, তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২. যদি মেঘ বা ধুলো ইত্যাদির কারণে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে সতর্কতাস্বরূপ শাবানের শেষ দিন সওম রাখবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ

নিষেধ করেছেন : চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম পালন কর না। আর নিষেধাজ্ঞার দাবি হচ্ছে হারাম।

৩. চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সওম ওয়াজিব তারপর জ্যোতিষ্ক ও গণকদের কথায় কর্ণপাত করা যাবে না। (শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ : ৫/১৭৮)

৪. ইসলামি শরিয়তের সরলতার প্রমাণ যে, সওম রাখা ও ত্যাগ করা চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল করেছে, যার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, দৃষ্টিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি তা দেখতে পায়, পক্ষান্তরে যদি তা নক্ষত্রের ওপর নির্ভরশীল করা হতো, তাহলে অনেক জায়গায় মুসলিমের নিকট চাঁদের বিষয়টি কঠিন আকার ধারণ করত, যেখানে গণক ও জ্যোতিষ্ক অনুপস্থিত।

(শারহু ইবনে বাত্তাল আলাল বুখারী : ৪/২৭)

৫. যে দেশে চাঁদ দেখা গেল, তার অধিবাসীদের ওপর সওম ওয়াজিব। যে দেশে চাঁদ দেখা যায়নি, তার অধিবাসীদের ওপর সওম ওয়াজিব নয়, কারণ সওমের সম্পর্ক চাঁদ দেখার সাথে, দ্বিতীয়ত চাঁদের কক্ষপথ বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন। (দেখুন : শারহু ইবনুল মুলাক্কিন : ৫/১৮১-১৮২)

৬. রমযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন বিশ্বস্ত (শরীয়তের ভাষায় আদেল) ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, যার প্রমাণ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস। কিন্তু রমযান সমাপ্তির সংবাদের জন্য দু'জন নির্ভরযোগ্য লোকের সাক্ষ্য অপরিহার্য। একাধিক হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত।

(তিরমিযী (রহ.) তার জামে তিরমিযীতে : ৩/৭৪ -এর বলেছেন)

"সওম ত্যাগ করার বিষয়ে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য অপরিহার্য, এতে কোন আলেমের দ্বিমত নেই।" ইমাম নববী শারহু মুসলিমে বলেছেন : অর্থাৎ কতক মুসলিমের চাঁদ দেখা যথেষ্ট, সবার দেখা জরুরি নয়, তবে কমপক্ষে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষী অবশ্য জরুরি। বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী সওমের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিন্তু সওম ভঙ্গের ক্ষেত্রে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সাক্ষ্য ব্যতীত চাঁদ দেখা গ্রহণ করা যাবে না। (মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায-১৫/৬২)

৭ যিনি দেশের প্রধান তিনি সওম বা ঈদের ঘোষণা দিবেন। (বুলুগুল মারাম, আবু কুতাইবাহ ফিরইয়াবির টিকাসহ : ১/৪১২, আরো দেখুন : ফাতওয়া সাদিয়া)

৮. যে চাঁদ দেখে তার দায়িত্ব দেশের প্রধান বা তার প্রতিনিধির নিকট সংবাদ পৌছে দেয়া।

৯. আধুনিক প্রচার যন্ত্র থেকে প্রচারিত রমযান শুরু বা সমাপ্তির সংবাদ বিশ্বাস করা জরুরি, যদি তা দেশের প্রধান বা তার প্রতিনিধি থেকে প্রচার করা হয়।

১০. মাসের শুরু-শেষ জানার জন্য ত্রিশে শাবান ও ত্রিশে রমযানের চাঁদ দেখা মুস্তাহাব।

১১. নারী যদি চাঁদ দেখে, তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। শায়খ ইবনে বায (র) তার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ না করার অভিমত প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ চাঁদ দেখা পুরুষদের বৈশিষ্ট্য, এ ব্যাপারে তারা নারীদের থেকে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। (ইবনে ওমর (রা) হাদীসের ওপর ভিত্তি করে যারা চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল করা বৈধ বলেন, তারা এ ব্যাপারে নারী ও গোলামের সংবাদ গ্রহণযোগ্য মনে করেন, যেমন খাত্তাবি আবু দাউদের টিকা মাআলেমুস সুনানে উল্লেখ করেছেন : ২/৭৫৩)

শিক্ষা-৩

সওম ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর ওপর রাখা হয়েছে; এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ সম্পাদন করা ও রমযানের সওম পালন করা।

(বুখারী : হা: ৮, মুসলিম: হা: ১৬)

আবু জামরাহ নসর ইবনে ইমরান (র) বলেন : একদা আমি ইবনে আব্বাস (রা) ও শ্রোতাদের মাঝে দোভাষীর কাজ করছিলাম। তিনি বললেন : আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি গ্রুপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন, তিনি তাদের বলেন, কোন গ্রুপ বা কোন সম্প্রদায়ের লোক? তারা বলল : আমরা রাবিয়াহ গোত্রের। তিনি বললেন : স্বাগতম প্রতিনিধি গ্রুপ বা স্বাগতম রাবিয়াহ

সম্প্রদায়, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা মুক্ত। তারা বলল : আমরা আপনার নিকট আগমন করি অনেক দূর থেকে। আপনার ও আমাদের মাঝে রয়েছে মুদার গোত্রের কাফেরদের এ গ্রাম, এ জন্য হারাম তথা সম্মানিত ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস ব্যতীত আপনার কাছে আমরা আসতে পারি না। অতএব আমাদেরকে উপদেশ দিন, যা আমরা আমাদের রেখে আসা ভাইদের নিকট পৌঁছাব এবং যার ওপর আমল করে আমরা সকলে জান্নাতে যাব। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন চারটি বিষয়ের : নির্দেশ দিলেন এক আল্লাহর ওপর ঈমানের। তিনি বললেন : তোমরা কি জান আল্লাহর ওপর ঈমান কি? তারা বলল : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন–

شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَاِقَامُ الصَّلاَةِ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ .... قَالَ : احْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مِنْ وَرَاءَكُمْ ـ

অর্থ : এ কথা স্বীকার করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সওম পালন করা ও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ দান করা .... তিনি বললেন : এগুলো মনে রাখ ও তোমাদের রেখে আসা ভাইদের বল। (বুখারী : ৮৭, মুসলিম : ১৬)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৫টি

১. ঈমান ও ইসলামের বর্ণনা, অর্থাৎ ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি আর ইসলাম হচ্ছে আত্মসমর্পণ ও বাহ্যিক আনুগত্য। ঈমান ও ইসলাম একসঙ্গে উল্লেখ হলে এ অর্থ প্রকাশ করে, যদি আলাদা উল্লেখ হয়, তখন একে অপরের অর্থ প্রকাশ করে।

২. মূলত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য দেয়া, তবে ইসলামের মৌলিক আমল হিসেবে সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্ব তার সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৩. এ পাঁচটি রোকন বা তার আংশিক ত্যাগ করা আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

৪. ইসলামে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই সিয়ামকে তার রোকন স্থির করা হয়েছে।

৫. দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জানা জরুরি। ওয়াজিবের ওপর আমল করা, হারাম থেকে বিরত থাকা এবং মানুষের নিকট দ্বীন পৌঁছে দেয়া, যেমন নবী করীম ﷺ তাদেরকে বলেছেন: তোমরা এগুলো মনে রাখ ও তোমাদের রেখে আসা ভাইদের নিকট পৌঁছে দাও।

(দেখুন : ইমাম নববী কর্তৃক মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ১/১৪৮)

শিক্ষা-৪
রমযানের ফযিলত

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

অর্থ : যখন রমযান মাস আগমন করে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

(বুখারী: হা: ১৮০০, মুসলিম: হা: ১০৭৯)

অপর বর্ণনায় আছে–

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ : أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ : أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

অর্থ : যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, শয়তান ও অবাধ্য জ্বীনগুলো শৃঙ্খলিত. করা হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করা হয়। খোলা হয় না তার কোন দ্বার, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় : বন্ধ করা হয় না তার কোনো তোরণ এবং একজন ঘোষক ঘোষণা করে; হে পুণ্যের অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! ক্ষান্ত হও। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত

অনেক বান্দা, এটা প্রত্যেক রাতে হয়।" (তিরমিযী হা: ৬৮২, ইবনে মাজাহ : হা: ১৬৪২, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, হা: ১৮৮৩, সহীহ ইবনে হিব্বান :হা: ৩৪৪৩৫, হাকেম, হা: ১/৫৮২), তিনি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ বলেছেন। আলবানী সহীহ জামে তিরমিযীতে এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

হাদীসে বর্ণিত: হে পুণ্যের অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী! ক্ষান্ত হও।' হে কল্যাণ অনুসন্ধানকারী! তুমি আরো কল্যাণ অনুসন্ধান কর। এটা তোমার মুখ্য সময়, এতে অল্প আমলে তোমাকে অধিক প্রদান করা হবে। আর হে মন্দের প্রত্যাশী! তুমি ক্ষান্ত হও, তওবা কর, এটা তাওবা করার উপযুক্ত সময়।

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবিদের সুসংবাদ প্রদান করে বলেছেন–

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ۔

অর্থ : তোমাদের নিকট বরকতময় মাস রমযান এসেছে, আল্লাহ এর সওম ফরয করেছেন। এতে জান্নাতের দ্বারসমূহ খোলা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, শিকলে বেঁধে রাখা হয় শয়তানকে। এতে একটি রজনী রয়েছে যা সহস্র মাস থেকে উত্তম। যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো, সে প্রকৃত অর্থে বঞ্চিত হলো। (নাসায়ি : হা: ৪/১২৯, আহমদ : হা: ২/২৩০, আব্দু ইবনে হুমাইদ : হা: ১৪২৯)

আবু হুরায়রা অথবা আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ لِلّٰهِ عُتَقَاءَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔

প্রত্যেক দিনে ও রাতে আল্লাহর মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে দোয়া কবুলের মহান প্রতিশ্রুতি।

(আহমদ, হা: ২/২৫৪, তাবরানি ফিল আওসাত : ৬/২৫৭, বিশুদ্ধ সনদে)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

অর্থ : প্রত্যেক ইফতারের সময় আল্লাহর মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা রয়েছে আর তা প্রত্যেক রাতে। (ইবনে মাজাহ, হা: ১৬৪৩, আলবানি সহীহ ইবনে মাজায় হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলেছেন)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৫টি

১. রযমান মাসের ফযীলত এই যে, এতে জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় ও শয়তানগুলো শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। রমযানের প্রত্যেক রাতে তা সংঘটিত হয়, শেষ রমযান পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

২. এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্ট দু'টি বস্তু, এগুলোর দরজাসমূহ প্রকৃত অর্থে খোলা ও বন্ধ করা হয়।

(দেখুন : শারহু ইবনে বাত্তাল : ৪/২০, আল-মুফহিম: ৩/১৩৬)

৩. ফযীলতপূর্ণ মৌসুম ও তাতে সম্পাদিত আমল আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ ও যে কারণে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা ও জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়।

৪. রমযানের সুসংবাদ প্রদান ও তার শুভেচ্ছা বিনিময় বৈধ। কারণ সাহাবীদের সুসংবাদ প্রদান ও তাদেরকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য নবী করীম ﷺ রমযানের এসব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতেন। অনুরূপ প্রত্যেক কল্যাণের সুসংবাদ প্রদান বৈধ।

৫. অবাধ্য শয়তানগুলো এ মাসে আবদ্ধ করা হয়, ফলে তাদের প্রভাব কমে যায় ও মানুষ অধিক নেক আমল করার সুযোগ পায়।

৬. বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের সিয়াম হিফাজত করেন, তাদের থেকে অবাধ্য শয়তানের প্রভাব দূর করেন, যেন সে তাদের ইবাদত বিনষ্ট করার সুযোগ না পায়। (জাখিরাতুল উকবা : ২০/২৫৫)

৭. এসব হাদীস থেকে শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে। তাদের শরীর রয়েছে যা শিকলে বাঁধা যায়। তাদের কতিপয় অবাধ্য, রমযানে যাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। (যাখিরাতুল উকবা : ২০/২৫৫)

৮. রযমানের বিশেষ মর্যাদা সেসব মু'মিনগণ অর্জন করবে, যারা এর যথাযথ মর্যাদা দেয় ও এতে আল্লাহর বিধান পালন করে। পক্ষান্তরে কাফের, যারা এতে পানাহার করে, এর কোনো মর্যাদা দেয় না, তাদের জন্য জাহান্নাতের দরজাসমূহ খোলা ও জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় না। তাদের শয়তানগুলো বন্দি করা হয় না, তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির যোগ্য নয়। (দেখুন : ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম : ৫/১৩১-৪৭৪), অতএব এ মাসে তাদের মৃতরা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে না।

৯. যে মুসলিম কাফেরদের সঙ্গে মিল রাখল, যেমন রমযানের মূল্য দিল না, এতে পানাহার করল, সওম ভঙ্গের কাজ করল, অথবা সওমের সওয়াব হ্রাসকারী কর্মে লিপ্ত হল, যেমন গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও এসব বৈঠকে উপস্থিত হওয়া, বলা যায় সে রমযানের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে, তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হবে না, তার শয়তানগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে না।

১০. সূরায়ে 'সাদ' এর ৫০নং আয়াতে জান্নাতের প্রশংসায় বলা হয়েছে–

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ .

অর্থ : চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দরজাসমূহ থাকবে তাদের জন্য উন্মুক্ত। (সূরা সাদ : ৫০)এ আয়াত রমযানের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত নয়, কারণ এ আয়াত জান্নাতের দরজাসমূহ সর্বদা উন্মুক্ত থাকার দাবি করে না। (দ্বিতীয়ত এ আয়াত কিয়ামতের দিন সম্পর্কে। অনুরূপ জাহান্নাম সম্পর্কে সূরায়ে জুমারের ৭১ নং আয়াত–

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا.

অর্থ : অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। (সূরা যুমার : ৭১) হতে পারে এর পূর্বে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ থাকবে। (যাখিরাতুল উকবা : ২০/২৫৩)

১১. লাইলাতুল কদর ফযীলতপূর্ণ। এ রাত লাইলাতুল কদর বিহীন হাজার মাস থেকে উত্তম। এ রাতের বরকত থেকে যে বঞ্চিত হলো, সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।

১২. রমযানের প্রত্যেক রাতে আল্লাহর মুক্ত করা কতিপয় বান্দা থাকে। যারা

আল্লাহর মহব্বত, সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয়ে সওম রাখে, সওম হিফাজত করে, কিয়াম করে, ইহসানের প্রতি যত্নশীল থাকে ও অধিক নেক আমল অর্জন করে, তারা মুক্তির বেশি হকদার।

১৩. জাহান্নাম থেকে মুক্ত এসব বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া কবুলের ওয়াদা রয়েছে। তারা দু'টি কল্যাণ লাভ করেছে– জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি।

১৪. মুসলিমদের উচিত সওয়াব বিনষ্ট বা হ্রাসকারী কর্ম থেকে সওম হিফাজত করা, যেমন চোখ কান ও জবান সংরক্ষণ করা, তাহলে ইনশাআল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ মিলবে।

১৫. সওম পালনকারীর উচিত পরিমাণে অধিক দোয়া করা, কারণ রোযাদার ব্যক্তির দোয়া কবুলের সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা–৫

ফরজ রোযার নিয়ত

হাফসা বিনতে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

অর্থ : যে ফজরের পূর্বে সওমের নিয়ত করল না, তার সওম নেই।

ইমাম নাসায়ী এভাবে বর্ণনা করেছেন–

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ .

অর্থ: ফজরের পূর্বে রাত থেকে সওম আরম্ভ করল না, তার সওম নেই। (আবু দাউদ-২৪৫৪, তিরমিযী-৭৩০, নাসায়ী : হা: ৪/১৯৬, ইবনে মাজাহ : ১৭০০, আহমদ-৬/২৮৭, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ : হা: ১৯৩৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলতেন–

لاَ يَصُوْمُ اِلاَّ مَنْ اَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ .

অর্থ : সওম রাখবে না, তবে যে ফজরের পূর্ব থেকে সওম আরম্ভ করেছে।

(মুয়াত্তা মালেক : ১/২৮৮)

রাত থেকে সওম আরম্ভ করার অর্থ হচ্ছে : রাত থেকে সওমের দৃঢ় ও চূড়ান্ত নিয়ত করা, যে ফজরের পূর্বে সওমের দৃঢ় নিয়ত করল না তার সওম হবে না।
(তুহফাতুল আহওয়াযি : ৩/৩৫২)

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : আলেমদের নিকট এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে : রমযান মাসে ফজরের পূর্বে যে সওম আরম্ভ করল না, অথবা রমযানের কাযা অথবা মান্নতের সওমে যে রাত থেকে নিয়ত করল না, তার সওম শুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ, নফল সওমের নিয়ত ভোর হওয়ার পর বৈধ। এটা ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত। (জামে তিরমিযী : ৩/১০৮)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৪টি

১. রোযার জন্য নিয়ত করা জরুরি, যদি কেউ স্বাস্থ্য রক্ষা, ডাক্তারের পরামর্শ, পানাহারের প্রতি অনীহা বা অন্য কারণে খাদ্য ও স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকে, তার এ বিরত থাকা শরয়ি সওম গণ্য হবে না, সে এ কারণে সওয়াব পাবে না।

২. নিয়ত অন্তরের আমল, অতএব যার অন্তরে এ ধারণা হলো যে, আগামীকাল সে সওম রাখবে, সে নিয়ত করল।

৩. ওয়াজিব সওম যেমন রমযান, মানত ও কাফফারার ক্ষেত্রে পূর্ব দিন তথা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সওমের নিয়তে থাকা জরুরি। যে ব্যক্তি দিনের কোনো অংশে সওমের নিয়ত করল, তার সওম পূর্ণ দিন ব্যাপী হলো না, তাই তার সওম শুদ্ধ হবে না। এ জন্য ওয়াজিব সওমে, সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে নিয়ত করা জরুরি।

৪. রাতের যে কোনো অংশে ফরয বা নফল সওমের নিয়ত করা বৈধ। নিয়ত করার পর সওম পরিপন্থী কোনো কাজ করলে নিয়ত নষ্ট হবে না, নতুন নিয়তের প্রয়োজন নেই।

শিক্ষা-৬

রোযার আদব

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ. فَاِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ : اِنِّىْ صَائِمٌ. اِنِّىْ صَائِمٌ .

অর্থ : সিয়াম ঢাল স্বরূপ, সুতরাং তোমাদের কেউ সিয়াম অবস্থায় হলে সে যেন অশ্লীলতা ও মূর্খতা পরিহার করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয়, সে যেন বলে আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

(উল্লেখিত শব্দ মুয়াত্তা মালেক থেকে নেয়া : ১/৩১০, বুখারী : হা: ১৭৯৫, মুসলিম : হা: ১১৫১)

অপর বর্ণনায় এসেছে–

وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُؤٌ صَائِمٌ.

অর্থ : তোমাদের কারো যখন সওমের দিন হয়, সে যেন অশ্লীলতা ও শোরগোল পরিহার করে, কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সাথে মারামারি করে, সে যেন বলে, আমি রোযাদার। (বুখারী : হা-১৮০৫, মুসলিম হা-১১৫১)

অপর বর্ণনায় এসেছে :

لَا تَسُبُّ وَاَنْتَ صَائِمٌ وَاِنْ سَابَّكَ اَحَدٌ فَقُلْ : اِنِّىْ صَائِمٌ وَاِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ

অর্থ : সওম অবস্থায় তুমি গালি দেবে না, যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় তাহলে তাকে বল, আমি রোযাদার। আর যদি তুমি দণ্ডায়মান থাক, বসে যাও। (নাসায়ি ফিল কুবরা : হা: ৩২৫৯, তায়ালিসি : হা: ২৩৬৭, ইবনে খুযাইমাহ : হা : ১৯৯৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন –

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ -

অর্থ : যে মিথ্যা কথা ও তদানুরূপ কাজ এবং মূর্খতা পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী : হা: ৫৭১০), আবু দাউদ : হা: ৩২৬২), নাসায়ি ফিল কুবরা : হাদীস ৩২৪৫-৩২৪৮, তিরমিযী: হাদীস ৭০৭)

আয়েশা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلاَ يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ، وَاِنِ امْرُؤٌ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَشْتُمْهُ، وَلْيَقُلْ : اِنِّىْ صَائِمٌ -

অর্থ : সিয়াম জাহান্নামের ঢাল স্বরূপ, যে সওম অবস্থায় ভোর করল, সে যেন সেদিন মূর্খতার আচরণ না করে। কেউ যদি তার সাথে দুর্ব্যবহার করে, সে তাকে তিরস্কার করবে না, গালি দেবে না, বরং বলবে : আমি রোযাদার। (নাসায়ি : হাদীস : ৪/১৬৭, তাবরানি ফিল আওয়াত : ৪১৭৯), আলবানী সহীহ্ নাসায়িতে হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত :

أَنَّهُ كَانَ وَأَصْحَابُهُ إِذَا صَامُوْا قَعَدُوْا فِى الْمَسْجِدِ، وَقَالُوْا : نُطَهِّرُ صِيَامَنَا .

অর্থ : তিনি ও তার সাথীগণ যখন সিয়াম পালন করতেন, মসজিদে বসে থাকতেন, আর বলতেন, আমাদের সওম পবিত্র করছি।

(আহমদ ফিয যুহদ : ১৭৮, আবু নুয়াইম ফিল হিলইয়াহ : ১/৩৮২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. সিয়াম জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়, কারণ সে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, আর জাহান্নাম প্রবৃত্তি দ্বারা আবৃত।

২. রোযাদারের জন্য রাফাস হারাম, রাফাস হচ্ছে অশ্লীল কথা, শব্দটি কখনো সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের অর্থে ব্যবহার হয়।

(ফাতহুল বারি : ৪/১০৪)

এসব থেকে রোযাদার বিরত থাকবে, তবে যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম, তার জন্য চুম্বন ও স্ত্রীর সাথে মেলামেশা বৈধ।

৩. রোযাদারের জন্য মূর্খতাপূর্ণ আচরণ হারাম, যেমন চিৎকার ও শোরগোল করা, অথবা ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি।

৪. রোযাদার যদি কারো গালমন্দ, চিৎকার ও ঝগড়ার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার করণীয় :

ক. গালমন্দকারীকে অনুরূপ প্রতিউত্তর করবে না, বরং ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করবে।

খ. তার সাথে কথা পরিহার করবে, যেন সে মূর্খতার সুযোগ না পায়।

কতক বর্ণনায় এসেছে–

وَإِنْ شَتَمَهُ إِنْسَانٌ فَلَا يُكَلِّمْهُ .

অর্থ : যদি কেউ তাকে গালি দেয়, তার সাথে কথা বলবে না।

(ফাতহুল বারি : (৪/১০৪)

গ. তাকে বলবে : আমি রোযাদার। উচ্চস্বরে বলবে, যেন সে মূর্খতা থেকে বিরত থাকে ও প্রতিউত্তর না করার কারণ বুঝতে পারে। ফরয-নফল সওমের ক্ষেত্রে অনুরূপ করবে। (এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।)

ঘ. যদি সে বিরত না হয়, তবে বারবার বলবে : আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

ঙ. এ পরিস্থিতিতে যদি সে দাঁড়ানো থাকে, বসার সুযোগ হলে বসে যাবে, যেরূপ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, যেন গোস্বা নিবারণ হয়, প্রতিপক্ষ ও শয়তান পিছু হটে।

৫. এ সকল হাদীস থেকে এ কথা বুঝে নেয়ার অবকাশ নেই যে, অশ্লীলতা, গালিগালাজ, মূর্খতার আচরণ, অসার ও অযথা বিতর্ক শুধু সওম অবস্থায় নিষেধ, অন্য সময় নয়, বরং সর্বাবস্থায় এগুলো নিষেধ ও হারাম, তবে সওম অবস্থায় এগুলোতে লিপ্ত হওয়া জঘন্য অন্যায়, কারণ এসব সওমের মূল উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে। (আল-মুফহিম : ৩/২১৪, ফাতহুল বারি : ৪/১০৪)

৬. ইসলামি জীবন-দর্শনের পবিত্রতা, তার অনুসারীদের ভদ্র আচরণ শিক্ষা দেয়া ও মূর্খদের এড়িয়ে চলার অভিনব কৌশল।

৭ যদি রোযাদারের ওপর কেউ জুলুম করে, তাহলে সহজতর উপায়ে তার প্রতিকার করবে, এ থেকে রোযাদারের নিষেধ করা হয়নি।

(ফাতহুল বারি-৪/১০৫)

৮. সত্যিকারের সিয়াম পাপ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সিয়াম, মিথ্যা ও অশ্লীলতা থেকে মুখের সিয়াম, পানাহার থেকে পেটের সিয়াম, স্ত্রীসহবাস ও যৌনতা থেকে লিঙ্গের সিয়াম। (দেখুন : আহাদিসুস সিয়াম, আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান-৭৫)

৯. অধিকাংশ আলেম একমত যে, গীবত, পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, মূর্খতাপূর্ণ আচরণ ইত্যাদি কাজগুলো সিয়াম ভঙ্গ করে না, তবে তার সওয়াব অবশ্যই হ্রাস করে, এ জন্য সে গুনাহগার হবে।

(ফাতহুল বারি : ৪/১০৪, উমদাতুল কারি: ১০/২৭৬)

اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْاَضْحٰى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ۔

অর্থ : ইফতার, যেদিন মানুষ ইফতার করে, কুরবানি, যেদিন মানুষ কুরবানি করে। (তিরমিযী-৮০২; তিনি বলেছেন, এ সনদে হাদীসটি হাসান, গরিব ও সহীহ। ইসহাক-১১৭২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৪টি

১. এ হাদীস ইসলামী শরীয়তের সৌন্দর্য ও সহজতার প্রমাণ বহন করে, মানুষ যা করতে পারবে না, তার ওপর তা চাপিয়ে দেয়া হয়নি। ইবাদতের সময় নির্ধারণ সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি তথা চোখে দেখার ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

২. ইসলামী শরীয়ত একতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে, যেমন সে মুসলিমদেরকে এক সাথে সওম রাখা, ভঙ্গ করা ও একসাথে ঈদ উৎযাপনের নির্দেশ দিয়েছে।

৩. চাঁদ দেখার শরয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করা, অথবা চাঁদ দেখায় বাঁধার কারণে ত্রিশ দিন পূর্ণ করার পর যদি মাসের শুরু-শেষ ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। হাফেয ইবনে আব্দুল-বার (র) বলেন : “ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে যদি যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার ভুলের কারণে দশ তারিখে ওকুফে আরাফা করে তবে তা যথেষ্ট হবে। তদ্রূপ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। আল্লাহই ভালো জানেন। (আত-তামহিদ : ১৪/২৫৬, শায়খ ইবনে বায (র) বলেছেন : “শরয়ীভাবে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে যদি মানুষ ভুল করে, তাহলে তারা সওয়াব পাবে ও পুরস্কৃত হবে।” আজমু ফাতাওয়া ও রাসায়েল : ১৫/১৩৩)

৪. এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদ হওয়ার জন্য সবার এক হওয়া জরুরী। যদি কেউ একা ঈদের চাঁদ দেখে তার জন্য জরুরি সবার সাথে ঈদ করা। সে সবার সাথে সওম রাখবে, ভঙ্গ করবে ও কুরবানী করবে। ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন : এ থেকে প্রমাণিত হয় একা চাঁদ প্রত্যক্ষকারীর ওপর চাঁদ দেখার বিধান বর্তায় না, সওম রাখা ও ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে সে অন্যদের মতো।” (তাহযিবুস সুনান-৬/৩১৭)

   এ থেকে বলা যায়, কেউ যদি একা চাঁদ দেখে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ সে একা সওম রাখবে না, বরং মানুষের সাথে সওম রাখবে। তার বিধান অন্যান্য মানুষের ন্যায়, এ হাদীস থেকে তাই বুঝা যায় আসে।

   (দেখুন : ফাতাওয়া সাদিয়াহ: ২১৬, মাজমু ফাতাওয়া ও রাসায়েল : ১৫/৭২-৭৩)

শিক্ষা-৮

রোযাদারের গোসল ও শীতলতা অর্জন করা

আশেয়া (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ يَغْدُوْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষ করতেন নাপাক অবস্থায়, অতপর গোসল করে মসজিদে যেতেন, তখনো তার মাথা থেকে পানি টপকাত, অতঃপর সেদিনের সওম পালন করতেন। (আহমদ; ৬/৯৯, নাসায়ি ফিল কুবরা : ২৯৮৬, আবু ইয়ালা : ৪৭০৮, বায্‌যার ১৫৫২, তায়ালিসি : ১৫০৩, তার সনদ সহীহ, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে আছে অন্য শব্দে।)

আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান নবী করীম ﷺ-এর সম্পর্কে জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন–

لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ.

আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ আরজ নামক স্থানে দেখেছি, তিনি রোযা অবস্থায় মাথায় পানি দিচ্ছেন, পিপাসার কারণে অথবা গরমের কারণে। (আবু দাউদ : ২৩৬৫), আহমদ : ৩/৪৭৫, মুআত্তা মালেক : ১/২৯৪, তার থেকে মুসনাদে শাফি; ১/১৫৭, হাকেম : ১/৫৯৮, হাদীসটি সহীহ বলেছেন ইবনে আব্দুল বারর ফিত তামহিদ : ২২/৪৭, হাফেয ফি তাগলিকিত তালিক: ৩/১৫৩, আইনি ফি উমদাতিল কারি: ১১/১১, আলবানি ফি সহীহ আবু দাউদ।)

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইবনে উমর (রা) সওম অবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে গায়ে রেখেছেন। ইমাম শাবি রোযা অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "সওম অবস্থায় রান্নার ডেগ চেখে বা কোনো বস্তুর স্বাদ পরীক্ষা করা দোষের নয়।" হাসান (র) বলেন : রোযাদারের কুলি ও শীতলতা অর্জন দোষের নয়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : যখন তোমাদের কারো সওমের

দিন হয়, সে যেন সকালে তেল দেয় ও চিরুনি করে।" আনাস (রা) বলেন : আমার ছোট একটি হাউজ আছে, তাতে আমি সাওম অবস্থায় ডুব দেই।" (বুখারী, ২/৬৮১, দেখুন তাগলিকুত তালিক: ৩/১৫১)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৭টি

১. রোযাদারের জন্য জায়েয আছে গরম বা তৃষ্ণা হালকা করার জন্য পুরো শরীর বা কোনো অংশে পানি দেয়া, এটা ওয়াজিব গোসল, অথবা মুস্তাহাব গোসল অথবা বিনা প্রয়োজনে হতে পারে। (আউনুল মাবুদ-৬/৩৫২)

২. রোযাদারের জন্য পানিতে ডুবে থাকা বৈধ, তবে সতর্ক থাকবে পেটে যেন পানি প্রবেশ না করে। (মিরকাতুল মাফাতিহ্-৪/৪৪১)

৩. ইবাদতকারীর কষ্ট হলে বৈধ উপায়ে তা লাঘব করা দোষের নয়, এটাকে অধৈর্য গণ্য করা হবে না, এর থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়।

৪. মানুষ দুর্বল ও অপারগ হলে, তার উচিত কষ্ট দূর করার জন্য বৈধ উপায় গ্রহণ করা।

৫. সওম অবস্থায় গোসলখানায় গরম পানি ব্যবহার করা বৈধ, অনুরূপ সুগন্ধি ও তৈল ব্যবহার করা, চিরুনি করা বৈধ, ঘ্রাণ জাতীয় বস্তুর কারণে রোযা নষ্ট হয় না, এগুলো রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়।

৬. রোযাদারের ঠাণ্ডা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য হাউজ, ট্যাংকি, পুকুর ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে, এ কারণে সওম নষ্ট হবে না।

৭. প্রয়োজনে বাবুর্চি খানার স্বাদ পরীক্ষা করতে পারবে, তবে তা যেন পেটে প্রবেশ না করে। ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমার কাছে পছন্দনীয় হলো সওম অবস্থায় খাবারের স্বাদ পরীক্ষা না করা, তবে কেউ তা করলে সমস্যা নেই। (ফতওয়া লাজনা দায়েমা: ফাতাওয়া নং ৯৮৪৫, শায়খ উসাইমিন "ফাতাওয়া আরকানুল ইসলামে" তিনি অনুরূপ ফাতাওয়া দিয়েছেন, ফাতাওয়া নং ৪৮৪)

সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া পরিষদ রোযা অবস্থায় খাবারের স্বাদ চেখে দেখা জায়েয ফতোয়া দিয়েছে । (আল-মুগনি : ৩/১৯)

শিক্ষা-৯

সিয়াম ফরযের ধাপসমূহ

বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের অভ্যাস ছিল, তাদের সিয়াম শেষে যখন খাবার উপস্থিত হতো, আর তারা খানা না খেয়ে যদি ঘুমিয়ে যেতেন, তাহলে সে রাত ও পরবর্তী দিনে তারা খেতেন না। কাইস ইবনে সিরমা আল-আনসারি (রা) সওম শেষে খানার সময় স্ত্রীর কাছে বললেন : তোমার নিকট খাবার আছে? উত্তরে স্ত্রী বলল : নেই, তবে আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করছি। সে ছিল দিনের কর্মক্লান্ত, তার দু'চোখে ঘুম এসে গেল। তার স্ত্রী এসে তাকে দেখে বলল : আফসোস আপনি বঞ্চিত হলেন। পরদিন যখন দুপুর হলো, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। নবী করীম ﷺ-কে বিষয়টি অবগত করানো হলো। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন–

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ـ

অর্থ : সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

তারা এ আয়াতের কারণে খুব খুশি হলেন, অতঃপর নাযিল হলো–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ـ

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।" (সূরা বাকারা : ১৮৭)

মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "সালাতের তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে, অনুরূপ সিয়ামের তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে– তিনি সালাতের তিন ধাপ উল্লেখ করেন। অতঃপর সিয়ামের ব্যাপারে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মাসের তিন দিন ও আশুরার সওম পালন করতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ اِلٰى قَوْلِهِ : طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ـ

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর... একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।"(সূরা বাকারা : ১৮৩) তখন যার ইচ্ছা সওম পালন করত, যার ইচ্ছা ইফতার করত ও প্রত্যেক দিনের বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য দিত। এটা তখন হালাল ছিল, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করেন –

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ اِلٰى قَوْلِهٖ اَيَّامٍ اُخَرَ.

অর্থ : রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে ... অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫) এরপর থেকে যে রমযান পায়, তার ওপর সওম ওয়াজিব হয়, মুসাফির সফর শেষে কাযা করবে, যারা বৃদ্ধ-সওম পালনে অক্ষম, তাদের ব্যাপার ফিদিয়া তথা খাদ্য দান বহাল থাকে।

(আবু দাউদ (৫০৭), আহমদ : ৫/২৪৬, তাবরানি ফিল কাবির : ২০/১৩২, হাদীস নং ২৭০, হাকেম : ২/৩০২, তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন , আর ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনা আহমদ থেকে নেয়া, হাকেম তা সহীহ্ বলেছেন ও ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাতে দুর্বলতা রয়েছে, তবে তার অন্যান্য শাহেদ হাদীস আছে।)

মুসনাদে আহমদের অপর বর্ণনায় আছে : আর সিয়ামের ধাপ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা আগমন করে প্রত্যেক মাসে তিন দিন সওম পালন আরম্ভ করেন। ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন : "তিনি নয় মাস তথা রবিউল আউয়াল থেকে রমযান পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার সওম পালন করেন। অতপর আল্লাহ্ তার ওপর সিয়ামের ফরয নাযিল করেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - اِلَى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর... আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া, একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। (সূরা বাকারা-১৮৩)

তিনি বলেন : তখন যার ইচ্ছা সওম পালন করত যার ইচ্ছা খাদ্য প্রদান করত, খাদ্যদান যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা অপর আয়াত নাযিল করেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ـ اِلَى قَوْلِهِ ـ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ـ

অর্থ : রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে ..... সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।

(সূরা বাকারা : ১৮৫)

তিনি বলেন : আল্লাহ্ তায়ালা মুকিম ও সুস্থ ব্যক্তির ওপর সিয়াম আবশ্যক করে দেন, অসুস্থ ও মুসাফিরকে তাতে শিথিলতা প্রদান করেন। আর যে সিয়াম পালনে অক্ষম তার ব্যাপারে খাদ্যদান বহাল থাকে। এ হলো দুটি ধাপ। তিনি বলেন : তারা ঘুমের আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীগমন করত, যখন তারা ঘুমাত তা থেকে বিরত থাকত। তিনি বলেন : কায়েস ইবনে সিরমাহ্ নামক জনৈক আনসারি সওম অবস্থায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেন, অত:পর স্ত্রীর নিকট এসে এশার সালাত আদায় করেন। অতঃপর পানাহার না করে ঘুমিয়ে পড়েন, অবশেষে সকালে উঠেন ও সওম রাখেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ﷺ তাকে দেখেন যে, সে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে। তিনি বললেন : কি হয়েছে, তোমাকে এতো ক্লান্ত দেখছি কেন? সে বলল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি গতকাল কাজ করেছি, অত:পর বাড়িতে এসে শুয়ে পড়ি ও ঘুমিয়ে যাই, যখন ভোর করেছি, সওম অবস্থায় ভোর করেছি। তিনি বলেন : অতপর আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করেন–

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ - اِلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ـ

অর্থ : সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে ..... অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. ইবাদতের এ সহজ রূপ বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, কারণ সিয়াম ফরযের ধাপগুলোতে দেখা যায় : সূর্যাস্তের পর যে ঘুমিয়ে পড়ত অথবা

এশা থেকে ফারেগ হতো সে আগামীকালের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকত। এ জন্য তারা খুব কষ্ট ও ক্লান্তির সম্মুখীন হতো, যেমন উপরে এক সাহাবির ঘটনা থেকে জানলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা রমযানের রাতে পানাহার ও স্ত্রীগমন বৈধ করে তাদের ওপর সহজ করলেন, সূর্যাস্তের পর ঘুমিয়ে যাক বা জাগ্রত থাক। এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রুখসত। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

২. স্বামীর খেদমত করা একজন ভালো স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য ও একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার আলামত।

৩. এতে সাহাবীদের ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর আদেশের কাছে নতি স্বীকার করা, তাঁর বিরোধিতাকে ভয় করা এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে স্মরণ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কতক বর্ণনায় এসেছে : 'স্ত্রী আসতে দেরি করেন, ফলে সে ঘুমিয়ে যায়। স্ত্রী এসে তাকে জাগ্রত করেন, কিন্তু সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী অপছন্দ করে খানা থেকে বিরত থাকেন ও সওম অবস্থায় সকাল করেন। (তাবারি : ২/১৬৭) অপর বর্ণনায় আছে : "তিনি মাথা রেখে তন্দ্রায় যান, তার স্ত্রী খানা নিয়ে এসে বলে : খেয়ে নিন, সে বলে : আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। সে বলল : আপনি ঘুমাননি। অতঃপর সে অভুক্ত অবস্থায় প্রত্যুষ করে। (তাবারি : ২/১৬৮)

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে রুখসত তথা শিথিল বিধান পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করা বৈধ, এটা আযীমতের বিপরীত নয়, কারণ উভয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যেরূপ রুখসত পছন্দ করেন, অনুরূপ আযীমত পছন্দ করেন।

৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর রহমত যে, তিনি তাদের জন্য এমন ইবাদত রচনা করেন, যাতে রয়েছে তাদের অন্তর ও আত্মার পরিশুদ্ধতা।

৬. আল্লাহ অনভ্যস্ত বিষয়ে বিধান দানে বিভিন্ন ধাপ গ্রহণ করেন, যেমন তিনি সালাত ও সিয়াম তিন ধাপে ফরয করেন। অনুরূপ মদ নিষেধাজ্ঞার বিধান বিভিন্ন ধাপে এসেছে, যেন তারা ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়।

৭. রোযা ক্রমান্বয়ে ফরয হয়েছে, কারণ ইসলামের সূচনাকালে তারা রোযায় অভ্যস্ত ছিল না। যেমন মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন. তারা সিয়ামে অভ্যস্ত ছিল না, তাদের ওপর সিয়াম খুব কষ্টকর ছিল। (আবু দাউদ : ৫০৬; বায়হাকি ফিস সুনান : ৪/২০১, ফাযায়েলুল আওকাত : ৩০, আলবানি সহীহ আবু দাউদে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

৮. তিন ধাপে সিয়াম ফরয হয়েছে;

১. প্রতিমাসে তিন দিন ও আশুরার রোযা।

২. রমযানে রোযা পালন বা খাদ্য দান, সিয়াম পালনে অনিচ্ছুকদের কোনো একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার।

৩. রমযানের রোযা সুস্থ ব্যক্তির ওপর ফরয, রোযার পরিবর্তে খাদ্য দানের বিধান শুধু বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে রোযা পালনে সক্ষম নয়, সে রোগী এর অন্তর্ভুক্ত, যার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই।

শিক্ষা-১০
সিয়াম পাপ মোচনকারী

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ـ

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান। (সূরা তাগাবুন : আয়াত-১৫)

وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ـ

আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৩৫)

আয়াতদ্বয়ে "ফিতনা" শব্দটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) এর অর্থ বলেন : আমি তোমাদেরকে সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, প্রাচুর্য-দারিদ্র্য, হালাল-হারাম, পাপ-পুণ্য এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর মাধ্যমে পরীক্ষা করব।

(তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/২৮৬)

হুযাইফা (রা) বলেন, ওমর (রা) বলেছেন –

مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ ـ

অর্থ : ফেতনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস কার মনে আছে? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, ব্যক্তির ফিতনা তার পরিবার-পরিজনে, মাল-সম্পদে ও তার প্রতিবেশীর মধ্যে যার কাফফারা হয় সালাত, সিয়াম ও সদকা। (বুখারী : ১৭৯৬, মুসলিম : হাদীস ১৪৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর থেকে বর্ণনা করেন–

لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ .

প্রত্যেক আমলের কাফফারা রয়েছে, আর সওম হচ্ছে আমার জন্য, আমি তার প্রতিদান দেব। (বুখারী : ৭১০০, আহমদ : হাদীস : ২/৫০৪)

মুসনাদে আহমদে রয়েছে–

كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ .

প্রত্যেক আমল কাফফারা, আর সওম আমার জন্য, আমি তার প্রতিদান দেব।
(আহমদ : ২/৪৫৭), তায়ালিসি : ২৪৮৫)

অপর বর্ণনায় আছে –

كُلُّ الْعَمَلِ كَفَّارَةٌ اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ .

প্রত্যেক আমল কাফফারা তবে সাওম ব্যতীত সওম আমার জন্য, আমি তার প্রতিদান দেব। (এ হাদীস ইবনে রাহওয়েহ থেকে বর্ণিত, মাজমাউয যাওয়ায়েদে হায়সাবি তা আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন : ৩/১৭৯, তিনি বলেছেন ; এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন–

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ .

অর্থ : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা থেকে অপর জুমা, এক রমযান থেকে অপর রমযান, মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ, যদি কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়। (মুসলিম : হাদীস ২৩৩)

আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে ﷺ কে বলতে শুনেছি –

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُوْدَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ فِيْهِ كَفَّرَ مَا قَبْلَهُ.

যে রমযানের সওম পালন করল, তার সীমারেখা ঠিক রাখল এবং যা থেকে বিরত থাকা দরকার তা থেকে সে বিরত থাকল, তার পূর্বের পাপ মোচন করা হবে। (আহমদ-৩/৫৫, আবু ইয়ালা-১০৫৮; বায়হাকি-৪/৩০৪, সহিহ ইবনে হিব্বান-৩৪৩৩)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৯টি

১. কল্যাণ-অকল্যাণ উভয় দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করা হয়, কল্যাণের পরীক্ষা যেমন : অধিক সম্পদ ও নিয়ামত। অকল্যাণের পরীক্ষা যেমন : বিপদ-আপদ, দুঃখ-বেদনা, রোগ-ব্যাধি লেগে থাকা।

২. সন্তান ও সম্পদ মানুষের জন্য পরীক্ষা, কারণ মানুষ তাদের মহব্বত, ভালোবাসা ও হিতকামনায় আল্লাহর হক নষ্ট করে, পরকালে যা শাস্তির কারণ। তাদের জন্য পরীক্ষার অপর দিক হলো, শরীয়ত আমাদেরকে তাদের ওপর অনেক দায়িত্ব দিয়েছে, যেমন তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ভরণ–পোষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, সেসব বিষয়ে ক্রটি করা পরকালের শাস্তির কারণ।
(শারহুন নববী আলা মুসলিম : ২/১৭১)

৩. পাপ ও নাফরমানী ফিতনার অন্তর্ভুক্ত, যেমন বেগানা নারী অথবা হারাম মালে জড়িত ব্যক্তি ফিতনায় পতিত, কখনও নেককার লোকেরা এতে পতিত হয়। (আত্-তামহিদ লি ইবনে আব্দুল বার : (১৭/৩৯৪)

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ.

অর্থ : নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়। (সূরা আরাফ : আয়াত-২০১)

তিনি অন্যত্র বলেন–

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ

فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৩৫)

৪. কোন গুনাহে যে বারবার লিপ্ত হয়, তার উচিত অধিক সওয়াবের কাজ করা, কেননা নেক কাজ গুনাহ মুছে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .

অর্থ : নিশ্চয়ই ভালোকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। (সূরা হুদ : ১১৪) সন্দেহ নেই, অধিক পরিমাণ নেক কাজ গুনাহের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। অতঃপর আল্লাহ তার নেক আমলের কারণে তাকে খালেস তওবা করার তওফিক দান করেন।

৫. এ সব হাদীস প্রমাণ করে সিয়াম কাফফারা। সুতরাং আবু হুরায়রার হাদীসে বর্ণিত 'সিয়াম কাফফারা নয়' এর অর্থ হচ্ছে, সাধারণ আমল শুধু কাফফারা, কিন্তু সিয়াম কাফফারা হওয়ার সাথে সাথে অতিরিক্ত সওয়াবও আছে। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য সম্পাদিত সিয়ামে এ ফযীলত লাভ হবে।

(ফাতহুল বারি-৪/১১১)

৬. ইমাম নববী (র) বলেন : কখনো বলা হয় : ওযু যদি গোনাহের কাফফারা হয় তাহলে সালাত কিসের কাফফারা? আর সালাত যদি কাফফারা হয়, তাহলে জামায়াতের সালাত, রমযানের সওম, আরাফার সওম, আশুরার সওম এবং ফেরেশতাদের আমীনের সাথে বান্দার আমীনের মিল কিসের কাফফারা? কারণ এসব আমল সম্পর্কে বর্ণিত আছে এগুলো কাফফারা। আলেমগণ এর উত্তর দিয়েছেন– এসব আমল কাফফারার যোগ্য, যদি কাফফারা করার জন্য ছোট পাপ থাকে, তাহলে এর দ্বারা নেকী লিখা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আর যদি কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, আশা করি এ কারণে তা হালকা হবে।

(শারহুন নববী : ৩/১১৩, আদ-দিবায আলা মুসলিম : ২/১৭)

৭ এসব আমল দ্বারা বান্দার হক মাফ হয় না, ছোট বা বড় নেক আমলের কারণে কোন হক মাফ হয় না। বরং তা থেকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে, অথবা তার থেকে হালাল করে নিতে হবে।

(তানবিরুল হাওয়ালেক : ২/৪২), তুফহাতুল আহওয়াযি: ১/৫৩৫)

৮. সিয়ামের ফলে পাপ মোচন হয়।

৯. সিয়ামের এসব ফযীলত সে লাভ করবে যে সওম বিনষ্টকারী বস্তু থেকে স্বীয় সওম হিফাজত করবে, যেমন আবু সাঈদ খুদরির হাদীসে এসেছে–

وَعَرَفَ حُدُوْدَهُ وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَتَحَفَّظَ فِيْهِ .

অর্থ : সওমের সীমারেখা ঠিক রাখল ও সেসব বস্তু থেকে নিরাপদ থাকল, যা থেকে নিরাপদ থাকা জরুরি।

সারকথা, মুসলিমের উচিত রমযানের রাত-দিন হারাম কথা যেমন গীবত, পরনিন্দা ও হারাম দৃষ্টি থেকে নিজেকে হিফাযত করা, যা টেলিভিশন-ইন্টারনেট ও বিভিন্ন প্রচার যন্ত্রে প্রচার করা হয়, যার কুফল অন্যান্য সময়ের চেয়ে রযমানে বেড়ে যায়। আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত ও সঠিক পথে থাকার তওফিক দান করুন।

শিক্ষা–১১

রোযাদারের চুম্বন ও আলিঙ্গন করার বিধান

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلٰكِنَّهُ اَمْلَكُكُمْ لِاِرْبِهِ اَىْ : اَمْلَكُكُمْ لِحَاجَتِهِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযাবস্থায় চুম্বন করতেন, আলিঙ্গন করতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের চেয়ে তার চাহিদা অধিক নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন। অর্থাৎ স্ত্রীগমনের চাহিদা। অপর বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন।" (মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আয়েশা (রা) বলেন :

وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اَرَبَهُ كَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ اَرَبَهُ .

"তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মতো নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُنِىْ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে চুম্বন করতেন, অথচ তিনি ও আমি রোযা অবস্থায় থাকতাম।

ইব্ন হিব্বানের এক বর্ণনায় এসেছে, আবু সালমা ইব্ন আব্দুর রহমান আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ : فِى الْفَرِيْضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : فِىْ كُلِّ ذٰلِكَ فِى الْفَرِيْضَةِ وَالتَّطَوُّعِ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কতক স্ত্রীদের রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন। আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম : ফরয ও নফলে? তিনি বললেন : উভয়ে"। (বুখারী-১৮২৬, মুসলিম-১১০৬, আবু দাউদ-২৩৮৪, আহমদ-৬/৪৪, তৃতীয় বর্ণনা মুসলিমের, চতুর্থ বর্ণনা আবু দাউদ ও আহমদের, পঞ্চম বর্ণনা ইব্ন হিব্বানের-৩৫৪৫)

হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত :

أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় চুম্বন করতেন।

(মুসলিম-১১০৭, ইব্ন মাজাহ: (১৬৮৫, আহমদ-৬/২৮৬)

ওমর ইব্ন আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন: রোযাদার কি চুম্বন করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাকে (উম্মে সালমাকে) জিজ্ঞাসা কর। উম্মে সালমা তাকে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেন। সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার অগ্র-পশ্চাতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : জেনে রেখ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগার ও আল্লাহভীরু।

(মুসলিম-১১০৮, মালেক-১/২৯১)

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রোযা অবস্থায় বিনোদনের ছলে আমি চুম্বন করি। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আজ এক জঘন্য অপরাধ করে ফেলেছি, রোযা অবস্থায় চুম্বন করেছি। তিনি বললেন : বল দেখি রোযা অবস্থায় পানি দ্বারা কুলি করলে কি হয়? আমি বললাম : কিছু হয় না। তিনি বললেন : তাহলে কী অপরাধ করেছ। (আবু দাউদ-২৩৮৫, দারামি-১৭২৪, আব্দ ইব্‌নে হুমাইদ-২১, হাদিসটি সহীহ বলেছেন ইব্‌ন হিব্বন-৩৫৪৪, হাকেম, তিনি বলেছেন বুখারি ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক, ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন-১/৫৯৬, ও আলবানি, সহীহ আবু দাউদে)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৯টি

১. রোযাদারের চুম্বন ও আলিঙ্গন করা বৈধ, রোযা ফরয হোক বা নফল, রোযাদার বৃদ্ধ হোক বা যুবক, রমযান বা গায়রে রমযান সর্বাবস্থায়, যদি স্ত্রীগমন অথবা বীর্যপাত থেকে নিরাপদ থাকে ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

২. হাদীসে অ্যালিঙ্গন দ্বারা উদ্দেশ্য শরীরের সাথে শরীরের স্পর্শ, স্ত্রী সহবাস নয়। কারণ স্ত্রী সহবাস রোযা ভঙ্গকারী। (তাবারি তার তাফসির গ্রন্থে বলেছেন : "আরবদের ভাষায় মোবাশারা হচ্ছে চামড়ার সাথে চামড়া মিলানো, আর পুরুষের চামড়া হচ্ছে তার বাহ্যিক শরীর"-২/১৬৮, দেখুন: ফাতহুল বারি-৪/১৪৯)

৩. রোযাদারের স্ত্রী চুম্বন, অথবা স্পর্শ অথবা আলিঙ্গনের ফলে যদি বীর্যস্থলন হয়, রোযা ভেঙ্গে যাবে, তার অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা, তওবা, ইস্তেগফার ও পরবর্তীতে কাযা করা জরুরি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেন :

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَفِي رِوَايَةٍ وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي .

"সে আমার জন্য তার প্রবৃত্তি ও পানাহার ত্যাগ করে।" (বুখারী-৭০৫৪, মুসলিম-১১৫১)। অপর বর্ণনায় আছে : "সে আমার জন্য স্বাদ ও স্ত্রীগমন ত্যাগ করে।" (সহীহ ইব্‌ন খুযাইমাহ-১৮৯৭, দেখুন : ফাতাওয়া ইব্‌ন বায-২১৬৪, এবং তার মাজমু ফাতাওয়া ও রাসায়েল-১৫/৩১৫)

'মজি' বের হলে রোযা ভাঙ্গবে না, বিশুদ্ধ মতানুসারে এ কারণে তার ওপর

কিছু ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া ইব্ন বায-২/১৬৪, তার মাজমু ফাতাওয়া ও রাসায়েল-১৫/২৬৮, ফাতাওয়াস সিয়াম লি ইব্ন জাবরিন -৫৪)

রোযাদারের জন্য উচিত যৌন উত্তেজক আচরণ থেকে বিরত থাকা, যা হারাম পর্যন্ত নিয়ে যায়।

৪. হাদিস প্রমাণ করে যে, চুম্বন শুধু নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সমগ্র উম্মতের জন্য তা বৈধ, যদি সহবাস বা বীর্যপাতের আশঙ্কা না থাকে। (শারহু ইব্ন বাত্তাল-৪/৫৬, মিনহাতুল বারি-৪/৩৬৪, তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৩৫০)

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু, কারণ তিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানতেন। (আল-মুফহিম-৩/১৬৫)

৬. হাদিস প্রমাণ করে যে, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা নিষেধ, অথবা এ বিশ্বাস করা যে, শুধু নবী ﷺ-এর স্ত্রী চুম্বন বৈধ, উম্মতের কারো জন্য তা বৈধ নয়। কারণ এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবে তা নেননি, বরং তিনি বলেন :

اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَتْقَاكُمْ اللّٰهَ وَاَخْشَاكُمْ لَهٗ ، وَفِى الْحَدِيْثِ الْاٰخَرِ : وَاَعْلَمُكُمْ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ .

"জেনে রেখ, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেযগার ও আল্লাহ ভীরু"। (শারহুন নববী আলা মুসলিম-৭/২১৯ অপর হাদিসে এসেছে : "আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহর বিধান অধিক জানি")

৭. হাদিস থেকে সাহাবিদের হালাল-হারাম জানার আগ্রহ ও আল্লাহ ভীতি প্রমাণ হয়, তারা ইবাদত বিনষ্টকারী বা সওয়াব হ্রাসকারী বস্তু থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

৮. এ হাদিসে সেসব সূফীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, ঈমান ও আমলে যাদের পূর্ণতা অর্জন হয়েছে, তারা শরিয়তের বিধানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। এখানে আমরা দেখি রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের বিধানে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, অথচ তার ঈমান ও আমল সবার চেয়ে কামেল ও পরিপূর্ণ ছিল। এতে তাদেরও প্রতিবাদ রয়েছে, যাদের ধারণা নবী ﷺ-এর পূর্বাপর পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাই নিষিদ্ধ কতক কাজ তার জন্য বৈধ। (অনুরূপ আরও ভুল বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে,

তৃতীয়বার পাপ থেকে তওবাকারীর হাদীস ও আল্লাহর বাণী থেকে : اِعْمَلْ
"তুমি যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ
করে দিয়েছি"। মূলত: এ ভুল বুঝার সম্ভাবনা বাতিল। এর দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "আমি তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেযগার ও আল্লাহ ভীরু।" উপরন্তু এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, ব্যক্তি বুযুর্গী ও মর্যাদার যে স্তরে উপনীত হোক, শরিয়াতের বিধান তার থেকে মওকুফ হবে না।" (আল-মুফহিম : ৩/১৬৪-১৬৫)

৯. ওমর ইব্‌ন খাত্তাবের হাদিসে এক বিধানের ক্ষেত্রে দু'টি বস্তুর তুলনা করা ও কিয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয়, যদি বস্তুদ্বয়ে সাদৃশ্য থাকে। যেমন পানি দ্বারা গড়গড়ার ফলে গলায় ও পেটে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে, যে কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়, অনুরূপ চুম্বনের ফলে স্ত্রীগমনের সম্ভাবনা থাকে, যে কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যেহেতু গড়গড়ার ফলে রোযা ভাঙ্গে না, তাই চুম্বনের ফলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আবু দাউদের টীকায় মাআলেমুস সুনান-২/৭৮০)

শিক্ষা-১২

রমযানে পানাহার করার শাস্তি

আবু উমাম বাহেলি (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি।

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِيْ رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِيْ ـ أَيْ عَضُدِيْ ـ فَأَتَيَا بِيْ جَبَلاً وَعْرًا فَقَالاَ لِيْ : اِصْعَدْ، فَقُلْتُ : إِنِّيْ لاَ أُطِيْقُهُ، فَقَالاَ : أَنَا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعَدْتُ حَتّٰى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، فَقُلْتُ : مَا هٰذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا : هٰذَا عِوَى أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِيْ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ : هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ ـ

"একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, সহসা দু'জন লোক এসে আমার বাহু ধরে আমাকেসহ তারা এক দুর্গম পাহাড়ে গমন করল। তারা আমাকে বলল : আরোহণ কর, আমি বললাম : আমি আরোহণ করতে পারি না। তারা বলল, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। আমি উপরে আরোহণ করলাম। যখন পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলাম, বিভিন্ন বিকট শব্দের সম্মুখীন হলাম। আমি বললাম, এ আওয়াজ কিসের? তারা বলল, এগুলো জাহান্নামীদের ঘেউ ঘেউ আর্তনাদ। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে রওয়ানা করল, আমি এমন লোকদের সম্মুখীন হলাম, যাদেরকে হাঁটুতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের চোয়াল ক্ষতবিক্ষত, অবিরত রক্ত ঝরছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি বললাম : এরা কারা? তারা বলল, এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা রোযা পূর্ণ হওয়ার আগে ইফতার করত"। (নাসায়ি ফিল কুবরা-৩২৮৬, তাবরানি ফিল কাবির-৮/১৫৭, হাদীস-৭৬৬৭, মুসনাদে শামি-৫৭৭, বায়হাকি-৪/২১৬, এ হাদীস সহীহ বলেছেন ইব্ন খুযাইমাহ-১৯৮৬, ইব্ন হিব্বান-৭৪৬১ ও হাকেম-১/৫৯৫, তিনি বলেছেন মুসলিমের শর্ত মোতাবেক, ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৬টি

১. এ হাদিসে কবরের আযাবের প্রমাণ রয়েছে। কবরের আযাব কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আহমদ (র) বলেন, কবরের আযাব সত্য, গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।" (আর-রূহ লি ইব্নিল কাইয়্যিম-৫৭, দেখুন : আস-সুন্নাহ, লিল লালেকায়ি-৬/ ১১২৭, ইসবাতু আযাবিল কাবর লিল বায়হাকি-১/১১০)

২. কবরের আযাব শরীর ও রূহ উভয়ের ওপর ঘটে, যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ইব্ন কায়্যিম (র) বলেন, "এ উম্মতের পূর্বসূরি ও ইমামদের অভিমত হচ্ছে, মৃতব্যক্তি নেয়ামত বা আযাবে অবস্থান করে, যা তার শরীর ও রূহ উভয় ভোগ করে। শরীর থেকে আলাদা হওয়ার পর রূহ আরামে বা আযাবে অবস্থান করে। যখন সে শরীরের সাথে মিলিত হয়, তখন সে তার সাথে আযাব বা নেয়ামত ভোগ করে। অতঃপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন সব রূহ শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর তারা সবাই কবর থেকে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।"

(আর-রূহ লি ইব্ন কাইয়্যিম-৫২, দেখুন : মাজমু ফাতাওয়া-৪/২৮২)

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বপ্নে কবর আযাবের কতক নমুনা দেখানো হয়েছে। নবীদের স্বপ্ন সত্য ও ওহীর অংশ।

৪. এতে কবর আযাবের কঠিন চিত্র ফুটে উঠেছে, মুসলিমদের উচিত কবর আযাবকে ভয় করা, তার উপকরণ থেকে বেঁচে থাকা ও তা থেকে সুরক্ষার আসবাব গ্রহণ করা।

৫. রমযানে যে ব্যক্তি জেনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে, কোনো কারণ ব্যতীত সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করে, তার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে এ হাদীসে। এটা কবীরা গুনাহ, যার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৬. সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতারে যদি এ শাস্তি হয়, তাহলে যে রমযানে রোযা রাখে না, অথবা কোনো কারণ ব্যতীত কয়েক রমযান ইফতার করে, সে এরূপ বা তার চেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে সন্দেহ নেই। অতএব যার থেকে এরূপ ঘটে তার কর্তব্য দ্রুত তওবা করা, যেন তাকে কবরের এ আযাব স্পর্শ না করে।

শিক্ষা-১৩

মুসাফির, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারীর রোযা ভঙ্গ করা

আনাস ইবনে মালিক আল-কা'বি (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাহিনী আমার কাওমের ওপর আক্রমণ করেছিল। তখন আমি তার নিকট আগমন করলাম, তিনি খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : কাছে এসো, খাও। আমি বললাম : আমি রোযাদার। তিনি বললেন : বস, আমি তোমাকে রোযা অথবা সিয়াম সম্পর্কে বলছি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সালাত হ্রাস করেছেন, মুসাফির, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী থেকে রোযা অথবা সিয়ামে স্থগিত করেছেন। হায় আফসোস! সেদিন যদি আমি রাসূলের খানা থেকে কিছু ভক্ষণ করতাম!" (আবু দাউদ-২৪০৮, আহমদ-৪/৩৪৭, তিরমিযী-৭১৫; তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান। ইব্ন মাজাহ-১৬৬৭, তাবরানি ফিল কাবির-১/২৬৩, হাদীস-৭৬৫ বায়হাকি-৪/২৩১ সহীহ আবু দাউদ লিল আলবানি। শায়খ ইব্ন বাযও তার ফাতাওয়ায় হাদীসটি সহীহ বলেছেন-১৫/২২৪)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৭টি

১. বান্দার ওপর আল্লাহর দয়া যে, তিনি অক্ষম ব্যক্তিদের থেকে কতক আহকাম স্থগিত করে দিয়েছেন, যারা তা পালনে অপারগ বা তা আদায়ে কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সদাচরণ যে তিনি আনাসকে খানার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি উম্মতের কল্যাণে ছিলেন অতি আগ্রহী, তাই প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের বাতলে দিতেন।

৩. মুসাফিরের জন্য ইফতার ও কসর করা বৈধ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রুখসত, আল্লাহ যেমন আজিমত পছন্দ করেন, তেমন তিনি রুখসত পছন্দ করেন।

৪. গর্ভবতীর জন্য আল্লাহ্ রমযানে সিয়াম সাধনা স্থগিত করে দিয়েছেন। কারণ গর্ভে বিদ্যমান বাচ্চা মায়ের খাদ্য থেকে খাবার গ্রহণ করে, যদি মা সিয়াম পালন করে, তবে তার কষ্ট হতে পারে বা তার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আল্লাহ তার থেকে সিয়াম স্থগিত করে দিয়েছেন।

৫. স্তনদানকারীর ওপর আল্লাহ্ সিয়াম স্থগিত করে দিয়েছেন, কারণ স্তনদানকারী মায়ের বারবার খাবার গ্রহণ করা জরুরি, অন্যথায় তার বা তার বাচ্চার ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. জ্বলন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো, পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা বা নিষ্পাপ শিশুকে মুক্ত করার জন্য যার সিয়াম ভঙ্গ করা জরুরি হয়, সে এর অন্তর্ভুক্ত। (দেখুন : আশ-শারহুল মুমতি-৬/৩৫০-৩৫১, মুনতাকা মিন ফাতাওয়া শায়খ ইবনে বায-৩/১৪১)

৭. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী যদি নিজের জানের ভয়, অথবা নিজের ও বাচ্চার ক্ষতির ভয়ে সিয়াম ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের শুধু কাযা করাই যথেষ্ট, এতে কারো দ্বিমত নেই। কারণ তারা অসুস্থ ব্যক্তিদের ন্যায়, অতএব তাদের মতো তারা সুবিধা ভোগ করবে। (আল-মুগনি-৪/৩৯৩-৩৯৪, যাখিরাতুল উকবা-২১১/২১৪)

আর মায়েরা যদি শুধু বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কায় রোযা ভঙ্গ করে, তাহলে এতে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। তবে যার ওপর ফতোয়া, ইনশাআল্লাহ তাই বিশুদ্ধ যে, তাদের শুধু কাযা করতে হবে, কারণ তারা অসুস্থ ব্যক্তিদের ন্যায়। দ্বিতীয়ত নবী ﷺ রোযা স্থগিত করার ব্যাপারে মুসাফির ও তাদেরকে একসাথে উল্লেখ করেছেন, এটা সর্বজনবিদিত যে, মুসাফির কাযা করবে, তার ওপর খাদ্যদান জরুরি নয়, অনুরূপ গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী।

শিক্ষা-১৪

সফরে রোযা ভঙ্গ করা

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত :

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ (رضـ) قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرُ الصِّيَامِ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ـ

"হামজাহ ইব্ন আমর আসলামি (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন : আমি কি সফরে রোযা রাখব? তার রোযার খুব অভ্যাস ছিল। তিনি বললেন : যদি চাও রাখ, অন্যথায় ইফতার কর। (বুখারী-১৮১৪, মুসলিম-১১২১)

ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَافَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ : صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানে সফর করে রোযাবস্থায় উসফান নামক স্থানে পৌছেন। অত:পর পানির পাত্র ডেকে পাঠালেন ও দিনে পান করলেন, যেন লোকেরা তাকে দেখে। তিনি ইফতার করে মক্কায় আগমন করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রোযা রেখেছেন ও ইফতার করেছেন। অতএব যার ইচ্ছা রোযা রাখ, যার ইচ্ছা ইফতার কর। (বুখারী-৪০২৯, মুসলিম-১১১৩)

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন :

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرَ عَلَى الصَّائِمِ ـ

"আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সফর করতাম, রোযাদার রোযাভঙ্গকারীকে বা রোযাভঙ্গকারী রোযাদারকে কোন তিরস্কার করেননি।

আবু সাঈদ খুদরি (রা) বর্ণনা করেন :

كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযানে যুদ্ধ করতাম, আমাদের থেকে কেউ হতো রোযাদার, কেউ হতো রোযাভঙ্গকারী। রোযাদার রোযাভঙ্গকারীকে ও রোযাভঙ্গকারী রোযাদারকে তিরস্কার করত না। তারা মনে করত, যার শক্তি আছে সে রোযা রাখবে, এটা তার জন্য ভালো, আর যে দুর্বল সে রোযা ভাঙ্গবে, এটা তার জন্য ভাল।" (মুসলিম-১১১৬, তিরমিযী-৭১৩, আহমদ-৩/১২)

তার থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوٰى لَكُمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوْنَ عَدُوَّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوٰى لَكُمْ فَأَفْطِرُوْا، وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُوْمُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোযা অবস্থায় অবস্থায় দিকে সফর করেছি, আমরা একস্থানে অবতরণ করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা তোমাদের শত্রুদের নিকটবর্তী হয়েছ, পানাহার তোমাদের শক্তির জন্য সহায়ক। এটা ছিল রুখসত। আমাদের কেউ রোযা রাখল, কেউ ভেঙ্গে ফেলল। অতঃপর আমরা অপর স্থানে অবতরণ করলাম, তিনি বললেন : সকালে তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে, ইফতার তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। এটা চূড়ান্ত নির্দেশ ছিল, আমরা সকলে ইফতার করলাম। অতঃপর তিনি বলেন : তারপর আমরা নিজেদের দেখেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোযা রাখতাম"। (মুসলিম-১১২০, আবু দাউদ-২৪০৬, আহমদ-৩/৩৫)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৫টি

১. ইসলামের উদারতা, ইসলামি শরিয়তের ছাড় ও তার অনুসারীদের ওপর সজাগ দৃষ্টির প্রমাণ রয়েছে এ হাদীসে।

২. মুসাফির রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন, তার পক্ষে যা সহজ তাই সুন্নাত। এসব হাদীস শিথিলতা গ্রহণ করার দীক্ষা দেয়।

৩. যার পক্ষে রোযা কষ্টকর, তার জন্য রোযা না রাখা উত্তম। আর যার পক্ষে কাযা কষ্টকর, সফরে রোযা কষ্টকর নয়, তার পক্ষে সফরে রোযা রাখা উত্তম।

৪. লাগাতার যে সফর করে, অথবা অধিকাংশ সময় সফরে থাকে, চাকুরী বা পেশাদারী কাজের জন্য, তার পক্ষে সফরে রোযা রাখা উত্তম, যদি কষ্ট না হয়। আর যদি কাযার সময় না মিলে, যেমন যাদের সারা বছর অতিবাহিত হয় সফরে, তাদের পক্ষে সফরে রোযা রাখা ওয়াজিব।

৫. যতদ্রুত সম্ভব শরিয়তের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি।

৬. সফরে রোযা রাখা ও ইফতার করা উভয় নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত, যখন যার দাবি ছিল, তিনি তখন তিনি তাই করেছেন। মুসলিমদের উচিত এ ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর আদর্শ অনুসরণ করা।

৭. হামজাহ আসলামির (রা) হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিষয় জানা উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ করতেন।

৮. ইমাম যখন রুখসতের নির্দেশ দেন, তখন তা আযিমত হয়ে যায়, তার বিরোধিতা করা বৈধ নয়, কারণ তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য করা নয়।

৯. ইমামের কর্তব্য অধীনদের সাথে নরম আচরণ করা, তাদের দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি রাখা, যেমন নবী ﷺ সবাইকে ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন শত্রুর মোকাবেলায় তারা শক্তি প্রদর্শনে সক্ষম হয়। অথচ তাদের মধ্যে এমন লোক ছিল, রোযা যাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করত না, কারণ তাদের তা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু এমনও লোক ছিল, রোযা যাদের দুর্বল করে দিত, তাই দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সবাইকে ইফতারের নির্দেশ দেন।

১০. দু'টি বিধানের একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা মূলত মুসলিমের ওপর

শরিয়তের উদারতা, যে কোনো একটি গ্রহণে সে তিরস্কারের উপযুক্ত হবে না। তদনুরূপ ইখতিলাফি মাসআলা, যেখানে কারো পক্ষে দলিল স্পষ্ট নেই, সেখানেও যে কোনো একটি গ্রহণের প্রশস্ততা রয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

১১. রুখসত গ্রহণ বা দলিল বুঝার ক্ষেত্রে মুসলিমদের ইখতিলাফ যেন বিচ্ছেদ ও শত্রুতার কারণ না হয়।

১২. এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহাবীদের মাঝে মহব্বত, ভ্রাতৃত্ব ও দ্বীনের গভীর জ্ঞান ছিল। যেমন রোযাদার ও রোযাভঙ্গকারী কেউ কাউকে দোষারোপ করেনি, যেহেতু সকলে শরিয়তের নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করেছে।

১৩. রমযান মাসে সফর করা বৈধ, কারণ ফাতহে মক্কার বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে সফর করেছেন। (আত-তামহিদ-২২/৪৮)

১৪. আগামীকাল সফরের যে নিয়ত করে, সে রাত থেকে ইফতারের নিয়ত করবে না, কারণ নিয়ত দ্বারা মুসাফির হয় না, যতক্ষণ না সে সফর আরম্ভ করে। (আত-তামহিদ-২২/৪৯)

১৫. সফরের নিয়তকারী ব্যক্তির মুকিম অবস্থায় ইফতার করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে সফর আরম্ভ করে, বা যানবাহনে চড়ে।" (আত-তামহিদ-২২/৪৯)
(দেখুন: শারহু ইব্‌নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/২৬৮-২৭২, তাহযিবুস সুনান-৩/২৮৪)

শিক্ষা-১৫

রোযার মাধ্যমে যৌন চাহিদা হ্রাস করা

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি ইরশাদ করেন :

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ -

"তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে, কারণ তা দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থান হেফাজতকারী। আর যে সামর্থ্যবান নয়, সে যেন রোযা আঁকড়ে ধরে, কারণ তা যৌন চাহিদার জন্য ভঙ্গুরতা"।

(বুখারি-১৮০৬, মুসলিম-১৪০০)

জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, এক যুবক নবীﷺ-এর দরবারে এসে নপুংসক হওয়ার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন :

صُمْ وَاسْئَلِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ .

"রোযা রাখ আর আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।" (আহমদ-৩/৩৮২, ইব্ন মুবারক ফিয যুহদ-১১০৭, তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, কিন্তু জাবের থেকে বর্ণনকারী ব্যক্তি মাজহুল ও অপরিচিত, তবে এর দু'টি শাহেদ হাদীস আছে।)

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে নপুংসক হওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহﷺ বললেন :

خِصَاءُ أُمَّتِى الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ .

"আমার উম্মতের খাসী করা বা নপুংসকতা হলো সিয়াম ও কিয়াম"। (আহমদ-২/১৭৩, বগভি ফি শারহিস সুন্নাহ-২২৩৮, হায়সামি-৪/২৫৩, তিনি তাবরানির সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, কতিপয়ের ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে, শায়খ আহমদ শাকের-৬৬১২ ও আলবানি-১৮৩০, এ হাদিসটি সহীহ বলেছেন, তবে তাদের বিশুদ্ধ হাদীসে "কিয়াম" নেই, কারণ তা দুর্বল, যেমন আলবানি তা বর্ণনা করেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৬টি

১. সাহাবীদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের আগ্রহ, তার অবাধ্যতার ভয়, দ্বীনের যাবতীয় বিষয় অকপটে জিজ্ঞেস করা ও আখিরাতের প্রতি গভীর মনোযোগের প্রমাণ রয়েছে এ হাদীসে।

২. যৌনা চাহিদা দমন করার জন্য খাসী করা বা নপুসংক হওয়া নিষিদ্ধ। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নপুংসক হওয়া বৈধ নয়।

৩. যৌনাবেগ দমন করার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা বৈধ, যেহেতু নবীﷺ সিয়ামের মাধ্যমে তা দমন করতে বলেছেন। (শারহুস সুন্নাহ লিল বগভি-৯/৬)

৪. সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা মর্যাদার, এটা বান্দার ইবাদত হিসেবে গণ্য ও তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

৫. যার বিবাহের সামর্থ্য নেই, তার উচিত আল্লাহর নিকট বিবাহের খরচ প্রার্থনা করা এবং সিয়াম পালন করা যতক্ষণ না আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেন।

৬. খাদ্য পানীয় ও স্ত্রীগমন উপভোগ করা নবীর আদর্শ। ইবাদত ও বুজুর্গি ভেবে এসব থেকে বিরত থাকা সুন্নাতের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

শিক্ষা-১৬

মুসাফির যখন রোযা ভাঙ্গবে

জা'ফর ইব্‌ন জাবর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি আবু বসরা গিফারি সাহাবির সাথে রমযানে মিসরের ফুসতাত থেকে জাহাজে চড়েছিলাম, তাদেরকে যখন জাহাজে উঠানো হল, দুপুরের খানা পেশ করা হলো। জা'ফর তার হাদীসে বলেন : এখনো বাড়ি-ঘরগুলো ছাড়িয়ে যায়নি, তিনি দস্তরখান হাজির করতে বললেন। তিনি বললেন : নিকটে আস। আমি বললাম আপনি কি ঘরগুলো দেখছেন না। আবু বসরাহ বললেন : তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত থেকে বিরত থাকতে চাও? জাফর তার হাদীসে বলেন : অতঃপর তিনি খানা গ্রহণ করেন।" (আবু দাউদ-২৪১২, আহমদ-৬/৩৯৮, দারামি-১৭১৩, তাবরানি ফিল কাবির-২/২৭৯/২৮০, হাদিস-২১৬৯-২১৭০, শাওকানি বলেন : এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, নাইলুল আওতার-৪/৩১১, দেখুন: তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৪৩০, আলবানি ইরওয়া-৪/১৬৩ গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলেছেন, হাদীস-৯২৮)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বার (র) বলেন : "আমি রমযানে আনাস ইব্‌ন মালিকের নিকট আসি, তখন তিনি সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তার জন্য সওয়ারি প্রস্তুত করা হয়েছে, তিনি সফরের পোশাক পরিধান করেন, অতঃপর খানা আনতে বলেন, তিনি খানা ভক্ষণ করেন, আমি তাকে বললাম : এটা কি সুন্নাত? তিনি বললেন : সুন্নাত, অতঃপর সওয়ারীর ওপর উঠে বসলেন।" (তিরমিযী-৭৯৯-৮০০, তিনি হাদীসটি হাসান বলেছেন। দিয়া' ফিল মুখতারাহ-২৬০২, দারাকুতনি-২/১৮৭, বায়হাকি-৪/২৪৭, আলবানি ইরওয়া-৪/৬৪, ও সহীহ তিরমিযিতে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৩টি

১. সফরে ইফতার করা নবীর সুন্নাত। তার থেকে বর্ণিত, তিনি সফরে রোযা পালন করেছেন, যেমন তিনি ইফতার করেছেন। অনুরূপ সাহাবিদের থেকে বর্ণিত, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কতক সফরে রোযা পালন করেছেন, কতক সফরে ইফতার করেছেন।

২. এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যদি কেউ সফর আরম্ভ করে, তার জন্য ইফতার করা বৈধ, সে নিজের শহর বা গ্রাম অতিক্রম করুক বা না করুক। ইব্‌নুল কাইয়্যেম (র) বলেন : "সাহাবায়ে কেরাম যখন সফর করতেন, তখন তারা বাড়ি ত্যাগ করার ভ্রুক্ষেপ না করে ইফতার করতেন, বলতেন এটা সুন্নাত ও নবীর আদর্শ।" (যাদুল মায়াদ-২/৫৬, এ মাসআলাটি দ্বিমতপূর্ণ,

ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত, ঘর থেকে বের হয়ে ইফতার করবে। ইসহাক বলেছেন : বরং যখন সে সফরে পা রাখবে তখন থেকে, যেমন আনাস করেছেন। দেখুন: মুগনি-৪/৩৪৫-৩৪৮, ফাতহুল বারি-৪/১৮০-১৮২)

৩. এসব হাদীস প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি দিনের মধ্যবর্তী সময়ে রোযা অবস্থায় সফর করে, তার জন্য ইফতার করা বৈধ, যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করে থাকে। ইবনুল কাইয়্যেম (র) বলেছেন : "এসব হাদীস স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রমযানের দিনে যে সফর করবে, তার জন্য সেদিন ইফতার করা বৈধ।" (যাদুল মায়াদ-২/৫২, তাহযিবুস সুনান-৭/৩৯, এটাই শা'বি, আহমদ, ইসহাক, আবু দাউদ ও ইব্ন মুনযিরের বক্তব্য। তবে তিন ইমাম ও ইমাম আওযায়ি এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন, তাদের নিকট যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় সফর আরম্ভ করে, সে ঐ দিন ইফতার করবে না।

(দেখুন : মুখতাসারুস সুনান লিল মুনযিরি-৩/২৯১)

শিক্ষা-১৭
রমযানের দিনে সহবাস করা

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করল, সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন : কি হয়েছে? সে বলল : রোযা অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীর ওপর উপগত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি গোলাম আছে? সে বলল : না, তিনি বললেন, তুমি কি দু'মাস লাগাতার রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না, তিনি বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিরতি নিলেন। আমরা আমাদের অবস্থানে ছিলাম, নবী ﷺ একপাত্র খেজুর নিয়ে হাজির হলেন, অতঃপর বললেন: প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল: আমি। বললেন : তুমি এটা গ্রহণ করে সদকা করে দাও। সে বলল : আমার চেয়ে গরিব কাউকে হে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহর শপথ আমার পরিবারের চেয়ে অধিক গরিব মদিনার আশ-পাশে আর কোনো পরিবার নেই। নবী করীম ﷺ হেসে দিলেন, তার দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল, অতঃপর বললেন, এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।" (বুখারী-১৮৩৪, মুসলিম-১১১১)

শিক্ষা ও মাসায়েল ২০টি

১. রমযানের দিনে ওজর ব্যতীত যে স্ত্রী সহবাস করল, যেমন সফর, ভুল ও বলপ্রয়োগ, সে পাপ ও গুনাহ্ করল, অবশিষ্ট দিন বিরত থাকাসহ্ তার তওবা করা ওয়াজিব, সে দিনের রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব। (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম লি ইব্ন উসাইমিন-৪৭৪, শারহুল মুমতি-৬/৪০১), জমহুর ও অধিকাংশ আলেমগণ বলেন কাফফারার সাথে কাযা করতে হবে। (দেখুন: আল-মুফহিম-৩/১৭২)
শাইখুল ইব্ন তাইমিয়াহ (র) বলেছেন তার কাযা করতে হবে না, যদি কাযা ওয়াজিব হতো, নবী করীম ﷺ অবশ্যই তাকে নির্দেশ দিতেন।

২. কাফফারা ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হয়, প্রথমে গোলাম আযাদ, অতঃপর লাগাতার দু'মাস রোযা পালন, যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করা।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রয়োজনে বলা বৈধ।
(ফাতহুল বারি লি ইব্ন হাজার-৪/১৭৩)

৪. পাপীর পাপ সম্পর্কে ফতোয়া তলব করা, পাপ প্রকাশ করার অপরাধ হবে না। (শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/২১৫)

৫. ছাত্রদের সাথে নরম ব্যবহার করা, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনয়ী হওয়া, দ্বীনের প্রতি লোকদের আগ্রহী করা, পাপের অনুশোচনা ও আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা জরুরি। (ফাতহুল বারি-৪/১৭৩০)

৬. এক পরিবারকে পুরো কাফফারা দেয়া বৈধ। (ফাতহুল বারি-৪/১৭৪)

৭. এ হাদীসে সাহাবিদের অন্তরের পবিত্রতা ও অন্তরকে আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাকুলতা প্রমাণ হয়। (আল-ফিরইয়াবি কর্তৃক বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থ-১/৪২৬)

৮. গরিব ব্যক্তি কাফফারার খানা নিজে খাওয়া ও নিজ পরিবারের ওপর সদকা করা বৈধ। (আল-ফিরইয়াব কর্তৃক বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থ-১৪২৬)

৯. স্বামীর ওপর পরিবারের খরচ ওয়াজিব, যদিও সে গরিব হয়। এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারি একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন।
(বুখারী-৫/২০৫৩, দেখুন: শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন-৫/২৫৪)

১০. স্ত্রীগমন করে রোযা ভঙ্গকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব, পানাহার করে রোযা ভঙ্গকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব নয়, এটাই ফতোয়া। (হানাফি ও মালেকি মাজহাবের আলেমগণ পানাহার করে রোযা ভঙ্গকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব করেন। (দেখুন: আল-মুফহিম-৩/১৭৩)

১১. অধীনদের দুনিয়াবি ও দ্বীনি প্রয়োজন পূরণ করে ইমামের খুশি প্রকাশ করা বৈধ। (আল-ফিরইয়াবি কর্তৃক বুলুগুল মারামের ব্যাখ্যা গ্রন্থ-১/৪২৬)

১২. মানুষ নিজের অভাবের কথা এমন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারে, যে তাকে সাহায্য করতে সক্ষম, যদি সে অভাব অভিযোগ আকারে পেশ না করে।

১৩. যদি কাফফারা আদায় না করে একাধিকবার দিনে সহবাস করে, তাহলে তার ওপর এক কাফফারা ওয়াজিব হবে, এতে কারো দ্বিমত নেই।
(আল-মাজমু-৬/৩৪৯, আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের লিস সুয়ূতি-১২৭)

১৪. যদি রমযানের দু'দিন অথবা তার চেয়ে অধিক সহবাস করে, তাহলে প্রত্যেক দিনের মোকাবেলায় একটি করে কাফফারা দিতে হবে।
(আল-মুগনি-৪/৩৮৬, আল-মাজমু-৬/৩৪৬, লাজনায়ে দায়েমার এটাই ফতোয়া, ফতোয়া-১৩৫৪৮)

১৫. রমযানের কাযায় যদি সহবাস করে, তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা নয়, কারণ বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কাফফারা শুধু রমযানের সম্মান বিনষ্টের কারণে ওয়াজিব হয়।
(দেখুন: আল-উম্ম-২/১০০, তাফসিরুল কুরতুবি-২/২৮৪, আল-মুগনি-৪/৩৭৮, লাজনায়ে দায়েমার ফতোয়া অনুরূপ, ফতোয়া-১৩৪৭৫)

১৬. সহবাস অবস্থায় যার ওপর ফজর উদিত হয়, সে যদি সাথে সাথে উঠে যায়, তাহলে তার ওপর কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে তাতে লিপ্ত থাকে, তাহলে সে গুনাহগার হবে, তার ওপর তওবা ও কাফফারাসহ অবশিষ্ট দিন বিরত থাকা ওয়াজিব। (দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া-৬/৩১৬, রওযাতুত তালেবিন-২/৩৬৫, আল-মুগনি-৪/৩৭৯, কাশশাফুল কানা-২/৩২৫, ইমাম বায়হাকি তার সুনান গ্রন্থে ইব্ন ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন: "যদি সালাতের আযান দেয়া হয়, আর ব্যক্তি তার স্ত্রীর ওপর থাকে, তাকে সে দিনের রোযা থেকে বিরত রাখা হবে না, যদি সে রোযা রাখতে চায় উঠে গোসল করবে ও তার রোযা পূর্ণ করবে।" (ইনশাআল্লাহ এটা বিশুদ্ধ)

১৭. যদি কেউ স্ত্রীগমনের জন্য পানাহার করে রোযা ভঙ্গ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে, কারণ সে বিনা কারণে ইফতার করেছে ও শরিয়তের বিপরীতে বাহানার আশ্রয় নিয়েছে, এ জন্য তার থেকে কাফফারা মওকুফ হবে না। (মাজমুউল ফাতাওয়া-২৫/২৬০, ইলামুল মুয়াক্কিয়িন-৩/২৪৭)

১৮. উপরিউক্ত ব্যক্তির ওপর ইসলামের উদারতা ও শিথিলতার প্রমাণ মিলে সে রমযানে কবীরা গুনাহ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভীতাবস্থায় এসে বলেছে : "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি", এটা তার অনুশোচনা ও তওবার প্রমাণ, ফলে

আল্লাহ তার তওবা কবুল করেছেন। নবী ﷺ তাকে কাফফারা প্রদান করেন, সে তা নিজের পরিবারে খরচ করে, তাদের অভাবের কারণে। এ জন্য নবী ﷺ হেসেছেন। (মিনহাতুল বারি-৪/৩৭৯, ফাতহুল বারি-৪/১৭১)

১৯. রমযান না জেনে যদি স্ত্রীগমন করে, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (ফাতাওয়া ইব্‌ন তাইমিয়াহ-২৫/২২৮, ইব্‌ন ইবরাহিম এর ফতোয়া-৪/১৯৫)

২০. ভুলে যদি কেউ সহবাস করে, তার রোযা বিশুদ্ধ, তার ওপর কাযা-কাফফারা কিছু ওয়াজিব হবে না।
(দেখুন : আল-উম্ম-২/৯৯, আল-ইস্তেযকার-১০/১১১, আল-মুফহিম-৩/১৬৯, শারহু ইব্‌ন মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/২১৭)

শিক্ষা-১৮

রোযাদারের বমির হুকুম

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ.

"রোযা অবস্থায় যার বমি হলো, তার ওপর কাযা জরুরি নয়। হ্যাঁ, যদি সে স্বেচ্ছায় বমি করে, তাহলে সে যেন কাযা করে।"

(আবু দাউদ-২৩৮০, আহমদ-২/৪৯৮, সহীহ ইব্‌ন খুজাইমা-১৯৬০, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান-৩৫১৮, সহীহ হাকেম-১/৮৫৫/৫৮৯)

মি'দান ইব্‌ন তালহা (র) থেকে বর্ণিত, "আবুদ দারদা (রা) তাকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করার পর রোযা ভঙ্গ করেছেন। পরবর্তীতে দামেস্কের এক মসজিদে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাস সাওবানের সঙ্গে সাক্ষাত করি, আমি বললাম : আবুদ দারদা আমাকে বলেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করার পর রোযা ভঙ্গ করেছেন। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি ঠিক বলেছেন। আমি তার পানি ঢেলেছি।" (আবু দাউদ-২৩৮১, আহমদ-৬/১৯, নাসায়ি ফিল কুবরা-৩২১০-৩১২৯, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান-১০৯৭, হাকেম-১/৫৮৮-৫৮৯)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৫টি

১. বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া যে, তার অনিচ্ছায় যেসব কাজ সংঘটিত হয়, সে জন্য তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন না। হ্যাঁ, বান্দার ইচ্ছাধীন কাজের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন বমি করা। অর্থাৎ আঙ্গুল ঢুকিয়ে বা গলায়

কিছু প্রবেশ করিয়ে, অথবা দুর্গন্ধ শুকে, অথবা বিরক্তিকর কোনো জিনিস দেখে বা কোনো কারণে বমি করল। যদি সে ইচ্ছাকৃত এমন করে, তবে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, অনিচ্ছাকৃত হলে রোযা নষ্ট হবে না।

২. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বমি করেছেন, অতঃপর রোযা ভঙ্গ করেছেন, এর অর্থ তিনি বমির কারণে দুর্বল হয়েছিলেন বিধায় সিয়াম ভঙ্গ করেছেন। বমির কারণে তিনি রোযা ভঙ্গ করেন নি। তাহাবির এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَلٰكِنِّيْ قِئْتُ فَضَعُفْتُ عَنِ الصَّوْمِ فَافْطَرْتُ.

"কিন্তু আমি বমি করেছি, ফলে রোযা পালন থেকে দুর্বল হয়ে গেছি, তাই আমি রোযা ভঙ্গ করেছি।" (তাহাবি: শরহু-মাআনিল আসার: ২/৯৭, উমদাতুলকারি: ১১/৩৬)

৩. এসব হাদীস প্রমাণ করে, স্বেচ্ছায় যে বমি করবে, তার রোযা ভেঙ্গে যাবে, হোক সে বমি তিক্ত পানি, খানা, কফ কিংবা রক্ত, কারণ এসব হাদীসের অর্থ ও ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। (আল-মুগনি লি ইব্‌ন কুদামাহ-৩/২৪)

৪. রমযানের দিনে রোযাদারের বমি করা বৈধ নয়. কারণ বমির কারণে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। হ্যাঁ, কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে রোগের কারণে অপারগ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

"তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।" (সূরা বাকারা-১৮৪) অর্থাৎ সে রমযানে পানাহার করে পরে কাযা করবে।(আস-সালাত লি ইব্‌ন কাইয়্যিম-১৩৪)

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে যে বমি করবে, তার রোযা ভঙ্গের বিধান ইসলামি শরিয়তের ইনসাফকে প্রমাণ করে। আরো প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রত্যেক বিধান বান্দার ওপর ইনসাফ ও রহমত। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ (র) বলেছেন : "রোযাদারকে সেসব বস্তু থেকে বারণ করা হয়েছে, যা তার শক্তি বৃদ্ধি করে ও খাদ্যের যোগান দেয়, যেমন খাদ্য ও পানীয়, অতএব যা তাকে দুর্বল করে ও যার ফলে তার খাদ্য বের হয়, তা থেকে তাকে বারণ করা হয়েছে। যদি তাকে এর অনুমিত দেয়া হয়, সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে ও ইবাদতে সীমালঙ্গনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

(মাজমুউল ফাতাওয়া-২৫/২৫০-২৫১)

শিক্ষা-১৯

রোযাদারের সুরমা ও মিসওয়াক ব্যবহার করা

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ ـ

"যদি আমার উম্মতের ওপর কষ্ট না হতো, তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় তাদেরকে অবশ্যই মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।" (বুখারী: ৮৪৭, মুসলিম-২৫২)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ ـ

"মিসওয়াক মুখ পবিত্র রাখা ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বস্তু।" (আহমদ-৬/৬২, নাসায়ি-১/১০, দারামি-৬৮৪, আবু ইয়ালা-৪৯৪৬, সহীহ ইব্ন খুয়াইয়াহ-১৩৫, ও সহীহ ইব্ন হিব্বান-১০৬৭)

ইব্ন ওমর (রা) বলেছেন : "দিনের শুরু ও শেষে মিসওয়াক করবে"।

তিনি আরো বলেছেন :

لَا بَأْسَ اَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ ـ

"রোযাদার শুষ্ক ভেজা মিসওয়াক দিয়ে মিসওয়াক করবে এতে সমস্যা নেই।"
(ইব্ন আবি শায়বাহ-২/২৯৬)

মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত: "নবী করীম ﷺ তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি জানতেন মিসওয়াকের পর রোযাদারের মুখে খুলুফ থাকবে, তিনি তাদেরকে স্বেচ্ছায় মুখ দুর্গন্ধময় করতে নির্দেশ দেননি, তাতে কোনো কল্যাণ নেই, বরং তাতে রয়েছে অনিষ্ট, তবে যে রোগে আক্রান্ত, যার থেকে মুক্তির পথ নেই সে ব্যতীত। (তাবরানি ফিল কাবির-২০/৭০, হাদিস-১৩৩, মুসনাদে শামি-২২৫০, হাফেয ইব্ন হাজার এর সনদ জাইয়্যেদ বলেছেন : তালখিস-২/২০২, কিন্তু হায়সামি বকর ইব্ন খুনাইস বর্ণনাকারীর কারণে হাদীসটি দুর্বল বলেছেন, তবে তিনি বলেছেন, ইব্ন মুয়িন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৩/১৬৫)

আনাস ইব্ন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, "তিনি রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।" (আবু দাউদ-২৩৭৮, ইব্ন আবি শায়বাহ-২/৩০৪, এ হাদীস মওকুফ। তিরমিযী বলেছেন : এ অধ্যায়ে নবী ﷺ থেকে মারফূ কোনো হাদীস নেই। তিরমিযি-৩/১০৫)

সাহান (র) থেকে বর্ণিত: "তিনি রোযাদার ব্যক্তির সুরমা **ব্যবহারে কোনো** সমস্যা মনে করতেন না।" (ইব্ন আবি শায়বাহ-২/৩০৪, যুহরি (রহ) **থেকে বর্ণিত, তিনি** বলেন : "রোযা পালনকারীর সুরমা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই"। **ইব্ন আবি শায়বাহ-২/৩০৪)**

যুহরি (র) বলেন : "রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।"

(ইব্ন আবি শায়বাহ-২/৩০৪)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৭টি

১. মিসওয়াকের ফযীলত, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক সালাতের সময় তার নির্দেশ দেয়ার ইচ্ছা করেছেন।

২. উম্মতের ওপর নবী ﷺ-এর দয়া যে, তিনি তাদের ওপর কষ্টের বিধান চাপিয়ে দেননি।

৩. দিনের শুরু ও শেষে রোযাদারের জন্য মিসওয়াক করা বৈধ। রোযাদার ও গায়রে রোযাদার সবার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নাত, সবাই হাদীসের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত।

৪. কাঁচা ও শুষ্ক সব মিসওয়াক রোযাদারের জন্য বৈধ।

(বুখারি-২/৬৮২, ফাতহুল বারি-৪/১৫৮, দেখুন: তামহিদ-১৯/৫৮)

৫. মিসওয়াকের সময় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হলে সমস্যা নেই, রোযা নষ্ট হবে না, তবে রক্ত গলাধঃকরণ করবে না।

(ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমাহ-১০/২৬৫, ফাতাওয়া-৩৭৮৫)

৬. রোযাদার সুরমা ব্যবহার করতে পারবে, অনুরূপ কান ও চোখের ড্রপ ব্যবহার করতে পারবে, যদিও স্বাদ অনুভব হয়, এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা তার ইঙ্গিত নেই, দ্বিতীয়ত এগুলো খাদ্যনালী নয়। (মাজমু ফাতাওয়া ইব্ন বায-১৫/২৬০-২৬১, শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া (রহ) এটা গ্রহণ করেছেন। দেখুন: ফিকহুল ইবাদাত লি ইব্ন উসাইমিন-১৯১-১৯২)

৭. নাকের ড্রপ যদি পেটে যায়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে, কারণ নবী ﷺ নাকে বেশি পানি দিতে নিষেধ করেছেন, যদি পেটে না পৌছে, কোনো সমস্যা নেই।

(দেখুন : ফাতাওয়া ইব্ন বায-১৫/২৬০, ফাতাওয়া ইব্ন উসাইমিন-১/৫২০)

৮. ইনহেলার (হাঁপানির স্প্রে) ও এ জাতীয় বস্তু যা ফুসফুসে যায়, রোযাদার ব্যবহার করতে পারবে, এতে কোনো সমস্যা হবে না।

(ফাতাওয়া ইব্ন বায-১/২৬৫, ফাতাওয়া ইব্ন উসাইমিন-১/৫০০)

৯. ইনজেকশনে রোযা ভাঙ্গবে না, মাংস বা রগ যেখানে গ্রহণ করা হোক, হ্যাঁ খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত ইনজেকশনে রোযা ভাঙ্গবে।

(মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়েল লি ইব্‌ন উসাইমিন-১৯২১৩-২১৫)

১০. রোযাদার যদি খাদ্য জাতীয় ইনজেকশন নিতে বাধ্য হয়, তাহলে অসুস্থতার জন্য সে তা নিবে ও পরে রোযাটি কাযা করবে।

১১. যদি রোযাদার কঠিন ঘ্রাণযুক্ত তেল ব্যবহার করে, রোযা ভঙ্গ হবে না, কারণ ঘ্রাণ যত শক্তিশালী হোক রোযা ভঙ্গের কারণ নয়।

(মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়েল লি ইব্‌ন উসাইমিন-১৯/২২৫-২২৮)

১২. অসুস্থতার জন্য ডুশ (সাপোজিটার) ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না, অতএব রোযা পালনকারী এটা ব্যবহার করতে পারে।

(ফাতাওয়া ইব্‌ন উসাইমিন-১/২০৫)

১৩. দাঁতের মাজন রোযা ভঙ্গকারী নয়, বরং তা মিসওয়াকের মতোই, তবে পেটে যেন না যায় সে জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, যদি অনিচ্ছায় পেটে যায়, তবে সমস্যা নেই।

(মাজমুউ ফাতাওয়া ইব্‌ন উসাইমিন-১/২০৫, মাজন দ্বারা রাতে দাঁত মাজাই উত্তম।)

১৪. গড়গড়ার ওষুধের কারণে রোযা ভঙ্গ হবে না, যদি তা গলাধঃকরণ না করে, তবে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।

(মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়েল লি ইব্‌ন উসাইমিন-১৯/৯০)

১৫. মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য স্প্রে ব্যবহার করা বৈধ, যদি তার মূল ধাতু গলায় না পৌঁছে। (আল-মুনতাকা-৩/১৩০)

১৬. রোযাদারের থু থু গলাধঃকরণে সমস্যা নেই, কিন্তু নাকের শ্লেষ্মা বা কফ গলাধঃকরণ বৈধ নয়, কারণ এগুলো থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

(ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমাহ-৯৫৮৪, ফাতাওয়া ইব্‌ন বায-৩/২৫১)

১৭. মলদ্বারে সিরিজ দ্বারা তরল পদার্থ প্রবেশ করালে রোযা ভাঙ্গবে না।

(তুহফাতুল ইখওয়ান লি ইব্‌ন বায-৮২)

শিক্ষা-২০

রোযার ফযীলত

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ ۔

"রোযা ঢাল স্বরূপ"। (বুখারী-১৭৯৫, মুসলিম-১১৫১)

মুসানাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে :

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ ۔

"সিয়াম ঢাল ও জাহান্নাম থেকে সুরক্ষার মজবুত কিল্লা।" (আহমদ-২/৪০২)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন :

اِنَّ الصِّيَامَ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ ۔

"নিশ্চয় সিয়াম ঢাল স্বরূপ, বান্দা এর দ্বারা জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা লাভ করবে।" (আহমদ-৩/৩৯৬)

উসমান ইব্‌ন আবুল আস সাকাফি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি :

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ۔

"সিয়াম জাহান্নাম থেকে ঢাল স্বরূপ, তোমাদের কারো যুদ্ধের ময়দানের ঢালের ন্যায়।" (আহমদ-৪/২২, নাসায়ি-৪/১৬৭, ইবনে মাজাহ-১৬৩৯, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ-২১২৫, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৬৪৯)

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি :

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مَالَمْ يَخْرِقْهَا ۔

"রোযা ঢাল, যতক্ষণ না তা ভাঙ্গা হয়।" (নাসায়ী-৪/১৬৭, আহমদ-১/১৯৫, তায়ালিসি-২২৭, আবু ইয়ালা-৮৭৮, দারামি-১৭৩২, মুনযিরি হাদীসটি হাসান বলেছেন -২/৯৪০, হাদীস নং-১৬৪৩, শায়খ আহমদ শাকের হাদীসটি সহীহ বলেছেন-১৬৯০, এ হাদীসের সনদে বাশশার ইব্‌ন আবু ইয়াসূফ আল-জুরমি রয়েছেন, যাকে ইব্‌ন হিব্বান ব্যতীত কেউ গ্রহণযোগ্য বলেন, দায়িকে সুনানে নাসায়িতে আলবানি হাদীসটি দুর্বল

বলেছেন, তিনি হয়তো এ কারণে হাদীসটি দুর্বল বলেছেন, তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা এটি **শক্তিশালী** হয়।)

ক. রোযা প্রকৃতপক্ষে ঢাল, তাই রোযা পালনকারীর কর্তব্য এ ঢালের হিফাজত করা, এ দিকে ইশারা করে নবী করীম ﷺ বলেছেন :.... فَلَا يَرْفُثْ

খ. রোযা উপকারিতার ভিত্তিতে ঢালস্বরূপ, অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে– এ হিসেবে এদিকে ইশারা করে নবী করীম ﷺ বলেছেন :

يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِ

"সে তার প্রবৃত্তি ও খানা আমার জন্য ত্যাগ করে।"

গ. রোযা সওয়াবের হিসেবে ঢালস্বরূপ, এ দিকে ইশারা করে নবী ﷺ বলেছেন ;

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَاعَدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا .

"আল্লাহর রাস্তায় যে একদিন রোযা পালন করল, আল্লাহ তার চেহারা জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে নিয়ে যাবেন।"

শিক্ষা ও মাসায়েল ৪টি

১. রোযা কুপ্রবৃত্তিকে বশীভূত করে, যে কুপ্রবৃত্তি ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। এ জন্য রোযা জাহান্নামের ঢালস্বরূপ। ইরাকি বলেন : "রোযা জাহান্নামের ঢাল, কারণ সে প্রবৃত্ত থেকে বিরত রাখে, আর জাহান্নাম প্রবৃত্তি দ্বারা আবৃত।" (দেখুন: তারহুত তাসরিব ফি শারহিত তাকরিব-৪/৯০)

২. রোযা ফযীলত পূর্ণ, মুসলিমদের উচিত অধিক পরিমাণ নফল রোযা পালন করা, যদি সে তার ক্ষমতা রাখে ও তার চেয়ে উত্তম আমলের প্রতিবন্ধক না হয়, যেমন জিহাদ ইত্যাদি।

৩. সে রোযা জাহান্নামের ঢালস্বরূপ, যে রোযায় সওয়াব হ্রাসকারী বা রোযা বিনষ্টকারী কথা বা কর্ম সংঘটিত হয়নি, যেমন গীবত, নামীমা, মিথ্যা ও গালি। কারণ আবু উবাইদার বর্ণনায় এসেছে: "রোযা ঢাল, যতক্ষণ না সে তা ভেঙ্গে ফেলে।" রোযা ভঙ্গ হয় হারাম কর্ম দ্বারা, অতএব রোযা পালনকারীর উচিত তার রোযাকে সওয়াব বিনষ্টকারী অথবা সওয়াব হ্রাসকারী কর্মকাণ্ড থেকে হিফাজত করা, যেন তার রোযা তার জন্য জাহান্নামের ঢাল হয়।

৪. রোযার উদ্দেশ্য নফসকে পবিত্র করা ও অন্তর সংশোধন করা, শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকা নয়।

শিক্ষা-২১

রোযাদারের জন্য শিঙ্গা ব্যবহার করা

শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আমার হাত ধরে **'বাকি'** নামক স্থানে এক ব্যক্তির নিকট আগমন করেন, যে শিঙ্গা লাগাচ্ছিল, তখন আঠারো রমযান। তিনি বললেন :

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ـ

"যে শিঙ্গা লাগায় আর যার লাগানো হয় উভয় ইফতার করল।" (আবু দাউদ-২৩৬৯, নাসায়ি ফিল কুবরা-৩১২৬, ইবনে মাজাহ-১৬৮১, আহমদ-৪/১২৩, আলি ইবনে মাদিনি ও বুখারি হাদীসটি সহীহ বলেছেন, দেখুন: তালখিসুল হাবির-২/১৯৩, আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ তার পিতার মাসআলা সমগ্রে নকল করেন: যে শিঙ্গা লাগায় এবং যার লাগানো হয়, উভয়ের রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারে এটা সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস। মাসায়েলে ইমাম আহমদ-৬৮২, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৫৩৩, হাকেম-১৫৯২, মাজমু গ্রন্থে হাদীসটি ইমাম নববী সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন : এ হাদীস ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক-৬/৩৫০)

সাওবান, (দেখুন: সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস: আবু দাউদ-২৩৭১, ইবনে মাজাহ-১৬৮০, দারামি-১৭৩১, আহমদ-৫/২৭৬, তায়ালিসি-৯৮৯, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৫৩২, ইবনে খুযাইমাহ-১৯৬২-১৯৬৩) রাফে ইবনে খাদীজ (দেখুন: রাফে ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণিত হাদীস: তিরমিযী-৭৭৪, আহমদ-৩/৪৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৫৩৫) ও একদল সাহাবি থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে, এ জন্য একদল আলেম এ হাদীসকে মুতাওয়াতির বলেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "নবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন, তিনি রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।"

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে: "তিনি রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন"।

(দেখুন: বুখারী: ১৮৩৬, মুসলিম-১২০২, আবু দাউদ-২৩৭২-২৩৭৪, তিরমিযি-৭৭৫-৭৭৭)

শু'বা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি সাবেত আল-বুনানিকে বলতে শুনেছি, তিনি মালিক ইবনে আনাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিঙ্গা অপছন্দ করতেন?" তিনি বললেন : না, তবে দুর্বলতার কারণে।" (বুখারী-১৮৩৮)

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আনাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : "দুর্বলতার কারণে আমরা রোযাদারের জন্য শিঙ্গা অপছন্দ করতাম।" (আবু দাউদ-২৩৭৫)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. একাধিক হাদীস প্রমাণ করে যে, শিঙ্গা উভয়ের রোযা ভঙ্গ করে; যে লাগায় ও যার লাগানো হয়। আবার এর বিপরীতে অন্যান্য হাদীস রয়েছে, যা প্রমাণ করে নবী ﷺ রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। তাই শিঙ্গার ব্যাপারে আলেমদের ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। জমহুর আলেম বলেন রোযাদারের জন্য শিঙ্গা লাগানো বৈধ। নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলো বৈধতার হাদীস দ্বারা রহিত ও মানসুখ। (দেখুন: আবু সায়িদ খুদরি, ইবনে মাসউদ ও উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত রোযা পালনকারীর জন্য শিঙ্গা লাগানো বৈধ। উরওয়া, সায়িদ ইবনে জুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ তিন ইমাম: আবু হানিফা, মালেক ও ইমাম শাফে'ঈ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল-মুগনি-৪/৪৫০, মুহাল্লা-৬/২০৪-২০৫, ফাতহুল বারি লি ইবনে হাজার-৪/১৭৪-১৭৮, সুবুলুস সালাম-২/১৫৮-১৬০, নাইলুল আওতার-৪/২৭৫)

ইমাম আহমদের মাযহাব হচ্ছে, শিঙ্গা রোযা ভঙ্গকারী। শায়খুল ইসলাম ও তার শিষ্য ইবনুল কাইয়্যেম এ মত গ্রহণ করেছেন। (দেখুন: যারা বলেছেন শিঙ্গার কারণে রোযা ভেঙ্গে যাবে, তাদের মধ্যে আতা ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদি অন্যতম, ইমাম আহমদের এ মাযহাব। ইসহাক, ইবনে মুনযির ও ইবনে খুযাইমাহ তদনুরূপ বলেছেন। ইবনে কুদামা একদল সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা রাতে শিঙ্গা লাগাতেন। তাদের মধ্যে ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু মূসা ও আনাস অন্যতম। আল-মুগনি-৪/৩৫০, মাজমুউল ফাতাওয়া-২৫/২৫৭, রিসালা হাকিকাতুস সিয়াম-৮১-৮৪, তাহযিবুস সুন্না-৬/৩৫৪-৩৬৮, ইলামুল ময়াক্কিয়িন-২/৫২)

ইব্‌নুল কাইয়েম (র) বলেন : রোযাদারের জন্য শিঙ্গা জায়েয মন্তব্যকারীগণ চারটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত এ কথা বলতে পারেন না:

ক. নবী ﷺ শিঙ্গা লাগিয়েছেন সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থ অবস্থায় নয়।

খ. তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছেন মুকিম অবস্থায়, মুসাফির অবস্থায় নয়।

গ. তিনি ফরয রোযায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন, নফল রোযায় নয়।

ঘ. তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছেন নিষেধ করার পর, আগে নয়। যখন এ চারটি বিষয় প্রমাণ হবে, তখন বলা যাবে যে, রোযাদারের জন্য শিঙ্গা লাগানো বৈধ, অন্যথায় নয়।" (যাদুল মা'আদ-৪/৬১-৬২)

সৌদি আরবের লাজনায়ে দায়েমা অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছে। (দেখুন: ফাতাওয়াল লাজনাহ-১০/২৬১-২৬২, ফাতাওয়া-১১৯১)

সৌদি আরবের অধিকাংশ আলেম এটাই গ্রহণ করেছেন। অতএব রোযাদারের দিনে শিঙ্গা পরিহার করাই সতর্কতা, এতে কোনো ইখতিলাফ থাকে না।

২. আনাস (রা) হাদীস প্রমাণ করে যে, শিঙ্গা রোযা দুর্বল করে, তাই নিষেধ করা হয়েছে। এটা শরিয়তের এক বৈশিষ্ট্য, সে তার অনুসারীদের থেকে কষ্ট দূরীভূত করে।

৩. শিঙ্গা শরীর দুর্বল করে, তাই রোযা ভঙ্গকারী। যে শিঙ্গা লাগায় তার রোযা ভঙ্গের কারণ হচ্ছে, রক্ত চোষণের ফলে তার মুখে রক্ত প্রবেশ করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। হ্যাঁ যদি সে মুখে না চোষে, আধুনিক যন্ত্র দ্বারা টেনে বের করে, তাহলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না"। (দেখুন: শারহুল মুমতি-৬/৩৮২)

৪. অপারেশন দ্বারা বিষাক্ত রক্ত বের করলে রোযা পালনকারীর রোযা ভেঙ্গে যাবে, তবে ডাক্তারের রোযা ভঙ্গ হবে না। (দেখুন: ফাতাওয়ায়ে লাজনায়ে দায়েমা-১০/২৬২, ফাতাওয়া-৫৪৭), এটাই শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার পছন্দনীয় অভিমত। মাজমুউল ফাতাওয়া-২৫/২৬৮, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহি তার ফাতাওয়াতে এ মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন-৪/১৯১)

৫. মাথা হালকা করা বা কোনো কারণে স্বেচ্ছায় নাক থেকে রক্ত বের করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, অনিচ্ছায় অধিক রক্ত বের হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। (এটা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ফি ইখতিয়ারুল ফিকহিয়্যাহ; ১০৮০, ইবনে ইবরাহিম-৪/১৯১ ও উসাইমিন-১৯/২৪৯ প্রমুখগণের অভিমত। দেখুন: ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ-১০/২৬৪, ফাতাওয়া-৩৪৫৫) রক্ত বের হওয়ার কারণে যদি শরীর দুর্বল হয় ও রোযা ভাঙ্গার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার অনুমতি রয়েছে, কারণ সে অসুস্থ।

৬. রক্ত পরীক্ষা করলে রোযা ভঙ্গ হবে না, হ্যাঁ ইখতিলাফ এড়িয়ে চলার জন্য এসব কাজ রাতে করা উত্তম। তবে রক্ত বেশি বের হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, তাই রাত ব্যতীত এসব কাজ না করা উত্তম। অসুখের জন্য প্রয়োজন হলে করবে, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে পরে তা কাযা করবে। (দেখুন : ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা-১০/২৬৩, ফাতাওয়া-৫৬, মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায-৩/২৩৮-২৩৯, মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন-১৯/২৫০-২৫১)

৭. অনিচ্ছাকৃতভাবে রোযাদারের শরীর থেকে দুর্ঘটনা অথবা যখমের কারণে অধিক রক্ত বের হলে, রোযা নষ্ট হবে না। যদি দুর্বলতার কারণে রোযা ভাঙ্গতে বাধ্য হয়, তাহলে সে অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় রোযা ভাঙ্গবে ও কাযা করবে। (দেখুন: ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন-১/৫১৪)

৮. দাঁত থেকে রক্ত বের করার কারণে রোযা ভাঙ্গবে না, যদিও বেশি রক্ত বের হয়, কারণ সে রক্ত বের করার জন্য তা বের করেনি, রক্ত তার ইচ্ছা ব্যতীত বের হয়েছে, কিন্তু সে রক্ত গিলবে না, যদি ইচ্ছাকৃত রক্ত গিলে ফেলে, রোযা ভেঙ্গে যাবে।

(দেখুন: মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন-১৯/২৪৯-২৫৩)

৯. ডাক্তারি যন্ত্র দ্বারা কিডনি পরিষ্কার করে সে রক্ত বিভিন্ন কেমিক্যাল যেমন সুগার, লবন ইত্যাদি মিশিয়ে পুনরায় তা শরীরে প্রতিস্থাপন করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (দেখুন; ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা-৪৪৯৯)

১০. শিঙ্গার ন্যায় রক্ত দান করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, তাই রাত ব্যতীত এ কাজ করবে না, তবে কাউকে বাঁচানোর জন্য রক্ত দেয়ার প্রয়োজন হলে দিবে, রোযা ভঙ্গ করবে ও পরে কাযা করবে।

(দেখুন: ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন-১/৫১১)

১১. খাদ্য জাতীয় ইনজেকশনের ফলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

(দেখুন: ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা-(৫১৭৬)

শিক্ষা-২২

ঋতুবতী নারীর রোযা ভাঙ্গা ও কাযা

মুয়াযাহ বিনতে আব্দুল্লাহ আল-আদাবি (র) বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করি : ঋতুবতী কেন রোযা কাযা করে, সালাত কাযা করে না? তিনি বললেন : তুমি কি হারুরি? আমি বললাম : আমি হারুরি না, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, তিনি বললেন : আমাদের এমন হতো, অতঃপর আমাদেরকে শুধু রোযা কাযার নির্দেশ দেয়া হতো, সালাত কাযার নির্দেশ দেয়া হতো না।

(বুখারী-৩১৫, মুসলিম-৩৩৫)

মুয়াযাহ থেকে ইমাম তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা) বলেন : "আমাদের প্রত্যেকে কি ঋতুকালীন সালাত কাযা করবে? তিনি বললেন : তুমি কি হারুরি? আমাদের কারো ঋতুস্রাব হলে, কাযার নির্দেশ দেয়া হত না।

(তিরমিযী-১৩০)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ঋতুবতী হতাম, অতঃপর পবিত্রতা অর্জন করতাম, তিনি আমাদেরকে রোযা কাযার নির্দেশ দিতেন, কিন্তু সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান। অতঃপর তিনি বলেন : এ হাদীস অনুযায়ী আহলে ইলমের আমল, অর্থাৎ ঋতুবতী নারী রোযা কাযা করবে, সালাত কাযা করবে না। এ ব্যাপারে তাদের দ্বিমত সম্পর্কে জানি না।

(তিরমিযী-৭৮৭)

আয়েশা (রা) তুমি কি হারুরি" বলে, এ প্রশ্নের প্রতি অনীহা ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। হারুরি খারেজি সম্প্রদায়ের একটি গ্রুপ। কুফার নিকটে অবস্থিত হারুরা শহরে তাদের বসতি, এ জন্য তাদেরকে হারুরি বলা হয়, সেখান থেকে তাদের উৎপত্তি। তাদের মধ্যে ছিল দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা। (ফাতহুল বারি : ১/৪২২) তাদের কেউ হাদীস ও ইজমার বিপরীত ঋতুবতী নারীর ওপর ঋতুকালীন সালাতের কাযার নির্দেশ দিত। (দেখুন : আল-মুগনি: ১/১৮৮, হাশিয়া সিনদি আলা সুনানে নাসায়ি : ৪/১৯১, উমদাতুল কারি: ৩/৩০০ এ জন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশক শব্দ দ্বারা তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কি তাদের কেউ?

শিক্ষা ও মাসায়েল ১০টি

১. দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা হারাম। কুরআন হাদীসের সীমারেখায় অবস্থান করা ও সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আল্লাহর দেয়া শিথিলতা বা রুখসত গ্রহণ করা। দ্বীনের ব্যাপারে যেরূপ বাড়াবাড়ি খারাপ, অনুরূপ

বাহানা তালাশ নিন্দনীয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উত্তম, অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ওপর আমল করা।

২. দ্বীনের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপকারীদের নিষেধ করা বৈধ, যেন সঠিকভাবে শরীয়তের বাস্তবায়ন হয় এবং কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

৩. কোন প্রশ্নের কারণে প্রশ্নকারী সম্পর্কে যদি মুফতির মনে খারাপ ধারণা জন্মায় তাহলে প্রশ্নকারীর ব্যাখ্যা দেয়া উচিত যে, তিনি গোড়া নন বরং জানতে ইচ্ছুক, যেমন মুয়াযাহ বলেছেন : "আমি হারুরি নই, কিন্তু প্রশ্ন করছি" তখন মুফতির কর্তব্য দলিল দ্বারা তার প্রশ্ন দূর করা, যেমন আয়েশা (রা) করেছেন।

৪. শরীয়তের মূল ভিত্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ। এ জন্য আয়েশা (রা) তাকে বলেছেন : নবী করীম ﷺ তাদের রোযা কাযার নির্দেশ দিতেন, সালাত কাযার নির্দেশ দিতেন না। অর্থাৎ যদি সালাতের কাযা ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম ﷺ অবশ্যই তাদের কাযা করার নির্দেশ দিতেন। কারণ তিনি ছিলেন উম্মতের সবচেয়ে হিতাকাঙ্ক্ষি, তিনি উম্মতের জন্য প্রত্যেক বিষয় স্পষ্ট করে গেছেন। (উমদাতুলকারী : ৩/৩০১) মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহর নির্দেশে পরিপূর্ণ সোপর্দ হওয়া, তার শরিয়তকে সম্মান প্রদর্শন করা ও দলিলের সামনে থেমে যাওয়া। আদেশগুলো বাস্তবায়ন করা, যেহেতু শরীয়তের আদেশ, নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকবে, শরিয়তের নিষেধ, কারণ বুঝা যাক বা না যাক।

৫. ইবনে আব্দুল বার (রহ) বলেছেন : 'ঋতুবতী নারী রোযা পালন করবে না, বরং কাযা করবে, তবে সালাত কাযাও করবে না। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ। সকল মুসলিম যেখানে একমত, সেটা সঠিক ও চূড়ান্ত সত্য। (তামহিদ-২২/১০৭)

৬. নারীর ওপর ইসলামি শরীয়তের ছাড় এই যে, তাদেরকে সালাত কাযার নির্দেশ দেয়া হয়নি, কারণ সালাত দিনে একাধিক বার, যার কাযা খুব কষ্টকর। এ জন্য নারীদের উচিত আল্লাহর শোকর আদায় করা।

৭. নারী যদি ফজর উদিত হওয়ার সময় পাক হয়, তাহলে সে দিনের রোযা তার শুদ্ধ হবে না, কাযা করা জরুরি, কারণ যখন ফজর উদিত হয়েছে, তখন সে ঋতুবতী। নারী যদি সূর্যাস্তের সামান্য আগে ঋতুবতী হয়, তাহলে তার রোযা বাতিল কাযা করা ওয়াজিব।

(ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা : ১০/১৫৫, ফাতাওয়া নং : (১০৩৪৩)

৮. নারী যদি সূর্যাস্ত যাওয়ার সামান্য পর ঋতুবতী হয়, তাহলে সে দিনের রোযা শুদ্ধ।

৯. নারী যদি রোযা অবস্থায় রক্ত আসা অথবা তার ব্যথা অনুভব করে, সূর্যাস্তের আগে বের না হয়, তাহলে তার রোযা শুদ্ধ।
(ফাতাওয়া আল-জামেয়াহ লিল মারআল মুসলিমাহ লি ইবনে উসাইমিন : ১/৩২৫)

১০. এ হাদীস থেকে বুঝায়, অসুস্থ ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করতে পারবে, যদিও তার রোযার ক্ষমতা থাকে, যদি রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে। কারণ ঋতুবতী নারী একেবারে দুর্বল হয় না, বরং রক্ত বের হওয়ার কারণে তার ওপর রোযা কষ্টকর, আর রক্ত বের হওয়া একটি রোগ। (শারহু ইবনে বাত্তাল আলাল বুখারী : ৪/৯৭-৯৮)

শিক্ষা-২৩

রোযার জন্য জান্নাতের একটি দরজা

সাহাল ইবন সাদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانُ لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ .

“জান্নাতে আটটি দরজা, তাতে একটি দরজাকে “রাইয়ান” বলা হয়, তা দিয়ে রোযাদার ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবে না।” (বুখারী-৩০৮৪, মুসলিম-১১৫৫, তিরমিযী-৭৬৫, নাসায়ি-৪/১৬৮, ইবন মাজাহ-১৬৪০, আহমদ-৫/৩৩৫)

বুখারির বর্ণিত শব্দে হাদীসটি এসেছে এভাবে :

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ .

“নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা আছে, যাকে বলা হয় রাইয়ান, কিয়ামতের দিন তা দিয়ে রোযাদার প্রবেশ করবে, তাদের ব্যতীত কেউ সেখান থেকে প্রবেশ

করবে না। বলা হবে : রোযাদারগণ কোথায়? ফলে তারা দাঁড়াবে, তাদের ব্যতীত কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবে না, যখন অন্যরা প্রবেশ করবে বন্ধ করে দেয়া হবে, অতঃপর কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবে না।" (বুখারী-১৭৯৭)

তিরমিযির বর্ণিত শব্দ :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَبَابًا يُدْعَى الرَّيَّانُ، يُدْعَى لَهُ الصَّائِمُوْنَ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا .

"জান্নাতে একটি দরজা আছে, যাকে রাইয়ান বলা হয়, তার জন্য রোযাদারকে আহ্বান করা হবে, যে রোযাদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে তাতে প্রবেশ করবে, যে তাতে প্রবেশ করবে কখনো পিপাসার্ত হবে না।" (তিরমিযী-৭৬৫, তিনি বলেছেন : হাসান-সহীহ-গরিব।)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন :

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ : هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ (رضى) بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

"আল্লাহর রাস্তায় যে দু'টি জিনিস খরচ করল, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে: হে আব্দুল্লাহ! এটা কল্যাণ। যে সালাত আদায়কারী তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদার তাকে রাইয়ান দরজা থেকে ডাকা হবে। যে দানশীল তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার

মাতা-পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ। যাকে এক দরজা থেকে ডাকা হবে, তার বিষয়টি পরিষ্কার, কিন্তু কাউকে কি সকল দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।"

(বুখারী-১৭৯৮, মুসলিম-১০২৭)

বুখারি ও মুসলিমের অন্য শব্দে এসেছে :

دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ : اَىْ فُلْ، هَلُمَّ.

"জান্নাতের প্রহরী তাকে ডাকবে, প্রত্যেক দরজার প্রহরী বলবে: হে অমুক! আস।" (বুখারী-২৬৮৬, মুসলিম-১০২৭)

ইমাম আহমাদের বর্ণিত শব্দ :

لِكُلِّ اَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِذٰلِكَ الْعَمَلَ، وَلاَهْلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُدْعَوْنَ مِنْهُ، يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَلْ اَحَدٌ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَا اَبَا بَكْرٍ .

"প্রত্যেক আমলের লোকের জন্য জান্নাতে একটি করে দরজা আছে, তাদেরকে সে আমল দ্বারা ডাকা হবে। রোযাদারদের একটি দরজা রয়েছে, তাদেরকে সেখান থেকে ডাকা হবে, যাকে বলা হয় রাইয়ান। আবু বকর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! কাউকে কি সব দরজা থেকে ডাকা হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হে আবু বকর।"

(মুসনাদে আহমদ-২/৪৪৯)

আবু বকর (রা)-এর উদ্দেশ্য, যাকে জান্নাতের এক দরজা দিয়ে ডাকা হলো, তার জন্য এটাই যথেষ্ট, প্রত্যেক দরজা থেকে ডাকার প্রয়োজন নেই। কারণ মূল উদ্দেশ্য জান্নাতে প্রবেশ করা, যা এক দরজা দিয়ে সম্পন্ন হয়। তারপরও কাউকে কি সব দরজা থেকে ডাকা হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হ্যাঁ বলে উত্তর দিলেন।

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. রোযার ফযীলত যে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা থেকে একটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২. "বাবে রাইয়ান" জান্নাতের একটি দরজার নাম। "রাইয়ান" الـرَّيَّانِ। শব্দটি الـرِّيِّ। ধাতু থেকে নেয়া, যা পিপাসার বিপরীত, রোযাদার যেহেতু নিজেকে পানি থেকে বিরত রাখে, যা মানুষের খুব প্রয়োজন, সেহেতু তার যথাযথ প্রতিদান হিসেবে আখিরাতে তাকে পান করানো হবে, যার পর কখনো সে তৃষ্ণার্ত হবে না।

৩. হাদিসে উল্লেখিত ইবাদত: সালাত, জিহাদ, রোযা ও সদকা জান্নাতের এক একটি দরজা। প্রত্যেক দরজা তার আমলকারীর জন্য খাস থাকবে, এখানে উদ্দেশ্য যার যে আমল বেশি তার জন্য সে দরজা বরাদ্দ।

৪. জান্নাতের দরজায় ফেরেশতাদের থেকে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে, তারা প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমল অনুসারে তার জন্য নির্দিষ্ট দরজা থেকে ডাকবে, এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ফেরেশতারা নেককার আদম সন্তানদের মহব্বত করে ও তাদের কারণে খুশি হয়। (ফাতহুল বারি-৭/২৯)

৫. আবু বকর (রা)-এর ফযীলত যে, তাকে প্রত্যেক দরজা থেকে ডাকা হবে, কারণ সে প্রত্যেক আমল করত। আবু বকরের ব্যাপারে নবী ﷺ আশা অবশ্যই সত্যে পরিণত হবে। ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদিসে এসেছে, আবু বকরকে প্রত্যেক দরজা থেকে ডাকা হবে, বরং জান্নাতের প্রত্যেক গলি ও ঘর থেকে ডাকা হবে। (সহীহ ইবন হিব্বান-৬৮৬৭, ইবন আব্বাসের হাদিসে দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু হায়সামি তাকে শক্তিশালী বলেছেন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৯/৪৬)

৬. হাদীস থেকে বুঝে আসে, যাদেরকে সব দরজা থেকে ডাকা হবে, তাদের সংখ্যা খুব কম। (ফাতহুল বারি-৭/২৮)

৭. হাদীস থেকে আরো বুঝে আসে যে, এখানে উদ্দেশ্য নফল আমল, ওয়াজিব নয়, কারণ ওয়াজিব আদায়কারীর সংখ্যা প্রচুর হবে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম হবে, যাদের আমলনামায় অধিকহারে সবপ্রকার আমল থাকবে এবং যাদেরকে জান্নাতের সব দরজা থেকে ডাকা হবে।

(ফাতহুল বারি : ৭/২৮-২৯)

৮. সামনে মানুষের প্রশংসা করা বৈধ, যদি তার ওপর গর্ব ইত্যাদির আশঙ্কা না থাকে। (শারহুন নববী আলা মুসলিম-৭/১১৭)

৯. যে সব আমল করে ও নিয়মিত করে, তাকে জান্নাতের সব দরজা থেকে

ডাকা হবে, এটা তার প্রতি সম্মান ও ইজ্জত প্রদর্শন স্বরূপ, **তবে সে প্রবেশ** করবে এক দরজা দিয়ে।

১০. সাধারণত প্রত্যেক প্রকার নেক আমলের তওফিক একজন **মানুষের হয় না,** যার এক আমলের তাওফিক হয়, তার থেকে অপর আমল **ছুটে যায়, এটাই** স্বাভাবিক। খুব কম লোকের তওফিক হয় প্রত্যেক প্রকার আমল **করা, আর** সে কমের অন্তর্ভুক্ত আবু বকর। (আত-তামহিদ-৭/১৮৪-১৮৫)

১১. যার যে আমল বেশি, সে আমল দ্বারা সে প্রসিদ্ধি লাভ করে ও সে আমলের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করা হয়, দেখুন নবী ﷺ-এর বাণী: "যে সালাত আদায়কারীদের দলভুক্ত হবে।" তার উদ্দেশ্য যার যে আমল বেশি, তাকে সে আমল দ্বারা ডাকা হবে, কারণ সব মুসলিম সালাত আদায় করে। (আত-তামহিদ-৭/১৮৫)

শিক্ষা-২৪

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা পালন করা

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ

"যে মারা গেল, অথচ তার রোযা রয়েছে, তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে।" (বুখারী-১৮৫১, মুসলিম-১১৪৭)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضٰى ـ

"এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আসল, অতঃপর সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে, তার জিম্মায় এক মাসের রোযা রয়েছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে কাযা করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তোমার মায়ের ওপর

ঋণ থাকে, তার পক্ষ থেকে তুমি কি তা আদায় করবে? সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন : অতএব আল্লাহর ঋণ বেশি হকদার, যা কাযা করা উচিত।"

(বুখারী ও মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে :

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا يَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّيْ ذٰلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَصُوْمِيْ عَنْ أُمِّكِ.

"জনৈক নারী নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে, তার ওপর মান্নতের রোযা রয়েছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখব? তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, তোমার মার ওপর যদি ঋণ থাকে, আর তুমি তা আদায় কর, তাহলে কি যথেষ্ট হবে? সে বলল : হ্যাঁ, তিনি বললেন : তোমার মায়ের পক্ষ থেকে তুমি রোযা রাখ।"

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّيْ تَصَدَّقْتُ عَلٰى أُمِّيْ بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ : فَقَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيْرَاثَ، قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ : صُوْمِيْ عَنْهَا، قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : حُجِّيْ عَنْهَا.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসেছিলাম, ইত্যবসরে তাঁর নিকট এক নারী এসে বলল : আমি আমার মাকে এক "দাসী" সদকা করেছি, কিন্তু সে মারা গেছে। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমার সওয়াব হয়ে গেছে, তুমি তা মিরাস হিসেবে ফিরিয়ে নাও। সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল!

তার জিম্মায় একমাসের রোযা ছিল, আমি কি তার **পক্ষ থেকে রোযা রাখব?** তিনি বললেন : তার পক্ষ থেকে রোযা রাখ। সে বলল : **তিনি কখনো হজ্ব** করেননি, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করব? তিনি বললেন : **তার পক্ষ থেকে** হজ্ব কর।" (মুসলিম-১১৪৯, আবু দাউদ-২৮৭৭, নাসায়ি ফিল কুবরা-৬৩১৪, ইবন মাজাহ-২৩৯৪)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. শারীরিক ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব হয় না এটাই মূলনীতি, তবে রোযা এ নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যেমন নয় হজ্ব। হাফেয ইবনে আব্দুল বার (র) বলেছেন : "সালাতের ব্যাপারে সবাই একমত যে, কেউ কারো পক্ষ থেকে সালাত আদায় করবে না, না ফরয, না সুন্নাত, না নফল, না জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে, না মৃত ব্যক্তির। অনুরূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা, জীবিতাবস্থায় একের রোযা অপরের পক্ষ থেকে আদায় হবে না। এতে ইজমা রয়েছে, কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু যে মারা যায়, তার জিম্মায় যদি রোযা থাকে, তার ব্যাপারে পূর্বাপর আলেমদের ইখতিলাফ রয়েছে।" (আল-ইস্তেযকার: ৯৪/৩৪০, এ বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন কাযি আয়ায ফি ইকমালিল মুয়াল্লিম-৪/৪০৪ ও কুরতুবি ফিল মুফহিম-৩/২০৮-২০৯)

২. মৃতব্যক্তির জিম্মায় যদি রোযা থাকে, তার দুই অবস্থা :

ক. কাযার সুযোগ না পেয়ে মারা যাওয়া, সময়ের সংকীর্ণতা, অথবা অসুস্থতা, অথবা সফর, অথবা রোযার অক্ষমতার দরুন কাযার সুযোগ পায়নি, অধিকাংশ আলেমদের মতে তার ওপর কিছু নেই।

খ. কাযার সুযোগ পেয়ে মারা যাওয়া, এ ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে।

৩. মৃতব্যক্তিকে দায়মুক্ত করা বৈধ, আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারো পক্ষ থেকে। হাদিসে বর্ণিত صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ অর্থ হচ্ছে ওয়ারিশ ও উত্তরসূরি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন হয়, অন্যথায় তার পক্ষ থেকে তার নিকট আত্মীয়, অথবা দূরের কারো রোযা পালন করা বৈধ, ঋণ আদায়ের ন্যায়। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (র) বলেছেন : "নবী ﷺ তা ঋণের সাথে তুলনা করেছেন, ঋণ যে কেউ পরিশোধ করতে পারে, অতএব প্রমাণিত হয় যে, এটা যে কারো পক্ষ থেকে করা বৈধ, শুধু সন্তানের সাথে খাস নয়। (মাজমুউল ফাতাওয়া-২৪/৩১১, দেখুন: আল-মুগনি-৪/৪০০, ফাতহুল বারি-৪/১৯৪, শারহুল মুমতি-৬/৪৫২)

৪. মৃত্যব্যক্তির মানত কাযা করা ওয়াজিব নয়, যেমন নয় অভিভাবকদের ওপর তার ঋণ পরিশোধ করা, তবে এটা মৃতব্যক্তিকে দায়মুক্ত করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। (দেখুন: আল-মুগনি-৪/৩৯৯-৪৫০, ওয়াজিব না হওয়ার কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আর কোনো ভারবহনকারী অন্যের ভার বহন করবে না।" (সূরা আনআম : ১৬৪), দ্বিতীয়ত, নবী ﷺ তার তুলনা করেছেন ঋণের সাথে, আর ঋণ পরিশোধ করা অভিভাবকদের ওয়াজিব নয়।)

৫. মৃতের জিম্মায় যদি অনেক রোযা থাকে, সে সংখ্যানুসারে তার পক্ষ থেকে রোযায় লোক যদি একদিন রোযা পালন করে, তাহলে শুদ্ধ হবে, তবে যে সওমে ধারাবাহিকতা জরুরি তা ব্যতীত, যেমন যিহার ও হত্যার কাফফারা, এ ক্ষেত্রে একজন ধারাবাহিকভাবে রোযা পালন করবে। (বুখারী হাসানের বাণী টীকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন : "যদি একদিন ত্রিশ ব্যক্তি রোযা পালন করে, বৈধ হবে"-২/৬৯০, দারাকুতনি তা পূর্ণ সনদে উল্লেখ করেছেন, যেমন হাফেয ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন-৪/১৯৩, দেখুন: শারহুল মুমতি-৬/৩৫২-৩৫৩, শায়খ ইবন বায (র) অনুরূপ বলেছেন, কারণ এ ব্যাপারে হাদীসগুলো ব্যাপক। তিনি মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারার রোযা সম্পর্কে বলেন: "এ রোযা এক গ্রুপের ওপর ভাগ করে দেয়া বৈধ নয়, বরং এগুলো এক ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে পালন করবে, যেমন আল্লাহ অনুমোদন করেছেন।" মাজমু ফাতাওয়া ইবন বায: ৯১৫/৩৭৫)

৬. যদি তার পক্ষ থেকে কেউ রোযা পালন না করে, তবে তার অভিভাবকগণ তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য দিবে, তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দেয়া বৈধ। (শারহুল মুমতি-৬/৪৫৬)

৭. ওয়ারিশগণ যদি কাউকে রোযার জন্য ভাড়া করে, তাহলে শুদ্ধ হবে না, কারণ নেকির বিষয়ে ভাড়া করা বৈধ নয়। (শারহুল মুমতি-৬/৪৫৬, এ মাসআলাকে বদলি হজের ওপর কিয়াস করা যাবে না। যেমন বর্তমান যুগে কতক লোক করে থাকে যে, তাদের অভিভাবকের পক্ষ থেকে যে হজ করবে তাকে তারা টাকা দেয়, যা তার হজ পর্যন্ত সফর খরচ, কিন্তু সে কম খরচ করে ও তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে রাখে। এ জন্য আলেমগণ এমন লোককে হজ্বে পাঠাতে নিষেধ করেছেন, যার উদ্দেশ্য শুধু অর্থ উপার্জন।)

৮. যদি মানত করে মুহাররম মাসে রোযা পালন করবে, **অতঃপর সে যিলহজ্জ** মাসে মারা যায়, তার পক্ষ থেকে কাযা করা হবে না, **কারণ সে ওয়াজিব** হওয়ার সময় পায়নি, যেমন কেউ মারা গেল রমযানের **পূর্বে। (শারহুল** মুমতি-৬/৪৫৬)

৯. যার ওপর রমযানের কতক দিনের রোযা ওয়াজিব, সে যদি তার নিকট আত্মীয়ের কাযা অথবা কাফফারা অথবা মান্নতের রোযা পালন করতে চায়, তার ওপর ওয়াজিব আগে নিজের রোযা পালন করা, অতঃপর তার নিকট আত্মীয়ের রোযা পালন করা। (ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমাহ-৭৯৪২)

১০. বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কাযা রোযা ধারাবাহিকতা শর্ত নয়, তবে ধারাবাহিক কাযা করা উত্তম, কারণ তার সাথে আদায়ের মিল থাকে।

(ফাতাওয়া ইবন জাবরিন: (১২৫)

১১. কাফফারার দু'মাস সিয়ামের ধারাবাহিকতা ঈদের দিনের কারণে ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়া ইবন জাবরিন-১০২)

শিক্ষা-২৫
নফল রোযার ফযীলত

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ فَقُلْتُ : مُرْنِىْ بِأَمْرٍ آخُذْهُ عَنْكَ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ـ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করি, অতঃপর তাকে বলি : আপনি আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিন, যা আমি আপনার থেকে গ্রহণ করব, তিনি বললেন : তুমি রোযা আঁকড়ে ধর, কারণ তার সমকক্ষ কিছু নেই।"

হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে এসেছে : আবু উমামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন :

أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ ـ

"কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বলেন : তুমি রোযা আঁকড়ে ধর, কারণ তার সমকক্ষ কিছু নেই"।

অপর বর্ণনায় এসেছে : আবু উমামা বলেছেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি জিনিসের নির্দেশ দিন, যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করব, তিনি বললেন : তুমি রোযা আঁকড়ে ধর, কারণ রোযার কোনো তুলনা নেই। বর্ণনাকারী বলেন : আবু উমামার বাড়িতে মেহমান আগমন ব্যতীত দিনে কখনো ধোঁয়া দেখা যেত না। যদি তারা ধোঁয়া দেখত, মনে করত আজ তার বাড়িতে মেহমান এসেছে।"

অপর বর্ণনায় এসেছে, আমি বললাম : "হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি আমলের নির্দেশ দিন, তিনি বললেন : তুমি রোযা আঁকড়ে ধর, কারণ তার কোনো তুলনা নেই। বর্ণনাকারী বলেন : আবু উমামা, তার স্ত্রী ও খাদেমদের রোযা ব্যতীত দেখা যেত না। তাদের বাড়িতে দিনে আগুন দেখলে বলা হত মেহমান এসেছে, কোনো আগন্তুক এসেছে। বর্ণনাকারী বলেন : এভাবে সে এক দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে। অতঃপর আমি তার কাছে এসে বলি : হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদেরকে বরকত দান করেছেন, আশা করি আল্লাহ্ তাতে আমাদেরকে বরকত দান করবেন। হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরেকটি আমলের নির্দেশ দেন, তিনি বলেন : জেনে রাখ, তোমার এমন কোনো সেজদা নেই, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার মর্তবা বৃদ্ধি করেন না ও তোমার পাপ মোচন করেন না।" (দেখুন: নাসায়ি-৪/১৬৫, আহমদ-৫/২৪৮, হাদীসটি সহীহ বলেছেন ইবনে হিব্বন-৩৪২৫, ইবনে খুযাইমাহ-১৮৯৩, হাকেম-১/৫৮২, ও হাফেয ইবনে হাজার ফিল ফাতহ-৪/১০৪। প্রথম দু'টি বর্ণনা নাসায়ি থেকে নেয়া, তৃতীয় বর্ণনা ইবনে হিব্বান থেকে নেয়া, চতুর্থ আহমদ থেকে নেয়া।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৫টি

১. সাহাবিদের আখেরাতের আমল জানার আগ্রহ।

২. রোযা সর্বোত্তম আমল, এ হাদীস তাই প্রমাণ করে, অপর হাদীসে এসেছে যে, সালাত সর্বোত্তম ইবাদত, যেমন–

وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ اَلصَّلاَةُ ـ

"জেনে রেখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল সালাত।"

স্পষ্টত বুঝা যায় আমলের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের অবস্থার ওপর নির্ভর করে, কতক মানুষের পক্ষে রোযা উত্তম, কারণ রোযা তাদেরকে হারাম প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, তাদের অন্তঃকরণকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য পরিশুদ্ধ করে। আবার কারো পক্ষে সালাত উত্তম, কারণ তাদের শরীর রোযা পালনে সক্ষম

নয়, বা রোযার কারণে অন্যান্য কর্তব্যে ত্রুটি হবে। ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেন : "নারীর প্রতি যার আগ্রহ বেশি, তার জন্য রোযা উত্তম অন্যান্য ইবাদত থেকে।"

৩. রোযা মানুষের প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে, যা অনেক পাপ সংঘটিত করে ও ইবাদত থেকে বিরত রাখে। যেসব যুবকেরা বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, কিন্তু তারা পাপের আশঙ্কা করে, তাদেরকে রোযা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ দিক থেকে রোযার কোনো তুলনা বা সমকক্ষ নেই।

৪. আবু উমামা ও তার পরিবার নবী ﷺ-এর রোযার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, এখান থেকে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম শরিয়তের আদেশ দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতেন।

৫. মেহমানের সম্মান করা ইসলামি বিধান, তার সম্মানে নফল রোযা ত্যাগ করা বৈধ।

শিক্ষা-২৬

তারাবির সালাতের অনুমোদন

আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল কারি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে রমযানের রাতে মসজিদে যাই, তখন মানুষেরা পৃথকভাবে নিজ নিজ সালাত আদায় করছিল। আবার কেউ কতক লোকের সাথে জামায়াতসহ সালাত আদায় করছিল। ওমর (রা) বললেন : আমার মনে হয় এক ইমামের পিছনে তাদের সকলের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করলে খুব সুন্দর হবে। অতঃপর তিনি উবাই ইবনে কাবের পিছনে সবাইকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে কোনো এক রাতে আমি তার সাথে বের হয়ে দেখি লোকেরা এক ইমামের পিছনে সালাত আদায় করছে, তখন ওমর বললেন : এটা খুব সুন্দর বিদআত। তবে যারা এ সালাতে অনুপস্থিত, তারা উত্তম এদের থেকে, অর্থাৎ শেষ রাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রথম রাতে যারা ঘুমাচ্ছে, তারা এদের চেয়ে উত্তম। তখন মানুষেরা প্রথম রাতে সালাত আদায় করত।

(বুখারী : ১৯০৬, মালেক : ১/১১৪, আব্দুর রায্যাক : ৭৭২৩, ইবনে আবু শায়বাহ ২/১৬৫)

ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় আছে : ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) উবাই ইবনে কাব ও তামিমুদ দারি (রা)-কে সবার সাথে এগারো রাকাত সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন : ইমাম সাহেব শত আয়াতের অধিক বিশিষ্ট সূরাসমূহ

তিলাওয়াত করতেন, আমরা দীর্ঘ কিয়ামের কারণে লাঠির ওপর ভর করতাম, আমরা ফজরের আগ মুহূর্ত ব্যতীত বাড়ি ফিরতাম না।

(মালেক : ১/১১৫, আব্দুর রায্যাক : ৭৭৩০, ইবনে আবু শায়বাহ : ২/১৬২)

ইবনে খুযাইমার এক বর্ণনায় আছে : ওমর (রা) বলেন : "আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা আমি যদি এক ইমামের পিছনে তাদের সবাইকে একত্র করি, তাহলে খুব ভালো হবে। অতঃপর ওমর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি উবাই ইবনে কা'বকে সবার সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে ওমর (রা) তাদের দেখতে যান, তখন সবাই এক ইমামের পিছনে সালাত আদায় করছিল, তিনি বলেন : এটা খুব সুন্দর বিদআত। যারা এ সালাত থেকে ঘুমিয়ে আছে তারা উত্তম, (অর্থাৎ প্রথম রাতে ঘুমিয়ে যারা শেষ রাতে সালাত আদায় করে)। তখন লোকেরা প্রথম রাতে সালাত আদায় করত। তারা রমযানের শেষার্ধে কাফেরদের ওপর লা'নত করত :

اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَاَلْقِ بِقُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَاَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اِلٰهَ الْحَقِّ،

হে আল্লাহ! তুমি কাফেরদের ধ্বংস কর, যারা তোমার রাস্তা থেকে মানুষদের বিরত রাখে, তোমার রাসূলকে মিথ্যারোপ করে, তোমার প্রতিশ্রুতির ওপর ঈমান আনে না। তুমি তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি কর, তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার কর। হে সত্য ইলাহ! তুমি তাদের ওপর তোমার আযাব ও শাস্তি নাযিল কর।" অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করে মুসল্লিদের জন্য কল্যাণের দোআ ও ইস্তেগফার করবে। তিনি বলেন : তারা কাফেরদের ওপর লা'নত, নবীর ওপর দরূদ ও মু'মিনদের জন্য দোয়া-ইস্তেগফার শেষে বলতেন—

اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ، وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، اِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ۔

হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমার ইবাদত করি, তোমার **জন্য সালাত** আদায় করি ও সেজদা করি। আমরা তোমার নিকট দৌড়ে যাই ও **তোমার নিকট দ্রুত** ধাবিত হই। তোমার রহমত প্রত্যাশা করি। হে আমাদের রব! **তোমার আযাব** ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব তোমার শত্রুদের নিশ্চিত **স্পর্শ করবে।"** অতঃপর তাকবীর বলবে ও সেজদার জন্য ঝুঁকবে।" (ইবনে খুযাইমা : ১১০০, আলবানী সহীহ ইবনে খুযাইমার টীকায় হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১২টি

১. তারাবির সালাত সুন্নাত, নবী করীম ﷺ তার সূচনা করেন, কিন্তু মুসলিমদের ওপর ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি তা ত্যাগ করেন। লোকেরা এ সালাত একা একা আদায় করত তাঁর ও আবু বকরের যামানায়, যখন ওমরের যুগ আসে তিনি সবাইকে এক ইমামের পিছনে একত্র করেন। এভাবে তিনি নবীর সুন্নাত জীবিত করেন। তার যামানা ও তার পরবর্তী যামানার মুসলিমগণ একমত যে, তারাবির জামায়াত মুস্তাহাব। (একাধিক আলেম এ মতের ওপর ইজমা বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম ইমাম নববী, দেখুন : তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত : ২/৩৩২)

২. কম মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি কখনো এমন সুন্নাত জীবিত করেন, অধিক মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি যা করতে পারেননি। যেমন মহান এ সুন্নাত জীবিত করার তওফিক আল্লাহ ওমরকে দিয়েছেন, আবু বকরকে দেননি, অথচ তিনি ওমরের চেয়ে উত্তম। সকল কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি ওমরের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। ওমর (রা) বলেছেন : আল্লাহর শপথ আমি কোনো জিনিসে তার অগ্রগামী হতে পারব না। (আবু দাউদ : ১৬১৮, তিরমিযী : ৩৬৭৫, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলেছেন।)

   রমযানে আলী (রা) যখন মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তাতে বাতি জ্বালানো দেখে বলতেন : আল্লাহ ওমরের কবরকে নূরান্বিত করুন, যেমন তিনি আমাদের মসজিদগুলো নূরান্বিত করেছেন। (ইবনে আসাকের তার তারিখে বর্ণনা করেছেন : ৪৪/২৮০, এবং ইবনে আব্দুল বার তার তামহিদ গ্রন্থে : ৮/১১৯) অর্থাৎ সালাতে তারাবিহ দ্বারা। তাই মুসলিম কোনো কল্যাণের ব্যাপারে নিজেকে ছোট বা হীন মনে করবে না, আল্লাহ তার থেকে এমন খিদমত নিতে পারেন, যা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের থেকে নেননি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

৩. মুসলিমদের জামায়াত ও তাদের একতা বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তম। ইমামের কর্তব্য মুসলিমদের মাঝে একতা প্রতিষ্ঠা করা।

৪. সুন্নাতের ব্যাপারে ইমামের ইজতিহাদ মেনে নেয়া অন্যদের ওপর অবশ্য জরুরি, এতে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। যেমন- ওমর (রা) যখন তাদের সবাইকে এক ইমামের পিছনে একত্র করেন, সাহাবায়ে কেরাম তা মেনে নেন ও ওমরের আনুগত্য করেন।

৫. সবাই মিলে সুন্নাত জীবিত করা ও একসাথে ইবাদত আদায় করা বরকতপূর্ণ। কারণ জামায়াতে প্রত্যেকের দোয়া প্রত্যেককে অন্তর্ভুক্ত করে। এ জন্য জামাতের সালাত একাকী সালাতের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি ফযীলত রাখে। সায়িদ ইবনে জুবাইর (র) বলেছেন : আমার নিকট সূরা গাশিয়াহ পাঠকারী ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম, একাকী সালাতে আমার একশত আয়াত তিলাওয়াত করার চেয়ে।" (ইবনে আবদুল বার ফিত তামহিদ : ৮/১১৮)

৬. কারণবশত কোনো আমল ত্যাগ করলে, কারণ শেষে তা পুনরায় আরম্ভ করা দূরস্ত আছে, যেমন ওমর (রা) রমযানের তারাবির জামাত পুনরায় আরম্ভ করেন।

৭. কুরআনের হাফেয ও কুরআনের অধিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যথাসম্ভব ইমামতি করবেন, যেমন ওমর (রা) তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী উবাই ইবনে কা'বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা উত্তম কিন্তু ওয়াজিব নয়, কারণ ওমর (রা) তামিম দারিকেও ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন, অথচ তার চেয়ে বড় কারী সাহাবিদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

৮. তারাবির সালাতে অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় নারীরা মসজিদে উপস্থিত হতে পারবে, অনুরূপ ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে শুধু নারীদের পুরুষ ইমামতি করতে পারবে।

৯. ইমাম যদি ইমামতের নিয়ত না করে, তবু মুসল্লি তার পিছনে ইকতিদা করতে পারবে।

১০. দুই সালাম অথবা চার সালাম অথবা কিয়ামের পর যদি ইমামের বিরতি নেয়ার অভ্যাস থাকে, তাহলে এ বিরতিতে মুক্তাদির নফল পড়া বৈধ নয়। ইমাম আহমদ এটা মাকরূহ বলেছেন, তিনজন সাহাবি থেকে তিনি তা বর্ণনা করেন : উবাদাহ ইবনে সামেত, আবু দারদাহ ও উকবাহ ইবনে আমের (রা) (আল-ইস্তেযার-২/৭২)

১১. এক ইমামের পিছনে তারাবিহ শেষ করে, যদি অন্য ইমামের পিছনে তারাবির জামায়াতে শরীক হয়, এতে দোষ নেই। (আনাস ইবনে মালেক (রা) এটা বৈধ বলেছেন, ইমাম আহমদ বলেছেন এতে কোনো সমস্যা নেই।

(দেখুন : ১/৪৫৭)

১২. রমযানের নফল ব্যতীত অন্য নফলের জন্য ক্রমান্বয়ে একত্র হওয়া বৈধ নয়, বরং অন্যান্য নফল একসাথে আদায় করা বিদআত, যেমন রাতের নফলের জন্য একত্রে হওয়া অথবা নির্দিষ্ট রাতে নফল আদায়ের জন্য একত্র হওয়া ইত্যাদি। কারণ নবী ﷺ রমযান ব্যতীত কোনো নফলে সাহাবিদের একত্র করেননি। তিনি যেহেতু ফরয হওয়ার আশঙ্কা ত্যাগ করেছেন, তাই পরবর্তীতে ওমর (রা) তা জীবিত করেন।

শিক্ষা-২৭
তারাবির সালাতের বিধান

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ চাটাই দ্বারা একটি ছোট হুজরার ন্যায় বানিয়ে তাতে সালাত আদায়ের জন্য বের হন, লোকেরা তার পিছু নিল ও তার সাথে সালাত আদায় করতে লাগল। অতঃপর তারা পরবর্তী রাতে উপস্থিত হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলম্ব করলেন, বের হলেন না, তারা জোরে আওয়াজ দিতে লাগল ও দরজায় ছোট পাথর নিক্ষেপ করে জানান দিচ্ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, অতঃপর বললেন, তোমাদের এ কর্ম দেখে আমার ধারণা হচ্ছে তোমাদের ওপর এ সালাত ফরয করে দেয়া হবে, তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় কর, কারণ ব্যক্তির সালাত ঘরেই উত্তম, শুধু ফরয ব্যতীত।

(বুখারী : ৫৭৬২, মুসলিম : ৭৮১)

অপর বর্ণনায় আছে : আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমাদের ওপর এ সালাত ফরয করা হবে, আর যদি ফরয করা হয় তোমরা তা আদায় করতে পারবে না।

(বুখারী : ৬৮৬০, মুসলিম : ৭৮১)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. দুনিয়ার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনাসক্তি, তিনি খুব সাধারণ ও অনাড়ম্বর আসবাব পত্র ব্যবহার করতেন।

২ নবী করীম ﷺ অধিক ইবাদত করতেন, অথচ তার অগ্র-পশ্চাতের সকল পাপ মোচন করা হয়েছে।

৩. নবী করীম ﷺ-এর আনুগত্যের প্রতি সাহাবীদের আগ্রহ।

৪. কিয়ামুল্লাইলের ফযীলত, বিশেষ করে রমযানে।

৫. মসজিদে নফল সালাত বৈধ। (শরহুন নববী আলাল মুসলিম : ৬/৬৯)

৬. তারাবির সালাত নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাত, তিনি এর সূচনা করেছেন। অতঃপর উম্মতের ওপর ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তা ত্যাগ করেন। পুনরায় ওমর (রা) তা জীবিত করেন। (ফাতহুল বারি : ৩/১৪)

৭. আমির বা মুসলিম দেশের প্রধান যখন অভ্যাসের বিপরীত কিছু করেন, তখন তার কারণ বলে দেয়া উচিত।

৮. উম্মতের ওপর নবী করীম ﷺ-এর দয়া যে, তিনি তাদের ওপর ইবাদতের চাপ কমিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমির ও মুরুব্বিদের উচিত নবী করীম ﷺ এ আদর্শ গ্রহণ করা। (ফাতহুল বারি-৩/১৪)

৯. অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য কতক স্বার্থ ত্যাগ করা বৈধ, অনুরূপ অধিক গুরুত্বপূর্ণকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি।

(শারহুন নববী আলা মুসলিম : ৬/৬৯, ফাতহুল বারি : ৩/১৪)

১০. জামায়াতের সাথে নফল আদায়ের সময় আযান ও ইকামত নেই, যেমন তারাবির সালাত। (ফাতহুল বারি: ৩/১৪, শারহুত তাসরিব : ৩/৯০)

১১. নফল সালাত মসজিদের তুলনায় ঘরে পড়া অধিক উত্তম, তবে যে নফল জামাআতসহ পড়া উত্তম তা ব্যতীত, যেমন ইস্তেস্কা ও তারাবির সালাত। (শারহুন নববী আলাল মুসলিম : ৬/৭০, মিরকাতুল মাফাতিহ : ৩/৩৩৪)

শিক্ষা-২৮

তারাবির রাকায়াত সংখ্যা

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান কিংবা গায়রে রমযানে এগারো রাকায়াতের বেশি সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকায়াত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘকরণ সম্পর্কে তোমাকে কি বলব! অতঃপর তিনি চার রাকায়াত পড়তেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘকরণ সম্পর্কে তোমাকে কি বলব! অতঃপর তিনি তিন রাকাত আদায় করতেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি বললাম: হে আল্লাহ রাসূল! আপনি বেতর পড়ার আগে ঘুমান, তিনি বললেন : হে আয়েশা (রা) আমার দু'চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।" (বুখারী-১০৯৬, মুসলিম-৭৩৮)

অপর বর্ণনায় আছে : নবী করীম ﷺ রাতে তেরো রাকায়াত সালাত আদায় করতেন, তার মধ্যে বেতর ও ফজরের দু'রাকাত বিদ্যমান।"

(বুখারী-১০৮৯, মুসলিম-৭৩৮)

মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেন : সাত রাকায়াত, নয় রাকায়াত ও এগারো রাকায়াত, ফজরের দু'রাকায়াত ব্যতীত।"(বুখারী-১০৮৮)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ রাতে তেরো রাকায়াত সালাত আদায় করতেন"। (বুখারী-১০৮৭, মুসলিম-৭৬৪)

আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আ'রাজ (র) বলেন : "আমি লোকদের দেখেছি তারা রমযানে কাফেরদের ওপর লানত করত। তিনি বলেন, কোনো কোনো ইমাম আট রাকায়াতে সূরা বাকারা খতম করতেন, আর যখন সূরা বাকারা দ্বারা বারো রাকায়াত পড়তেন, তখন লোকেরা মনে করত যে তিনি হাল্কা করেছেন।" (মুয়াত্তা মালেক-১/১১৫, আব্দুর রায্যাক-৭৭৩৪, বায়হাকি-২/৪৯৭,

তার সনদ সহীহ, আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয প্রখ্যাত তাবেঈ, তিনি এ বর্ণনায় মদিনাবাসীদের আমল বর্ণনা করছেন।

(দেখুন তার জীবনী: সিয়ারে আলামিন নুবালা-৫/৬৯)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১০টি

১. নবী করীম ﷺ-এর রাতের সালাত রমযান ও গায়রে রমযানে সমান ছিল। (আল-ইস্তেযকার-২/৯৮)

২. নবীদের চোখ ঘুমায়, কিন্তু তাদের অন্তর ঘুমায় না, এ জন্য তাদের স্বপ্ন সত্য, এটা নবীদের বৈশিষ্ট্য। (আল-ইস্তেযকার-২/১০১, শারহুন নববী-৬/২১)

৩. সকল আলেম একমত যে, রমযান ও গায়রে রমযানে রাতের সালাত সুন্নাত, এতে কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই, যার ইচ্ছা কিয়াম লম্বা করে রাকায়াত সংখ্যা কমাবে, যার ইচ্ছা কিয়াম সংক্ষেপ করে রাকায়াত সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। (আল-ইস্তেযকার-২/১০২, তামহিদ-২১/৭০)

৪. রাতের সালাতে কিরাত, রুকু ও সেজদা দীর্ঘ করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত, ছোট কিরাতে অধিক রাকাতের চেয়ে দীর্ঘ কিরাতে এগারো রাকায়াত অধিক উত্তম। (মাজমুউল ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম-২৩/৬৯-৭২)

৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এগারো রাকায়াতের অধিক তেরো রাকায়াত পড়েছেন, কখনো তিনি এগারো রাকায়াতের কম সাত বা নয় রাকায়াত পড়েছেন, যেমন অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তবে আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সচরাচর সালাতের বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ এগারো রাকায়াত নিয়মিত পড়া।

(দেখুন: ফাতাওয়া-৯৩৫৩, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ। ফাতহুল বারি লি ইবনে হাজার-৩/২০, শারহুন নববী-৬/১৮, সুবুলুস সালাম-২১৩)

৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন, একসাথে চার রাকায়াত বা তার অধিক পড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সচরাচর আমল ও সুন্নাত পরিপন্থী। দলিল আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দু'রাকায়াতের পর সালাম ফিরাতেন, এক রাকায়াত দ্বারা বেতর পড়তেন"। (মুসলিম-৭৩৬) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "রাতের সালাত দু'রাকাত, দু'রাকায়াত।" (বুখারী-৯৪৬, মুসলিম-৭৪৯)

এটা বেতর ব্যতীত। অতএব মুসলিম তিন অথবা পাঁচ রাকাত দ্বারা বেতর পড়বে, তবে শেষ রাকায়াত ব্যতীত বসবে না, যেমন আয়েশা (রা)-এর হাদিসে এসেছে; "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাকায়াত সালাত পড়তেন, তন্মধ্যে পাঁচ রাকাত দ্বারা বেতর পড়তেন, শেষ রাকায়াত ব্যতীত বসতেন না"। (মুসলিম-৭৩৭)

৭. সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তী তাবেয়িগণ মদিনায় সালাতে তারাবিহ খুব দীর্ঘ করতেন, যেমন বিশিষ্ট তাবেয়ি আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয (র) উল্লেখ করেছেন।

৮. সালাতে তারাবির 'দোআয়ে কুনূতে' কাফেরদের জন্য বদদো'আ ও তাদের ওপর লানত করা বৈধ। তারা আমাদের চুক্তির অধীনে থাক বা না থাক,

কুফরের কারণে তারা লানতের উপযুক্ত, তবে এটা ওয়াজিব নয়। এ ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাত হচ্ছে যুদ্ধবাজ কাফেরদের জন্য ধ্বংস ও শাস্তির বদদো'আ করা। যাদের ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের জন্য হিদায়েত লাভের দো'আ করা। (আল-ইস্তেযকার-২/৭৩, ইমাম বুখারী এ সংক্রান্ত-৫৮, ৯৮, ৫৯ ও ১০০ নং বাব/অধ্যায় সমূহ রচনা করেছেন।)

৯. মদিনায় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের রমযানের 'দো'আয়ে কুনূত' নবী ﷺ 'কুনূতে নাযেলা' থেকে গৃহীত, যে কুনূতে নাযেলা তিনি রা'ল, যাকওয়ান, বনু লিহইয়ান ও উসাইয়্যাহ সম্প্রদায়ের ওপর করেছেন, যারা কুরআনের কারীদের হত্যা করেছে। (আল-ইস্তেযকার-২/৭৩) মদিনাবাসী রমযানের শেষার্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত এ বদদো'আ করতেন।

১০. মদিনার সাহাবিদের আমল থেকে জুমার দ্বিতীয় খুতবায় কাফেরদের ওপর বদদো'আ করার সুন্নাত গৃহীত। হাফেয ইবনে আব্দুল বার (র) এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে বলেছেন : "আ'রাজ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের বড় এক জামায়াতের সাক্ষাত পেয়েছেন, এটা মদিনার আমল ছিল"।

(আল-ইস্তেযকার-২/৭৫)

শিক্ষা-২৯

জামায়াতের সাথে তারাবির ফযীলত

আবু যর (রা) বলেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযানের রোযা পালন করলাম। তিনি মাসের কোনো অংশে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেননি, যখন সাত দিন বাকি, তিনি আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল। যখন ষষ্ঠ দিন বাকি, তিনি আমাদের সাথে দাঁড়ালেন না। যখন পাঁচ দিন বাকি, তিনি আমাদের নিয়ে দাঁড়ালেন রাতের অর্ধেক চলে গেল। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! যদি রাতের বাকি অংশ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন! তিনি বললেন :

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ -

"ব্যক্তি যখন ইমামের প্রস্থান পর্যন্ত তার সাথে সালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ রাতের সওয়াব লেখা হয়।"

তিনি বললেন : যখন চতুর্থ রাত বাকি, তিনি দাঁড়ালেন না। যখন তৃতীয় রাত বাকি, তিনি নিজ পরিবার, নারী ও লোকদের একত্রিত করে আমাদের সাথে

দাঁড়ালেন, অবশেষে আমরা আশঙ্কা করলাম, আমাদের থেকে 'ফালাহ' না ছুটে যায়। তিনি বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'ফালাহ' কি? তিনি বললেন : সেহরি। অত:পর মাসের অবশিষ্ট দিনে তিনি আমাদের সাথে দাঁড়াননি।"
(আবু দাউদ-১৩৭৫, তিরমিযী-৮০৬, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান। নাসায়ি-৩/৮৩, ইবনে মাজাহ-১৩২৭, আহমদ-৫/১৬৩, ইবনে খুযাইমাহ-২২০৫ ও ইবনে হিব্বান-২৫৪৭) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৫টি

১. এ হাদীস প্রমাণ করে সালাতে তারাবি সুন্নাত, নবী করীম ﷺ সূচনা করে ফরয হওয়ার শঙ্কায় তা ত্যাগ করেন।

২. মসজিদে মুসলিমদের সাথে নারীদের তারাবি পড়া বৈধ, কারণ নবী করীম ﷺ নিজ পরিবার, স্ত্রী ও লোকদের জমা করে তাদের সাথে সালাত আদায় করেছেন।

৩. ইমামের সাথে যে কিয়াম করল তার প্রস্থানের পূর্ব পর্যন্ত, তার জন্য পূর্ণ রাতের কিয়াম লেখা হবে। সুতরাং মুসলিমদের উচিত এ কল্যাণে অলসতা না করা। রমযানের প্রত্যেক রাতে মুসলিমদের সাথে তারাবি পূর্ণ করা। ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "রমযানে জামায়াতের সাথে ব্যক্তির সালাত আপনার পছন্দ, না একাকী সালাত? তিনি বলেন : জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করবে ও সুন্নাত জীবিত করবে। তিনি আরো বলেন : আমার পছন্দ হচ্ছে ইমামের সাথে সালাত আদায় করা ও বিতর পড়া"। (তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৪৪৮০, দেখুন: আল-মুগনি-১/৪৫৭)

৪. রাতের প্রথমে তারাবিহ পড়া সুন্নাত, যেমন নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম করেছেন। ইমাম আহমদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : "কিয়াম (তারাবিহ) কি শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করব? তিনি বললেন : না, মুসলিমদের সুন্নাত আমার নিকট অধিক প্রিয়"। (আল-মুগনি-১/৪৫৭) শায়খ ইবনে বায (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : যদি সবাই শেষ রাতে বিতর পড়তে রাজি হয়? তিনি বললেন : সবার সাথে প্রথম রাতে সালাত আদায় করা অধিক উত্তম।

৫. ব্যক্তি যদি নিজের মধ্যে ইবাদতের আগ্রহ ও শক্তি দেখে, তাহলে মুসলিমদের সাথে প্রথম রাতে সালাত পূর্ণ করবে, অতঃপর শেষ রাতে নিজের জন্য যত ইচ্ছা সালাত আদায় করবে। তাহলে সে দু'টি কল্যাণ জমা করল, ইমামের সাথে সালাতের কল্যাণ ও শেষ রাতে সালাতের কল্যাণ।

শিক্ষা-৩০

সেহরির ফযীলত : (১)

আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اَلسَّحُوْرُ اَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوْهُ وَلَوْ اَنْ يَجْرَعَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ .

"সেহরি বরকতময় খানা, তোমরা তা ত্যাগ কর না, যদিও তোমাদের কেউ একঢোক পানি গলধ:করণ করে, কারণ আল্লাহ সেহরি ভক্ষণকারীদের ওপর রহমত প্রেরণ করেন ও ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন।"
(আহমদ-৩/১২, জামে সগির-৪৮০১ গ্রন্থে সুয়ূতি হাদীসটি সহীহ বলেছেন, আলবানি সহীহুল জামে গ্রন্থে হাদীসটি হাসান বলেছেন।)

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন: "এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন তিনি সেহরি খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন :

اِنَّ السَّحُوْرَ بَرَكَةٌ اَعْطَاكُمُوْهَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ تَدَعُوْهَا.

নিশ্চয় সেহরি বরকতময়, আল্লাহ তোমাদেরকে তা দান করেছেন, অতএব তোমরা তা ত্যাগ কর না। (আহমদ-৫/৩৭০, নাসায়ি-৪/১৪৫, আলবানি সহিহুল জামে-১৬৩৬ গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

আবু সুআইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ .

"হে আল্লাহ! সেহরি ভক্ষণকারীদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" উবাদা ইবনে নাসি বলেন, মুখেমুখে প্রচলিত ছিল, "সেহরি খাও, যদিও পানি দ্বারা হয়। কারণ প্রসিদ্ধ ছিল সেহরি বরকতের খানা।" (ইবনে আবি আসেম ফিল আহাদ ওয়াল মাসানি-২৭৫৮, বাযযার-৯৭৪, তাবরানি ফিল কাবির-২২/৩৩৭, হাদিস-৮৪৫, হাফেয ইবনে হাজার হাদিসটি হাসান বলেছেন, দেখুন: মুখতাসার যাওয়ায়েদে মুসনাদিল বাযযার-৬১১)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ .

"নিশ্চয় আল্লাহ সেহরি ভক্ষণকারীদের ওপর রহমত প্রেরণ করেন ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন।" (সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৪৬৭, আবু নায়িম ফিল হিলইয়াহ-৮/৩২০, সহিহুল জামে-১৮৪৪ গ্রন্থে আলবানি হাদীসটি হাসান বলেছেন। সিলসিলাতুস সাহিহাহ-১৬৮৪)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন :

نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ .

"খেজুর মু'মিনদের উত্তম সেহরি।" (আবু দাউদ-২৩৪৫, বায়হাকি-৪/২৩৬, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৪৭৫, আলবানি সহীহ আবু দাউদে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৬টি

১. সেহরি ফযীলতপূর্ণ, সেহরি আল্লাহর পক্ষ থেকে রুখসত ও বরকত, এ জন্য আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করব।

২. সেহরির বরকত যেমন আল্লাহ সেহরি ভক্ষণকারীদের ওপর দরূদ প্রেরণ করেন ও তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন। আল্লাহর দরূদ প্রেরণ করার অর্থ হচ্ছে তাদের ওপর রহমত বর্ষণ করা, তাদের কর্মে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা ও তাদের প্রশংসা করা। ফেরেশতাদের দরূদ প্রেরণ করার অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য ইস্তেগফার করা। (দেখুন : কাসিদা ইবনুল কাইয়েম-২০, ফাতহুল বারি লি ইবনে হাজার-১১/১৫৬, ফায়যুল কাদিব-৩/১৩৭)

৩. রাসূল ﷺ সেহরি ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন, যা সেহরির গুরুত্ব প্রমাণ করে।

৪. সামান্য বস্তু দ্বারা সেহরি হয়, যদিও তা একঢোক পানি, যা হাদীস থেকে স্পষ্ট।

৫. খেজুর সর্বোত্তম সেহরি, নবী ﷺ-এর প্রশংসা করেছেন।

৬. মুসলিমদের উচিত এ সুন্নাত পালন করা।

শিক্ষা-৩১

সেহরির ফযীলত (২)

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন :

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةٌ -

"তোমরা সেহরি খাও, কারণ সেহরিতে বরকত রয়েছে।" (বুখারী-১৮২৩, মুসলিম-১০৯৫, অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে আবু হুরায়রা (রা), আবু সায়িদ জাবের, আয়েশা, আমর ইবনে আস, হুযায়ফা, ইরবায, আবু লাইলা, তালক, ইয়াশ ইবনে তালক, ওমর, উতবা ইবনে আব্দ, আবু দারদা ও সালমান (রা) প্রমুখদের থেকে। দেখুন: শারহ ইবনে মুলাক্কিন উমদাহ-৫/১৮৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৩/১৫৪)

আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

فَصْلُ مَابَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اُكْلَةُ السَّحْرِ -

"আমাদের রোযা ও আহলে কিতাবিদের রোযার পার্থক্য হচ্ছে সেহরি ভক্ষণ করা।" (মুসলিম-১৯৬)

ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রা) বলেন :

دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى السَّحُوْرِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ : هَلُمَّ اِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكَ -

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানে সেহরিতে আহ্বান করে বলেন, বরকতপূর্ণ খানার জন্য আস।" (আবু দাউদ-২৩৪৪, আহমদ-৪/১২৬, নাসায়ি-৪/১৪৫, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ-১৯৩৮, ইবনে হিব্বান-৩৪৬৫, আলবানি সহীহ আবু দাউদে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

মিকদাদ ইবনে মা'দি কারিব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন :

عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السَّحُوْرِ؛ فَاِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكَ -

"তোমরা সেহরি অবশ্যই ভক্ষণ কর, কারণ তা বরকতপূর্ণ খাবার।"

(নাসায়ি-৪/১৪৬, আহমদ-৪/১৪২, আলবানি সহীহ নাসায়িতে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৬টি

১. সেহরিতে বরকত বিদ্যমান। আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা তার মাখলুকের বরকত রাখেন, তন্মধ্যে সেহরি।

২. সকল আলেম একমত যে, সেহরি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়, তবে এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য।

(দেখুন: শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/১৮৮, যাখিরাতুল উকবা-২০/৩৬৬)

৩. সেহরির বরকতসমূহ–

ক. সেহরি খাওয়া শরিয়তের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন, এতে রয়েছে বান্দার ইহকাল ও পরকালের সফলতা।

(দেখুন: ফাতুহুল বারি-৪/১৪০, তাওযিহুল আহকাম-৩/১৫৫)

খ. সেহরিতে আহলে কিতাবের বিরোধিতা রয়েছে, তারা সেহরি খায় না। (ফাতুহুল বারি-৪/১৪০, তাওযিহুল আহকাম-৩/১৫৫, শারহুন নববী আলা মুসলিম-৭/২০৭) আর তাদের বিরোধিতা আমাদের দ্বীনের মূল নীতি। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের সাথে মিল রাখা ও তাদের আখলাক, বৈশিষ্ট্য গ্রহণ হারাম।

গ. সেহরির ফলে রোযা ও ইবাদতের শক্তি অর্জন হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে সৃষ্ট খারাপ অভ্যাস দূর হয়। (ফাতহুল বারি-৪/১৪০)

ঘ. সেহরি ভক্ষণকারী দো'আ কবুলের মুহূর্তে ইস্তেগফার, যিকর ও দো'আ করার সুযোগ লাভ করে, যা ঘুমন্ত ব্যক্তির নসিব হয় না। সেহরির সময় ইস্তেগফারকারীদের আল্লাহ প্রশংসা করেছেন।

ঙ. সেহরি ভক্ষণকারী যথাসময়ে ফজর সালাতে হাজির হয়, অনেক সময় মসজিদে আগে এসে প্রথম কাতার ও ইমামের নিকটবর্তী দাঁড়ানোর সাওয়াব লাভ করে, আযানের জওয়াব দেয় ও ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নাত আদায়ে সক্ষম হয়, হাদিসে এসেছে দুনিয়া ও তার মধ্যে বিদ্যমান সবকিছু থেকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত উত্তম।

চ. সেহরি ভক্ষণকারী ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান করে বা সেহরিতে কাউকে অংশীদার করে সদকার সওয়াব লাভ করতে পারে। (ফাতহুল বারি-৪/১৪০)

ছ. সেহরিতে রয়েছে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর ও তার রুখসতের প্রতি সমর্থন, কারণ আল্লাহ আমাদের জন্য সূর্যাস্ত থেকে ফজর পর্যন্ত পানাহার বৈধ করেছেন, যা পূর্বে হারাম ছিল। (আইনুল মাবুদ-৬/৩৩৬)

৪. মুসলিমদের কর্তব্য সেহরিতে বাড়াবাড়ি না করা, বিশেষভাবে যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন : "তোমরা তা ত্যাগ কর না।" নেক নিয়তে সওয়াবের আশায় সেহরি ভক্ষণ করা, শুধু অভ্যাসে পরিণত করা নয়।

(তাওযিহুল আহকাম-৩/১৫৬, যাখিরাতুল উকবা-২০/৩৬৬)

৫. সেহরির দাওয়াত দেয়া ও দাওয়াত গ্রহণ করা বৈধ। কারণ নবী ﷺ ইরবায ইবন সারিয়াকে তার সাথে সেহরি খেতে ও একত্র হতে আহ্বান করেছেন। এক হাদিসে এরূপ এসেছে : "তোমরা বরকতপূর্ণ খানার জন্য আস।" (নাসায়ি-৪/১৪৫, আলবানি সহীহ নাসায়িতে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

৬. ইমাম খাত্তাবি (র) বলেছেন : "এতে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন সহজ, তাতে কঠোরতা নেই। কিতাবিদের বিধান ছিল, তারা ইফতার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ফজর পর্যন্ত আর সেহরি খেতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের থেকে তা রহিত করেছেন :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।"

(সূরা বাকারা-১৮৭, মাআলেমুস সুনান-২/৭৫৭, আউনুল মাবুদ-৬/৩৩৬)

আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের জন্য আমরা তার শোকর আদায় করছি।

শিক্ষা-৩২

সেহরির সময় (১)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ : يُنَادِيْ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُوْلَ هٰكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَانُ كَفَّيْهِ - حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا - وَمَدَّ يَحْيَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ -

"বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সেহরি থেকে বিরত না রাখে। কারণ সে আযান দেয় অথবা তিনি বলেছেন: সে ডাকে যেন তোমাদের জাগ্রতরা ফিরে যায় ও ঘুমন্তরা জাগ্রত হয়। ফজর এটা নয় যে এরকম হবে, (ইয়াহইয়া ইবনে সায়িদ আল-কাত্তান নিজ হাতের তালুদ্বয় জড়ো করলেন [অর্থাৎ লম্বালম্বি অবস্থায় আলো প্রকাশ পেলেই তা ফজর হিসেবে ধর্তব্য হবে না, বরং তা সুবহে কাযিব]) যতক্ষণ না এরকম হবে, (ইয়াহয়াহ তার তর্জনীদ্বয় প্রসারিত করলেন [অর্থাৎ আলো ডানে বাঁয়ে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করলেই কেবল ফজর হিসেবে ধর্তব্য হবে, তখন তা হবে সুবহে সাদিক]) (বুখারী-৬৮২০, মুসলিম-১০৯৩)

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি আমার পরিবারে সেহরি খেতাম, অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজর সালাতের জন্য দ্রুত ছুটতাম।"

বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে- "আমার দ্রুততার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সিজদায় অংশগ্রহণ করা।"

(বুখারী-৫৫২, দ্বিতীয় বর্ণনা বুখারী-১৮২০ ও আবু ইয়ালার-৭৫৩৩)

যির ইবনে হুবাইশ (র) বলেন, আমি হুযায়ফার সঙ্গে সেহরি করলাম, অত:পর আমরা সালাতের জন্য চললাম, মসজিদে এসে দু'রাকাত সালাত আদায় করলাম, আর ইকামত আরম্ভ হলো, উভয়ের মাঝে সামান্য ব্যবধান ছিল।"

(নাসায়ি-৪/১২৪, আলবানি সহীহ নাসায়িতে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

"যেন তোমাদের ঘুমন্তরা ফিরে যায়।" অর্থাৎ বেলাল রাতে আযান দেয়, তোমাদের জানানোর জন্য যে, ফজর বেশি দেরি নেই। সে তাহাজ্জুদে দণ্ডায়মানকারীদের আরামের জন্য ফিরিয়ে দেয়, যেন সামান্য ঘুমিয়ে উদ্যমতাসহ সকালে উঠতে পারে, অথবা বিতর পড়ে নেয়, যদি তা পড়ে না থাকে, অথবা ফজরের জন্য প্রস্তুতি নেয় যদি পবিত্রতার প্রয়োজন থাকে, বা অন্যান্য প্রয়োজন সেরে নেয়, যা ফজরের সময় জানলেই সম্ভব।

(শারহুন নববী আলা মুসলিম-৭/২০৪, আল-মুফহিম-৩/১৫৩)

"ঘুমন্তদের জাগ্রত করে" অর্থ– ঘুমন্তরা যেন ঘুম থেকে জেগে ফজরের প্রস্তুতি নেয়, সামান্য তাহাজ্জুদ আদায় করে, অথবা বিতর আদায় না করলে তা আদায় করে, অথবা রোযার ইচ্ছা থাকলে সেহরি খায়, অথবা গোসল বা ওযু সেরে নেয়, অথবা অন্যান্য প্রয়োজন সেরে নেয়।

(শারহুন নববী আলা মুসলিম-৭/২০৪, আল-মুফহিম-৩/১৫৩)

শিক্ষা ও মাসায়েল ২টি

১. নবী ﷺ ও তার সাহাবিগণ ফজরের শেষ সময় পর্যন্ত সেহরি বিলম্ব করতেন। তাদের কেউ সময় শেষ হওয়ার আশঙ্কায় সেহরি সংক্ষেপ করতেন। অতএব ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সেহরি বিলম্ব করা সুন্নাত।

(ফাতহুল বারি-৪/১৩৮)

২. প্রয়োজনের সময় দ্রুত আহার করা জায়েয। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারি একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন : "সেহরি দ্রুত করার অধ্যায়" শিরোনামে। ইমাম মালিক (র) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বকর থেকে, সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "রমযানে আমরা সালাতুল লাইল শেষে এতো দেরিতে বাড়ি যেতাম যে, খাদেমদের দ্রুত খানা পেশ করার জন্য বলতাম, যেন ফজর ছুটে না যায়।" (মালেক-১/১১৬, বায়হাকি-২/৪৯৭)

শিক্ষা-৩৩
সেহরির সময় (২)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمٰى لَا يُنَادِيْ حَتّٰى يُقَالُ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .

"নিশ্চয় বেলাল আযান দেয় রাতে, অতএব তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। অতঃপর তিনি বলেন : সে ছিল বন্ধ, যতক্ষণ না তাকে বলা হতো ভোর করেছ, ভোর করেছ সে আযান দিত না।"

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে–

كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْأَعْمٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقٰى هٰذَا .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'জন মুয়াজ্জিন ছিল : বেলাল ও অন্ধ আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বেলাল রাতে আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়। তিনি বলেন, তাদের দু'জনের সময়ের ব্যবধান ছিল একজন (আজানের স্থান থেকে) নামতেন অপরজন উঠতেন।" (বুখারী-৫৯২, মুসলিম : ১০৯২)

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيْلِ هٰكَذَا حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا وَحَكَاهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ بِيَدَيْهِ، قَالَ : يَعْنِيْ مُعْتَرِضًا .

"বেলালের আযান বা দিগন্তের লম্বা সাদা রেখা যেন তোমাদেরকে সেহরি থেকে বিরত না রাখে, যতক্ষণ না তা এভাবে প্রলম্বিত হয়।" হাম্মাদ ইবনে যায়েদ দু'হাতে ইশারা করে তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি ইঙ্গিত করলেন : অর্থাৎ প্রস্থের দিক থেকে প্রসারিত হওয়া। (মুসলিম)

নাসায়ির এক বর্ণনায় আছে–

لَا يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْتَرِضًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : وَبَسَطَ بِيَدَيْهِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً مَدَّ يَدَيْهِ -

"বেলালের আযান এবং এ শুভ্রতা যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে, যতক্ষণ না ফজর এভাবে এভাবে ছড়িয়ে পড়ে।" অর্থাৎ প্রস্থের দিকে। আবু দাউদ তায়ালিসি বলেন : তিনি তার দু'হাত ডানে-বামে লম্বা করে প্রসারিত করলেন।

(মুসলিম-১০৯৪, আবু দাউদ-২৩৪৬, তিরমিযী-৭০৬, নাসায়ি-৪/১৪৮)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

اِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلٰى يَدِهٖ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

"যখন তোমাদের কেউ আযান শ্রবণ করে, আর হাতে থাকে খানার প্লেট, সে তা রাখবে না যতক্ষণ না সেখান থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে।"

(আবু দাউদ-২৩৫০, আহমদ-২/৫১০, দারাকুতনি-২/১৬৫, বায়হাকি-৪/২১৮, হাকেম-১/৫৮৮, তিনি মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন।)

ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেছেন–

وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ اِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ.

"মুয়াজ্জিন আযান দিত যখন সুবহে সাদিকের আলো বিচ্ছুরিত হত।"

(আহমদ-২/৫১০, তাবারি ফি তাফসিরিহি-২/১৭৫, বায়হাকি-৪/২১৮)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীগমন বৈধ।

২. অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া বৈধ, যদি সে সময় সম্পর্কে জানে বা তাকে জানানোর কেউ থাকে।

৩. ফজরের জন্য দু'বার আযান দেয়া বৈধ : প্রথমবার ফজরের পূর্বে, দ্বিতীয়বার ফজর উদয় হওয়ার পর।

৪. রোযার নিয়তের পর সেহরি খাওয়া বৈধ, পানাহারের কারণে পূর্বের নিয়ত নষ্ট হবে না। কারণ নবী ﷺ ফজর উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার বৈধ করেছেন, অথচ ফজর উদয়ের পর নিয়ত বৈধ নয়, এ থেকে প্রমাণিত হয় নিয়তের স্থান খানার পূর্বে, তারপর পানাহারে রোযা নষ্ট হবে না। অতএব কেউ মাঝরাতে আগামীকালের রোযার নিয়ত করে, শেষ রাত পর্যন্ত পানাহার করলে তার নিয়ত শুদ্ধ।

৫. ফজর উদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে পানাহার করা বৈধ, কারণ রাত অবিশষ্ট আছে এটাই স্বাভাবিক। দলিল নিম্নের আয়াত–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۔

"তোমরা পানাহার করতে থাক যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা থেকে কালো রেখা সুস্পষ্ট আলাদা না হয়ে যায়।" (সূরা বাকারা-১৮৭) সন্দেহকারীর নিকট ফজরের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়নি, তাই সে সেহরি খেতে পারবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত :

كُلْ مَا شَكَكْتَ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ ۔

"তোমার সন্দেহ পর্যন্ত তুমি খাও, যতক্ষণ তোমার নিকট স্পষ্ট হয়।"

ইমাম নববী বলেছেন : "যদি ফজর উদয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে তার জন্য পানাহার ও স্ত্রীগমন বৈধ, এতে কারো দ্বিমত নেই, যতক্ষণ না ফজর স্পষ্ট হয়।" (মাজমু-৬/৩১৩, দেখুন: যাখিরাতুল উকবা-২০/৩৫৫)

এ বিধান তখন, যখন সে স্বচক্ষে ফজর দেখে নিশ্চিত হয়, কিন্তু সে যদি আযান অথবা ঘড়ির ওপর নির্ভর করে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ তখন জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

৬. সেহরি খাওয়া ও তাতে বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

৭. দুই মুয়াজ্জিনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান : একজন নামতেন, অপরজন উঠতেন।" ইমাম নববী (র) বলেন : এর অর্থ– বেলাল ফজরের পূর্বে আযান দিতেন, আযানের পর দো'আ ইত্যাদির জন্য অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ফজর পর্যবেক্ষণ করতেন, যখন ফজর ঘনিয়ে আসত, তিনি অবতরণ করে উম্মে মাকতুমকে খবর দিতেন। ইবনে উম্মে মাকতুম ওযু, ইস্তেঞ্জা সেরে প্রস্তুতি নিতেন, অত:পর উপরে উঠে ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে আযান আরম্ভ করতেন।" কুরতুবি এ ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বলেন, এটাই যুক্তিযুক্ত।

(আল-মুফহিম-৩/১৫১, দেখুন: শারহুন নববী-৭/২০৪, দিবায-৩/১৯৪)

৮. এ থেকে প্রমাণিত হয়, ফজরের পর রাত থাকে না, বরং তা দিনের অংশ।

(আল-মুফহিম-৩/১৫১, দিবায-৩/১৯৪, দেখুন: ফাতহুল বারি-২/১০১)

৯. ব্যক্তির জন্য মায়ের পরিচয় গ্রহণ করা বৈধ, যদি লোকেরা তার মায়ের পরিচয়ে তাকে চিনে, বা তার প্রয়োজন হয়। (ফাতহুল বারি-২/১০১)

১০. প্রথম ফজর ও দ্বিতীয় ফজরে পার্থক্য তিনটি–

প্রথম পার্থক্য : দিগন্তের উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বালম্বি সাদা রেখা দ্বিতীয় ফজরের আলামত। আর ঊর্ধ্ব আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সাদা লম্বা রেখা প্রথম ফজরের আলামত।

দ্বিতীয় পার্থক্য : দ্বিতীয় ফজরের পর অন্ধকার থাকে না, বরং সূর্যোদয় পর্যন্ত ফর্সা ক্রমান্বয়ে পায়। আর দ্বিতীয় ফজরে আলোর পর অন্ধকার নেমে আসে।

তৃতীয় পার্থক্য : দ্বিতীয় ফজরের সাদা রেখা দিগন্তের সাথে মিলিত থাকে। প্রথম ফজরের সাদা রেখা ও ঊর্ধ্ব আকাশের মাঝে অন্ধকার বিরাজ করে।

(ফিকহুল ইবাদতা লি শায়খ উসাইমিন-১৭২-১৭৩)

১১. মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আযান দেয়, তখন যদি রোযাদারের হাতে খাবার প্লেট থাকে, সে পানাহার পূর্ণ করবে, বন্ধ করবে না, হাদিসের বাহ্যিক অর্থ তাই বলে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়। তাঁর জন্য সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। ('মুখতাসারে মুনযিরির' ওপর শায়খ আহমদ শাকেরের টীকা-৩/২৩৩, তামামুল মিন্নাহ লিল আলবানি-৪১৭-৪১৮)

শিক্ষা-৩৪

আযান ও সেহরির মাঝে ব্যবধান

আনাস ইবনে মালিক (র) যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُوْرِ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً .

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সেহরি খেলাম, অতঃপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ালেন। আমি বললাম : আযান ও সেহরির মধ্যে ব্যবধান কি ছিল? তিনি বললেন : পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ।"

(বুখারী-১৮২১, মুসলিম-১০৯৭, তিরমিযী-৭০৩, নাসায়ি-৪/১৩৪, ইবনে মাজাহ-১৬৯৪)

বুখারীর অপর বর্ণনায় আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى، قُلْنَا لِأَنَسٍ : كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلَاةِ؟ قَالَ : قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ آيَةً .

"নবী ﷺ ও যায়েদ ইবনে সাবেত এক সঙ্গে সেহরি খান, যখন তারা সেহরি থেকে ফারেগ হলেন। নবী ﷺ সালাতের জন্য দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করলেন। আমরা আনাসকে বললাম : তাদের সেহরি ও সালাত আরম্ভের মধ্যে ব্যবধান কি ছিল? তিনি বললেন : যতটুকু সময়ে একজন ব্যক্তি পঞ্চাশ আয়াত পড়ে।" (বুখারী-৫৫১)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. সেহরিতে বিলম্ব করা সুন্নাত। এতে যেমন রোযার শক্তি অর্জন হয়, তেমন কিতাবিদের সুস্পষ্ট বিরোধিতা হয়।

২. সাহাবিদের সময় ইবাদতে পরিপূর্ণ ছিল, এ জন্য যায়েদ কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ দ্বারা সময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

৩. শারীরিক কর্ম দ্বারা সময় পরিমাপ করা বৈধ, যেমন আরবরা বলত : বকরির দুধ দোহনের পরিমাণ, উটের বাচ্চা নহর করার পরিমাণ ইত্যাদি।

৪. সেহরি ও আযানের ব্যবধান মধ্যম গতির তিলাওয়াতে স্বাভাবিক পর্যায়ের পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ।

(দেখুন : ফাতহুল বারি-৪/১৩৮, তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৩১৭)

৫. সেহরি বিলম্ব করা সুন্নাত, তবে সেহরির শেষ পর্যন্ত স্ত্রীগমন তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তার দ্বারা রোযার শক্তি অর্জন হয় না, বরং তাতে কাফফারা ওয়াজিব ও রোযা বিনষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ কখনো এমন হবে, ফজর উদিত হচ্ছে, কিন্তু সে উত্তেজনার কারণে রমন ক্রিয়া বন্ধ করতে পারছে না।

৬. ইলম অর্জন করা, মাসায়েল জানা, সুন্নাত অনুসন্ধান করা, ইবাদতের সময় জানা ও তদানুরূপ আমল করা জরুরি। কারণ আনাস (রা) বলেছেন : "সেহরি ও আযানের ব্যবধান কি ছিল।" যায়েদ (রা) বলেছেন : "পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ।"

৭. উম্মতের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া যে, রোযার শক্তির জন্য সেহরির বিধান দেন, অতঃপর তিনি স্বেচ্ছায় তা বিলম্ব করেন, যেন সাহাবীরা এতে তার অনুসরণ করে। তিনি সেহরি না খেলে তার অনুসরণ করা তাদের জন্য কষ্টকর ছিল, আবার প্রথমরাত বা মধ্যরাতে সেহরি খেলে সেহরির অনেক উদ্দেশ্য বিফল হতো।

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শিষ্টাচার ও আদব রক্ষা করা জরুরি। এখানে যেমন যায়েদ বলেছেন : "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সেহরি খেয়েছি।" তিনি বলেননি : "আমরা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেহরি খেয়েছি।" কারণ সাথীত্ব আনুগত্যের প্রমাণ বহন করে।

শিক্ষা-৩৫

নাপাক অবস্থায় প্রভাতকারীর রোযা

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ -

"সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

তিনি আরো বলেন :

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ -

"অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা অনুসন্ধান কর। আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রভাত কখনো হত এমতাবস্থায় যে, স্ত্রীগমনের কারণে তিনি নাপাক থাকতেন। অত:পর গোসল করতেন ও রোযা রাখতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক হাদিসে উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্ন দোষের কারণে নয়, বরং স্ত্রীগমনের কারণে নাপাক অবস্থায় প্রভাত করতেন, অত:পর রোযা পালন করতেন, কাযা করতেন না।"

(বুখারী-১৮২৫, মুসলিম-১১০৯)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে : আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (র) বলেন: "আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি তার ঘটনায় বলেন : নাপাক অবস্থায় যার ভোর হয়, সে রোযা রাখবে না। আমি এ ঘটনা আবু বকরের পিতা আব্দুর রহমান ইব্‌নে হারেসকে বললাম, তিনি অস্বীকার করলেন। আব্দুর রহমান রওয়ানা করলেন, আমি তার সাথী হলাম, অবশেষে আমরা আয়েশা ও উম্মে সালামার নিকট এসে পৌঁছলাম। আব্দুর রহমান তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তিনি বলেন, তারা উভয়ে বলেছেন : নবী ﷺ স্বপ্ন দোষ ব্যতীত নাপাক অবস্থায় ভোর করতেন, অতঃপর রোযা রাখতেন।

তিনি বলেন, আমরা রওয়ানা করে মারওয়ানের নিকট পৌছলাম, আব্দুর রহমান তাকে ঘটনা বললেন : মারওয়ান বললেন : আমি তোমাকে বলছি তুমি অবশ্যই আবু হুরায়রার কাছে গিয়ে তার কথার প্রতিবাদ কর। তিনি বলেন : আমরা আবু হুরায়রার নিকট গেলাম, আবু বকর এসব ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন : আব্দুর রহমান তাকে এ কথা বললেন। অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বললেন : তারা উভয়ে তোমাকে এ কথা বলেছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আবু হুরায়রা (রা) বললেন : তারা আমার চেয়ে বেশি জানেন। অতঃপর আবু হুরায়রা এ বিষয়ে যা বলতেন, ফযল ইবনে আব্বাসের বরাতে বলতেন। আবু হুরায়রা বলতেন : আমি ফযল ইব্‌নে আব্বাস থেকে শুনেছি, নবী ﷺ থেকে শুনিনি। তিনি বলেন : আবু হুরায়রা তার পূর্বের কথা থেকে ফিরে যান। আমি আব্দুল মালেককে বললাম : তারা কি রমযানের ব্যাপারে বলেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তিনি স্বপ্ন দোষ ব্যতীত নাপাক অবস্থায় ভোর করতেন, অতঃপর রোযা পালন করতেন।"

(মুসলিম: ১১০৯, নাসায়ির এক বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা এ হাদীস শুনেছেন উসামা ইবনে যায়েদ থেকে দেখুন: সুনানুল কুবরা-২৯৩১, তাই কেউ বলেছেন : তিনি উভয় থেকে শ্রবণ করেছেন। দেখুন: শারহুন নববী-৭/২২২, আল-মুফহিম-৩/১৬৮, শারহু ইব্‌নুল মুলাক্কিন-৫/১৯৭)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত : "এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট ফতোয়া তলবের জন্য এসেছে, তিনি দরজার আড়াল থেকে শুনছিলেন, সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার নাপাক অবস্থায় সালাতের সময় হয়, আমি কি রোযা রাখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমারও নাপাক অবস্থায় সালাতের সময় হয়, অতঃপর আমি রোযা রাখি। সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মতো নন, আল্লাহ আপনার অগ্র-পশ্চাতের সকল পাপ মোচন করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ ভীরু এবং তাকওয়া সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত।"

(মুসলিম-১১১০, মালেক-১/২৮৯, ইবনে হিব্বান-৩৪৯৫)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৩টি

১. রমযানের রাতে স্ত্রীগমন বৈধ, তা থেকে পরহেয করা নবী ﷺ-এর আদর্শের বিপরীত, তবে শেষ দশকে ইতিকাফকারী ব্যতীত।

২. রমযানের রাতে সহবাস অথবা স্বপ্ন দোষের পর ফজর উদিত হওয়ার পরবর্তী সময় পর্যন্ত যে গোসল বিলম্ব করল, সে রোযা পালন করবে, তার ওপর কিছু আবশ্যক হবে না। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত।

(শারহু ইবনে বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/৪৯, শারহুল উমদাহ লি ইবিনল মুলাক্কিন-৫/৯১, ফাতহুল বারি লি ইবনে হাজার-৪/১৪৭, নাইলুল আওতার-৪/৯১)

৩. এ হাদিসে উম্মুল মু'মিনীনদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়, যারা নবী ﷺ-এর ঘর ও তার পরিবার সংশ্লিষ্ট বিশেষ জ্ঞানের ধারক ও প্রচারকারী ছিলেন।

৪. নবী ﷺ-এর পরিবার সংক্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীনদের কথা অন্য সবার উর্ধ্বে।

৫. ফরয গোসল ভোর পর্যন্ত দেরি করা শুধু নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য নয়, বরং তা উম্মতের সবার জন্য প্রযোজ্য।

৬. উম্মে সালামার বাণী: "নবী ﷺ সহবাসের কারণে নাপাক অবস্থায় ভোর করতেন, স্বপ্ন দোষের কারণে নয়।" এখানে দু'টি শিক্ষা :

ক. নবী ﷺ বৈধতা বর্ণনা করার জন্য রমযানে সহবাস করতেন ও ফজর উদয় পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করতেন।

খ. নবী ﷺ সহবাসের কারণে নাপাক অবস্থায় ভোর করতেন, স্বপ্ন দোষের কারণে নয়, কারণ স্বপ্ন দোষ শয়তানের পক্ষ থেকে, তিনি ছিলেন শয়তান থেকে নিরাপদ। (দেখুন: আল-মুফহিম: ৩/১৬৭, ফাতহুল বারি-৪/১৪৪, এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস থেকে একটি দুর্বল বাণী বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : "কোনো নবীর স্বপ্ন দোষ হয়নি, নিশ্চয় স্বপ্ন দোষ হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে"। তাবরানি ফিল কাবির-১১/২২৫, হাদীস-১১৫৬৪, তাবরানি ফিল আওসাত-৮০৬২), হায়সামি বলেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এ বাণীর সনদে আব্দুল আযিয ইবনে আবু সাবেত জনৈক ব্যক্তি রয়েছেন, যার দুর্বলতার ব্যাপারে সবাই একমত, যাওয়ায়েদ-১/২৬৭, ইমাম নববী প্রমাণ করেছেন যে, নবীদের স্বপ্ন দোষ হয় না। এ হিসেবে হাদিসের অর্থ হচ্ছে যে, সহবাসের কারণে তিনি নাপাক অবস্থায় প্রভাত করতেন, তিনি স্বপ্ন দোষের কারণে নাপাক হতেন না, কারণ স্বপ্ন দোষ তার পক্ষে অসম্ভব। এ কথা মূলত আল্লাহর এ বাণীর ন্যায় : وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ . এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত"। (সূরা বাকারা-৬১)

আমরা সকলে জানি যে, নবীদের হত্যা কখনো হকভাবে হতে পারে না। (শারহু মুসলিম-৭/২২২, ইবনুল মুলাক্কিন ফি শারহিল উমদাহ-৫/২০১)

৭. নবী করীম ﷺ অধিক আল্লাহ ভীরু, অধিক মুত্তাকী ও তাকওয়া সম্পর্কে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

৮. এসব হাদীস থেকে বুঝা যায়, নারী যদি মাসিক ঋতু বা নিফাস থেকে ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়, অতঃপর ফজর উদয় পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করে, তার রোযা বিশুদ্ধ। ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বা যে কোনো কারণে গোসল বিলম্ব করুক, যেমন নাপাক ব্যক্তি।"

(দেখুন: আল-ইস্তেযকার-১০/৪৮, শারহুন নববী-৭/২২২, শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন-৫/২০০)

৯. এসব হাদিসে নবী করীম ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, নিন্দা জানানো হয়েছে চরমপন্থা, বৈধ বস্তু ত্যাগ করা ও লৌকিকতাপূর্ণ প্রশ্নকে। (দেখুন: আত-তামহিদ-১৭/৪২০, ফাতহুল বারি-৪/১৪৯)

১০. রমযান বা গায়রে রমযান সর্বদা ফজরের পর নাপাক, হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের রোযা বিশুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব অথবা মানত অথবা কাযা নফল রোযায় কোনো পার্থক্য নেই।

১১. কোনো বিষয়ে দ্বিধা বা বিরোধের সৃষ্টি হলে জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি, যেমন আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : "তারা বেশি জানে" অর্থাৎ আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) কারণ তারা পারিবারিক ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত।

১২. নবী ﷺ-এর সুন্নাত বিরোধের সময় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও অকাট্য দলিল।

১৩. ভুল হলে স্বীকার করা ও ইলমের ক্ষেত্রে আমানতদারী রক্ষা করা জরুরি, যেমন আবু হুরায়রা (রা) স্বীকার করেছেন তিনি নবী ﷺ থেকে শ্রবণ করেননি, বরং অন্য কারো থেকে শ্রবণ করেছেন।

শিক্ষা-৩৬

সাদা তাগা ও কালো তাগার অর্থ

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ـ

অর্থ : আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আদি ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন নাযিল হলো-

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ـ

অর্থ : যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আমি একটি কালো রশি ও একটি সাদা রশি হাতে নিই এবং তা আমার বালিশের নিচে রেখে দেই। অতঃপর আমি রাতে বারবার তাকাতে থাকি, কিন্তু আমার নিকট তা স্পষ্ট হয়নি। প্রত্যুষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ঘটনার বর্ণনা দেই। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে রাতের কালো রেখা ও দিনের সাদা রেখা। (বুখারী : ১৮১৭, মুসলিম : ১০৯০)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৬টি

১. আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নে সাহাবীরা ছিলেন অধীর আগ্রহী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত ওহী তারা দ্রুত বাস্তবায়ন করতেন। অপর বর্ণনায় এসেছে : আদি ইবনে হাতেম (রা) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে যা বলেছেন সব বুঝেছি, তবে সাদা তাগা ও কালো তাগা ব্যতীত। আমি গত রাতে দু'টি তাগা সঙ্গে করে ঘুমাই, একবার এ দিকে, আরেক বার সে দিকে তাকাতে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। অতঃপর বললেন : এ কালো তাগা আর সাদা তাগার অর্থ আসমানে বিদ্যমান রাত-দিনের সাদা-কালো রেখা। (তাবরানি ফিল কাবির : ১৭/৭৯, হাদীস নং ১৭৫) দেখার বিষয় আদি এ আয়াতের অর্থ বাস্তবায়নের জন্য বালিশের নিচে সাদা ও কালো তাগা পর্যন্ত রেখেছেন।

(আল-মুফহিম : ৩/১৪৮-১৫০)

২. সাহাবায়ে কেরাম ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি না হলে প্রশ্ন থেকে নিবৃত থাকতেন। বুঝার জন্য তারা যথাযথ চেষ্টা করতেন, যখন অপরাগ হতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতেন। অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য প্রথমে জিজ্ঞাসা না করে বুঝার চেষ্টা করা, ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জটিলতা ব্যতীত জিজ্ঞাসা না করা।

৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী−

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থ : আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭) এর অর্থ হচ্ছে : তোমরা খাও এবং পান কর, যতক্ষণ না দিনের সাদা রেখা রাতের কালো রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। আর এটা সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর।

(ইবনে কাসির : ১/২২২, ফাতহুল বারি : ৪/১৩৪)

৪. কঠিন মাসআলা ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহ বিজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করা।

৫. এ আয়াতে প্রমাণ করে যে, ফজরের পরবর্তী সময় দিনের অংশ, রাতের নয়। (শারহুন নববী মুসলিম : ৭/২০১, ফাতহুল বারি : ৪/১৩৪)

৬. ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার বৈধ। পানাহার অবস্থায় যদি কারো ফজর উদিত হয়, আর সে মুখের খানা বের করে ফেলে, তার রোযা শুদ্ধ, খেতে থাকলে রোযা শুদ্ধ হবে না। (ফাতহুল বারি: ৪/১৩৫)

শিক্ষা-৩৭

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত

যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন−

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا .

যে রোযাদারকে ইফতার করাল, তার রোযাদারের ন্যায় সাওয়াব হবে, তবে রোযাদারের নেকি বিন্দুমাত্র কমানো হবে না। (তিরমিযী : ৮০৭, ইবনে মাজাহ: ১৭৪৬, নাসায়ি ফিল কুবরা: ৩৩৩০-৩৩৩১, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ : ২০৬৪, ইবনে হিব্বান: ৩৪২৯, নাসায়ি আয়েশা থেকে মওকুফ হিসেবেও বর্ণনা করেছেন, (দেখুন: নাসায়ি ফিল কুবরা : ৩৩৩২, আব্দুর রায্যাক আবু হুরায়রা থেকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, দেখুন: আব্দুর রায্যাক : ৭৯০৬)

অপর বর্ণনায় আছে−

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا اَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ .

অর্থ : যে রোযাদারকে ইফতার করাল, তাকে পানাহার করাল, তার রোযাদারের সমান সওয়াব হবে, তবে তার নেকি থেকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তাকে এক মহিলা ইফতারের জন্য দাওয়াত করল, তিনি তাতে সাড়া দিলেন এবং বললেন : আমি তোমাকে বলেছি, যে গৃহবাসী কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, তাদের জন্য তার অনুরূপ সওয়াব হবে। মহিলা বলল; আমি চাই আপনি ইফতারের জন্য আমার কাছে কিছুক্ষণ অবস্থান করুন বা এ জাতীয় কিছু বলেছেন। তিনি বললেন: আমি চাই এ নেকি আমার পরিবার হাসিল করুক। (মুসান্নাফ ইবনে আব্দুর রাযযাক : ৭৯০৮)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহ যে, তিনি কল্যাণের নানা ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছেন। যেমন তিনি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করার আহ্বান জানিয়ে মহান সওয়াবের ঘোষণা দিয়েছেন। (আরেযাতুল আহওয়াযি : ৪/২১)

২. রোযাদারকে ইফতার করানো একটি ফযীলতপূর্ণ আমল, যে রোযাদারকে ইফতার করাবে সে তার ন্যায় নেকি লাভ করবে।

৩. রোযাদারকে ইফতার করালে তার বদলা আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে প্রদান করেন, রোযাদারের পক্ষ থেকে নয়। অতএব রোযাদারের সামান্য নেকি হ্রাস হবে না, এটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের আলামত। (ফায়যুল কাদির : ৬/১৮৭)

৪. এ থেকে বুঝা যায় ইফতারের দাওয়াত গ্রহণ করা বৈধ, বুজুর্গি দেখিয়ে বা নেকি কমার আশঙ্কায় তা প্রত্যাখ্যান করা বাড়াবাড়ি। কারণ অপরের নিকট ইফতার করলে রোযাদারের পুণ্য কমে না। তবে শুধু মিসকিনদের জন্য ইফতারের দাওয়াত হলে সেখানে ধনীদের যাওয়া ঠিক নয়।

৫. আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচার ও তাদের খুশির জন্য দাওয়াতে সাড়া দেয়া ও ইফতার করা বৈধ, যেন তাদের পুণ্য হাসিল হয়, যেমন আবু হুরায়রা (রা) করেছেন।

৬. যে ইফতার করাবে, সে নেকি ও অপরের প্রতি ইহসানের নিয়ত করবে, বিশেষ করে রোযাদার যদি গরিব হয়।

৭. রোযাদারকে বাসায় নিয়ে আপ্যায়ন করা বা খাবার প্রস্তুত করে তার জন্য পাঠিয়ে দেয়া ইফতার করানোর শামিল, তবে অপচয় না করা, বিশেষ করে রকমারি ইফতারের এ যুগে।

৮. কেউ যদি গরিবকে টাকা দেয়, যার কিছু দিয়ে সে ইফতার করল, বাকিটা সংগ্রহে রেখে দিল, বাহ্যত তা ইফতার করানোর অন্তর্ভুক্ত হবে, অধিকন্তু সে আর্থিকভাবে উপকৃত হলো।

শিক্ষা-৩৮

তাড়াতাড়ি ইফতার করার ফযীলত

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

"অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারা-১৮৭)

সাহাল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ـ

"লোকেরা কল্যাণ থেকে মাহরুম হবে না, যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার করবে।" (বুখারী-১৮৫৬, মুসলিম-১০৯৮)

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ فَاِنَّ الْيَهُوْدَ يُؤَخِّرُوْنَ ـ

"লোকেরা কল্যাণে অবস্থান করবে, তারা দ্রুত ইফতার করবে। তোমরা দ্রুত ইফতার কর, কারণ ইহুদিরা বিলম্ব করে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ-১৬৯৮)

ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমার বর্ণনায় আছে–

مَايَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ـ

এ দ্বীন বিজয়ী থাকবে, যতদিন মানুষেরা দ্রুত ইফতার করবে, নিশ্চয় ইহুদি ও নাসারারা বিলম্ব করে। (সহীহ ইবনে খুযাইমাহ: ২০৬০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩৫০৩)

অপর এক বর্ণনায় আছে–

لَا تَزَالُ اُمَّتِىْ عَلٰى سُنَّتِىْ مَالَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ ـ

"আমার উম্মতেরা সুন্নাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ তারা ইফতারের জন্য নক্ষত্রের অপেক্ষা না করবে।" (ইবনে খুযাইমাহ-২০৬১, সহীহ ইবনে হিব্বান-৩৫২০, হাকেম-১/৫৯৯, তিনি বলেছেন বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক, ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন।)

আবুল আতিয়াহ হামদানি (র) বলেন : আমি ও মাসরুক আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করি: হে উম্মুল মু'মিনিন! রাসূলের দু'জন সাহাবি : একজন দ্রুত ইফতার ও দ্রুত সালাত আদায় করেন, অপরজন দেরিতে ইফতার ও দেরিতে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন : কে দ্রুত ইফতার করে ও দ্রুত সালাত আদায় করে? : আমরা বললাম : আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তিনি বললেন : নবী ﷺ এরূপ করতেন। আবু কুরাইব বাড়িয়ে বলেছেন : দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু মূসা।"

(মুসলিম-১০৯৯, আবু দাউদ-২৩৫৪, তিরমিযী-৭০২, নাসায়ি-৪/১৪৪, আহমদ-৬/৪৬)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "ইফতার না করে কখনো নবী ﷺ-কে মাগরিবের সালাত আদায় করতে দেখিনি, তা একঢোক পানি দ্বারাই হোক।" (আবু ইয়ালা-৩৭৯২, বায্যার-৯৮৭, বায়হাকি-৪/২৩৯, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ-২০৬৩, ইবনে হিব্বান-৩৫০৪-৩৫০৫, হায়সামি মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৩/১৫৫, গ্রন্থে বলেছেন, আবু ইয়ালার বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।)

আমর ইবনে মায়মুন আওদি (র) বলেছেন : "নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ সবচেয়ে দ্রুত ইফতার করতেন ও সবচেয়ে বিলম্বে সেহরি খেতেন।"

(আব্দুর রায্যাক-৭৫৯১, বায়হাকি-৪/২৩৮, হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারিতে-৪/১৯৯, হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১০টি

১. চোখে দেখে, অথবা নির্ভরযোগ্য সংবাদ শুনে অথবা প্রবল ধারণা হয় যে, সূর্য ডুবেছে, তাহলে দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব। হাদীস তাই প্রমাণ করে, সাহাবীদের আদর্শ এরূপ ছিল। হাফেয ইবনু আব্দুল বার (র) বলেছেন : "সকল আলেম একমত যে, মাগরিবের সালাতের সময় হলে রোযাদারের ইফতার হালাল হয়, কি ফরয কি নফল। মাগরিবের সালাত রাতের সালাতের অন্তর্ভুক্ত, এতে কারো দ্বিমত নেই। (আল-ইস্তেযকার-৩/২৮৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ـ

"অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।" (সূরা বাকারা-১৮৭)

২. দ্রুত ইফতার যেহেতু বরকতময়, তাই বিলম্বে ইফতার বরকতহীন।

(আল-ইস্তেযকার-৩/১৫৩)

৩. এ উম্মতের একটি কল্যাণ হচ্ছে তারা কিতাবি তথা ইহুদি ও নাসারাদের বিপরীতে দ্রুত ইফতার করে, তারা (কিতাবিরা) নক্ষত্র বিকশিত হওয়ার অপেক্ষা করে। (ফাতহুল বারি: (৪/১৯৯), কিতাবিদের বিরোধিতা আমাদের দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এটা এ উম্মতের বড় বৈশিষ্ট্য ও সকল উম্মতের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ জন্য কাফেরদের সাথে মিল রাখা হারাম।

৪. সূর্যাস্তের পর ইফতার বিলম্ব করা সুন্নাত পরিহার ও বিদআত সৃষ্টির আলামত।

৫. এসব হাদিসে শিয়া-রাফেযা ও তাদের অনুসারীদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, যারা সূর্যাস্তের পর ইফতারের জন্য স্পষ্টভাবে তারকা দেখার অপেক্ষা করে।
(ফাতহুল বারি-৪/১৯৯)

৬. ইবাদতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের পাবন্দ হলে গোঁড়ামি, দ্বীন থেকে বিচ্যুতি ও শয়তানি প্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত থাকা যায়, যেমন নিশ্চিত সূর্যাস্তের পর দ্রুত ইফতার করা। (আল-মুফহিম-৩/১৫৭, তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৩১৪)

৭ দ্রুত ইফতারে বান্দার অপারগতা, আল্লাহর আনুগত্য ও তার রুখসতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়। (তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৩১৫)

৮. এ হাদীস প্রমাণ করে লাগাতার রোযা মাকরুহ। আরো প্রমাণ করে সালাতের পূর্বে ইফতার করা জরুরি, এতে ইফতার দ্রুত হয়।
(শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৩১১)

৯. সুন্নাতের অনুসরণ করা ও তার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা, সুন্নাত ত্যাগ করার কারণে কর্মে ফ্যাসাদ ও বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়। সাহাবিরা কোনো কর্মে সফলতা না পেলে পরখ করত, তাদের থেকে কোনো সুন্নাত ছুটে গেছে, কোনো সুন্নাত খুঁজে পেলে ধরে নিত, এ কারণে তাদের এ সমস্যা।
(মারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৩১০-৩১১)

১০. এ উম্মতের সৌভাগ্য তারা সুন্নাত লাভ করেছে, যা আল্লাহর মহব্বতকে জরুরি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা বাকারা-৩১, তুহফাতুল আহওয়াযি-৩/৩১৬)

শিক্ষা-৩৯
ইফতারের সময়

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"যখন রাত এখান থেকে আগমন করে ও দিন এখান থেকে পশ্চাত গমন করে এবং সূর্যাস্ত যায়, তাহলে রোযা পালনকারী ইফতার করল।"

(বুখারী-১৮৫৩, মুসলিম-১১০০)

তিরমিযির এক বর্ণনায় আছে–

وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ.

"এবং সূর্য অদৃশ্য হল, তাহলে তুমি ইফতার করলে।" (জামে তিরমিযী-৬৯৮, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ বলেছেন। (আমহদ-১/৩৫, দারামি-১৭০০)

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে–

إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"যখন রাত এখান থেকে আসে ও দিন এখান থেকে প্রস্থান করে এবং সূর্য অদৃশ্য হয়, তাহলে রোযাদার ইফতার করল।"

(সুনানে আবু দাউদ-২৩৫১, আহমদ-১/৫৪, ইবনে আবি শায়বাহ-২/২৭৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "কোনো এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তিনি রোযাদার ছিলেন। যখন সূর্য ডুবে গেল তিনি কাউকে বললেন: হে অমুক! উঠ আমাদের জন্য ইফতার (পানীয় জাতীয়) তৈরি কর। সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! যদি সন্ধ্যায় উপনীত

হয়ে নিতেন। তিনি বললেন : আস আমাদের জন্য ইফতার তৈরি কর। সে বলল : আপনার দিন এখনো বাকি। তিনি বললেন : আস আমাদের জন্য ইফতার তৈরি কর। সে এসে তাদের জন্য ইফতার তৈরি করল, নবী ﷺ পান করলেন। অতঃপর বললেন, যখন তোমরা দেখ রাত এখান থেকে আগমন করেছে, তখন রোযাদার ইফতার করল।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে: "তিনি নিজ হাতে পূর্ব দিকে ইশারা করেছেন।" আহমদের এক বর্ণনায় আছে : "তখন ইফতার হালাল হলো।" আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে– নবী ﷺ বেলালকে বলেছেন।

(বুখারী-১৮৫৪, মুসলিম-১১০১, আবু দাউদ-২৩৫২, আহমদ-৪/৩৮২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১২টি

১. সূর্যাস্ত হলেই ইফতার হালাল হয়। রাত আগমন ও দিন পশ্চাদগমন দ্বারা তাই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সূর্যের গোলক অদৃশ্য হওয়া, দিগন্ত বা সূর্যের কক্ষপথে আলো থাকলে তাতে সমস্যা নেই। (ইমাম কুরতুবি (র) বলেন : "এ কথা বেলাল তাকে এ জন্য বলেছে, যেহেতু সে সূর্যের আলো উজ্জ্বল দেখছিল, যদিও গোলক অদৃশ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যের আলো উপেক্ষা করে, সূর্যের শরীর অদৃশ্য হওয়াকে গ্রহণ করেন। অতঃপর যে সূর্যের শরীর দেখতে পায় না, তার ইফতারের আলামত বর্ণনা করেন, অর্থাৎ সে পূর্বদিক থেকে রাতের আগমন গণ্য করবে।" (আল-মুফহিম-৩/১৫৯)

২. নবী করীম ﷺ শরয়ি বিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গুরুত্বসহ বর্ণনা করেছেন ও স্পষ্ট বাক্যে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেমন তিনি ইফতার আরম্ভের তিনটি আলামত বর্ণনা করেছেন : রাতের আগমন, দিনের পশ্চাৎ গমন ও সূর্যাস্ত। এ তিনটি আলামত একসাথে ঘটে, একটি প্রকাশ পেলে বাকি দু'টি অবশ্যই প্রকাশ পায়। কোনো কারণে কেউ সূর্যাস্ত দেখতে পায় না, কিন্তু সে পূর্বের অন্ধকার দেখতে পায়, তখন তার জন্য ইফতার করা বৈধ। এ জন্য তিনি সবক'টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন।

৩. যখন সূর্যের গোলক ডুবে গেল, রোযাদার ইফতার করল, দিগন্তে বিদ্যমান লাল আভা ধর্তব্য নয়। যখন সূর্যের গোলক ডুবে যায়, তখন পূর্ব দিক থেকে অন্ধকার প্রকাশ পায়।

৪. রাতের কোনো অংশ রোযা অবস্থায় থাকা ওয়াজিব নয়, এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। (ইবনে বাত্তাল তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এর ওপর ইজমা বর্ণনা করেছেন-৪/১০২)

৫. মানুষ অজানা বিষয় দ্রুত অস্বীকার করে, যেমন বেলাল নবী করীম

ﷺ-এর নির্দেশ পালনে বিলম্ব করেছে। কারণ ইফতারের সময় হয়েছে বেলালের জানা ছিল না।

৬. সাহাবায়ে কেরাম সতর্কতা অবলম্বন অথবা স্পষ্টভাব জানা অথবা অধিক জানার জন্য নবী ﷺ-এর শরণাপন্ন হতেন, অতঃপর তৎক্ষণাৎ তার নির্দেশ পালনে তৎপর হতেন, যেমন বেলাল সূর্যাস্তের পর রক্তিম আভা ও উজ্জ্বলতা দেখে ভেবেছিল ইফতারের সময় হয়নি, কিন্তু নবী ﷺ যখন তাকে জানিয়ে দিলেন, সে সাথে সাথে তা বাস্তবায়ন করল।

৭ আলেম অথবা দায়িত্বশীলতা স্মরণ করিয়ে দেয়া, যদি তার ভুলে যাওয়া বা অন্যমনস্ক হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তৃতীয়বারের পর না বলা।

৮. কেউ যদি কোনো বিধান না জানে, তার জিজ্ঞাসা করা ও জানতে চাওয়া দোষণীয় নয়।

৯. এ হাদীসে কিতাবি তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরোধিতার ইঙ্গিত রয়েছে, কারণ তারা সূর্যাস্তের পর ইফতারে বিলম্ব করে। আরো রয়েছে শিয়াদের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ, যারা ইফতারের জন্য নক্ষত্র বিকশিত হওয়ার অপেক্ষা করে।

১০. ক্ষতির আশঙ্কা না হলে সফরে রোযা বৈধ।

১১. ইফতারের সময় মুয়াজ্জিনের জবাব দেয়া ও আযান পরবর্তী যিকর পাঠ করা রোযাদারের জন্য বৈধ। কারণ রোযাদার ও রোযাভঙ্গকারী সবাই দলিলের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। (ফাতাওয়া ইবনে উসাইমিন-১/৫৩১-৫৩২)

১২. রোযা রাখা, ইফতার করা ও সালাতের সময় নিরূপণে মূল হচ্ছে যমিন, যেখানে সে অবস্থান করছে; অথবা যে শূন্যে সে বিচরণ করছে। অতএব বিমান বন্দরে থাকাবস্থায় যার সূর্যাস্ত গেল, অথবা সেখানে মাগরিবের সালাত আদায় করল, অতঃপর পশ্চিমের উদ্দেশ্যে বিমান উড্ডয়ন করল, ফলে সে পুনরায় সূর্য দেখল, তাহলে তার পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরি নয়, তার সালাত ও রোযা উভয় শুদ্ধ। কারণ সে যে জমিতে ছিল তার হিসেবে ইফতার ও সালাত সম্পন্ন করেছে, তাই পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। আর যদি সূর্যাস্তের সামান্য আগে বিমান উড্ডয়ন করে, তার সাথে দিন চলতে থাকে, তাহলে তার জন্য ইফতার ও সালাত আদায় বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার আকাশের সূর্যাস্ত যায়, যেখানে সে ভ্রমণ করছে। আর যদি সে এমন দেশের ওপর দিয়ে গমন করে, যার অধিবাসীরা ইফতার ও সালাত আদায় করেছে, কিন্তু সে ঐ দেশের আসমানে (শূন্যে) সূর্য দেখছে, তার সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার ও সালাত বৈধ হবে না।

(ফাতোয়া লাজনায়ে দায়েমা-২২৫৪, ফাতাওয়া ইবনে বায়-১৫/২৯৩.৩০০-৩২২)

শিক্ষা-৪০

একুশে রমযান লাইলাতুল কদর তালাশ করা

আবু সালামা ইবনে রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “আমরা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করলাম, অতঃপর আমি আবু সাঈদ খুদরি (রা)-এর নিকট যাই, তিনি আমার একান্ত বন্ধু ছিলেন। আমি তাকে বললাম : চলুন না খেজুর বাগানে যাই? তিনি বের হলেন, গায়ে উলের কালো চাদর। আমি তাকে বললাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রমযানের মধ্য দশক ইতিকাফ করলাম। তিনি একুশের সকালে বের হয়ে আমাদেরকে খুতবা দিলেন। তিনি বললেন :

إِنِّيْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّيْ نَسِيْتُهَا أَوْ أُنْسِيْتُهَا، فَالْتَمِسُوْهَا فِيْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ، وَإِنِّيْ أُرِيْتُ أَنِّيْ أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ.

“আমি লাইলাতুল কদর দেখেছি, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি অথবা আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা তা শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাতে তালাশ কর। আমাকে দেখানো হয়েছে আমি মাটি ও পানিতে সেজদা করছি, যে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করেছিল সে যেন ফিরে আসে।” তিনি বলেন : আমরা ফিরে গেলাম, কিন্তু আসমানে কোনো মেঘ দেখিনি। তিনি বলেন, মেঘ আসল ও আমাদের উপর বর্ষিত হলো, মসজিদের ছাদ টপকে বৃষ্টির পানি পড়ল, যা ছিল খেজুর পাতার। সালাত কায়েম হলো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম পানি ও মাটিতে সেজদা করছেন। তিনি বলেন, আমি তার কপালে পর্যন্ত মাটির দাগ দেখেছি।” (দেখুন: বুখারী-১৯১২, মুসলিম-১১৬৭)

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মধ্যম দশক ইতিকাফ করেছি, যখন বিশ রমযানের সকাল হলো আমরা আমাদের বিছানা-পত্র স্থানান্তর করলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন, তিনি বললেন, যে ইতিকাফ করছিল সে যেন

তার ইতিকাফে ফিরে যায়, কারণ আমি আজ রাতে (লাইলাতুল কদর) দেখেছি, আমি দেখেছি আমি পানি ও মাটিতে সেজদা করছি। যখন তিনি তার ইতিকাফে ফিরে যান, তখন আসমান অশান্ত হলো, ফলে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। সে সত্তার কসম, যে তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, সেদিন শেষে আসমান অশান্ত হয়েছিল, তখন মসজিদ ছিল চালাঘর ও মাচার তৈরি, আমি তাঁর নাক ও নাকের ডগায় পানি ও মাটির আলামত দেখেছি।"

(দেখুন: মুসলিম-১১৬৭ আরো দেখুন: বুখারী-১৯৩৫)

অপর বর্ণনায় আছে, আবু সাঈদ খুদরি (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের মধ্যম দশক ইতিকাফ করতেন, যখন তিনি প্রস্থানরত বিশের রাতে সন্ধ্যা করে একুশের রাতে পদার্পণ করতেন, নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। যে তাঁর সাথে ইতিকাফ করত সেও ফিরে যেত। তিনি কোনো এক রমযান মাসে যে রাতে সাধারণত ইতিকাফ থেকে ফিরে যেতেন সে রাতে ফিরে না গিয়ে কিয়াম (অবস্থান) করলেন, অতঃপর খুতবা প্রদান করলেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাই তিনি লোকদের নির্দেশ করলেন। অতঃপর বললেন :

كُنْتُ أُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِيْ أَنْ أُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَثْبُتْ فِيْ مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ فَابْتَغُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ وَطِيْنٍ.

"আমি এ দশক ইতিকাফ করতাম, অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হলো যে আমি ইতিকাফ করব এ শেষ দশক। অতএব যে আমার সাথে ইতিকাফ করেছে, সে যেন তার ইতিকাফে বহাল থাকে। আমাকে এ রাতে দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা তা তালাশ কর শেষ দশকে। আর তা তালাশ কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি দেখেছি, আমি পানি ও মাটিতে সেজদা করছি।" সে রাতে আসমান গর্জন করে বৃষ্টি বর্ষণ করল। একুশের রাতে নবী ﷺ-এর সালাতের জায়গায় মসজিদ ফোটা ফোটা বৃষ্টির পানি ফেলল। আমার দু'চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছে, আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি দিলাম, তিনি সকালের সালাত থেকে ফিরলেন, তখন তাঁর চেহারা মাটি ও পানি ভর্তি ছিল।"

(বুখারী-১৯১৪)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৪টি

১. ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা এবং উপযুক্ত স্থান ও সময়ে আলেমদের জিজ্ঞাসা করা।

২. শিক্ষকদের কর্তব্য ছাত্রদের সুযোগ দেয়া, যেন তারা সুন্দরভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে।

৩. মুসল্লির চেহারায় সেজদার সময় যে ধুলা-মাটি লাগে তা দূর করা উচিত নয়, তবে তা যদি কষ্টের কারণ হয়, সালাতের একাগ্রতা নষ্ট করে, তাহলে মুছতে সমস্যা নেই। (বুখারী হুমাইদি থেকে বর্ণনা করেন, মুসল্লির জন্য সুন্নাত হচ্ছে সালাতে চেহারা না মুছা। ইমাম নববী বলেছেন : আলেমগণ অনুরূপ বলেছেন : সালাতে চেহারা না মোছা মুস্তাহাব। শারহু মুসলিম-৮/৬১, ইব্ন মুলাক্কিন বলেছেন : এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। শারহুল উমদাহ-৫/৪২৩, দেখুন; ইকমালুল মুয়াল্লিম-৪/১৪৮)

মাটিতে সেজদা দেয়া ও সালাত আদায় করা বৈধ। (শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২৫)

৪. নবী করীম ﷺ মানুষ, তিনি মানুষের ন্যায় ভুলে যান, তবে আল্লাহ তাঁকে যা পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা ব্যতীত, কারণ সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁকে ভুল থেকে হিফাজত করেন। নবীদের স্বপ্ন সত্য, তাঁরা যেভাবে দেখেন সেভাবে তা ঘটে।

৫. নবী ﷺ-এর লাইলাতুল কদর দেখার অর্থ তিনি তা জেনেছেন, অথবা তাঁর আলামত দেখেছেন। আবু সাঈদ (রা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন : জিবরাঈল তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, লাইলাতুল কদর শেষ দশকে।

(বুখারী-৭৮০, মুনতাকা লিল বাজি-২/৮২)

৬. আলেম যদি কোনো বিষয় জানার পর ভুলে যায়, তাহলে সাথীদের বলে দেয়া ও তা স্বীকার করা। (শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২৪)

৭. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, রমযানে ইতিকাফ করা মুস্তাহাব। তবে প্রথম দশক থেকে মধ্যম দশক উত্তম, আবার মধ্যম দশক থেকে শেষ দশক উত্তম। (শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২২)

৮. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ইমামের খুতবা দেয়া ও জরুরি বিষয় বর্ণনা করা বৈধ।

৯. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ উম্মতকে তাদের কল্যাণের বস্তু জানানোর জন্য উদগ্রীব ছিলেন। লাইলাতুল কদর তালাশে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ সচেষ্ট থাকতেন।

১০. রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ফযীলত বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যেহেতু নবী করীম ﷺ কখনো তা ত্যাগ করেননি।

১১. লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে, আরো বিশেষ একুশের রাত।

১২. সেজদায় কপাল ও নাক স্থির রাখা ওয়াজিব, যেরূপ নবী ﷺ রেখেছেন।

১৩. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ এর যুগে মুসলিমগণ দুনিয়ার সামান্য বস্তু ও সাধারণ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাদের মসজিদ ছিল খেজুর পাতার, যখন বৃষ্টি হতো, সালাতে থাকাবস্থায় তাদের ওপর বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ত।

১৪. একুশে রমযানের ফযীলত, এটা সম্ভাব্য লাইলাতুল কদরের রাত, অতএব এ রাতে অবহেলা করা মুসলিমদের উচিত নয়।

শিক্ষা-৪১

রমযানের শেষ দশকে রাত্রি জাগরণ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (রমযানের) শেষ দশক উপস্থিত হতো, নবী ﷺ লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন, রাত্রি জাগরণ করতেন ও পরিবারের সদস্যদের জাগিয়ে তুলতেন।" (বুখারী-১৯২০, মুসলিম-১১৭৪)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশকে এমন মুজাহাদা করতেন, যা তিনি অন্য সময় করতেন না। (মুসলিম-১১৭৫)

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রমযানের শেষ দশকে নিজ পরিবারকে জাগ্রত করতেন। (তিরমিযী-৭৯৫)

হাদীসটি ইমাম আহমদ (র) এভাবে বর্ণনা করেন: "রমযানের শেষ দশক শুরু হলে নবী ﷺ পরিবারের লোকদের জাগাতেন ও লুঙ্গি উঁচু করে নিতেন। আবু বকর ইব্ন বলেন : আয়েশাকে জিজ্ঞেস করা হলো, লুঙ্গি উঁচু করে পরার অর্থ কী? তিনি বললেন : স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ। (আহমদ-১/১৩২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৬টি

১. নবী করীম ﷺ ইবাদতের জন্য অধিক পরিশ্রম করতেন, অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, তবে অন্যান্য রাতের তুলনায় রমযানের শেষ দশকের রাতসমূহে তাঁর পরিশ্রম অধিক ছিল।

২. রমযানের শেষ দশকে স্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করে সালাত, যিকর প্রভৃতি ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে বিনিদ্র রাত কাটানো নবী ﷺ এর অন্যতম আদর্শ।

৩. রমযানের শেষ দশকের রাতে পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে তুলা সুন্নত। যদি রমযানে তাদের রাত জাগার অভ্যাস হয়, তাহলে যেন গল্প-গুজব ত্যাগ করে সালাত ও যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকে।

৪. গৃহকর্তা স্ত্রী-সন্তানদের ওপর নফল ইবাদত আবশ্যক ও তার চাপ প্রয়োগ করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে তার আনুগত্য তাদের ওপর ওয়াজিব। (শারহু ইব্ন বাত্তাল-৪/১৫৯, আল-মুফহিম-৩/২৪৯)

৫. রমযানের শেষ দশকের রাতে সালাত ও যিকরে মগ্ন থাকা মোস্তাহাব। কারণ তা নবী করীম ﷺ-এর আমল, উপরের হাদিস তার প্রমাণ। আর সারারাত জাগ্রত থাকার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তার অর্থ সারা বছর রাত জাগ্রত থাকা, তবে যেসব রাতে বিশেষ ফযিলত রয়েছে যেমন শেষ দশকের রাত, তা ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম। (শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৭১, ফাতাওয়াল কুবরা লি ইব্ন তাইমিয়াহ-২/৪৯৮, দিবায-৩/২৬৪, আউনুল মাবুদ-৪/১৭৬, আদদুররিল মুদিয়াহ লিশ শাওকানি-১/২৩৪))

৬. শেষ দশকের রাতগুলো জাগার উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর তালাশ করা। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে তিনি লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যদি সারা বছর তার সম্ভাবনা থাকত, তাহলে তার অনুসন্ধানে অনেকের খুব কষ্ট হত, বরং অধিকাংশ লোক তা থেকে বঞ্চিত থাকত। (শারহু ইব্ন বাত্তাল-৪/১৫৯)

শিক্ষা-৪২

লায়লাতুল কদরের আলামত

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাঈল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত"।

(সূরা কদর : আয়াত-৪-৫)

যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি উবাই ইব্‌নে কাবকে বলতে শুনেছি: তাকে বলা হয়েছিল: আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ বলেন; যে ব্যক্তি সারা বছর রাত জাগ্রত থাকবে, সে লাইলাতুল কদর লাভ করবে। উবাই বলেন: আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, সন্দেহ নেই লাইলাতুল কদর রমযানে। তিনি নির্দিষ্টভাবে কসম করে বলেন: আল্লাহর শপথ আমি জানি তা কোন রাত, এটা সে রাত, যার কিয়ামের নির্দেশ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদান করেছেন, তা হচ্ছে সাতাশের সকালের রাত, তার আলামত হচ্ছে সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে সাদা, তার কোনো কিরণ থাকবে না"।

(মুসলিম)

ইব্‌নে হিব্বানের এক বর্ণনায় আছে: "তার আলামত হচ্ছে সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে সাদা, তার কোনো কিরণ থাকবে না, যেন তার আলো মুছে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম-৭৬২, ইবন হিব্বান-৩৬৯০)

আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النِّصْفِ مِنَ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاةً إِذْ صَافِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَوَجَدْتُهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

"নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমযানের শেষ সাতের মাঝখানে, সেদিন সকালে শুভ্রতা নিয়ে সূর্য উদিত হবে, তার মধ্যে কোনো কিরণ থাকবে না। ইবন

মাসউদে (রা) বলেন : আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সেরূপ দেখেছি, যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।" (আহমদ-১/৪০৬, ইব্ন আবি শায়বাহ-২/২৫০, আহমদ শাকির হাদীসটি সহীহ বলেছেন-৩৮৫৭)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেছেন :

اِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ اَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِى الْاَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ عَدَادِ الْحَصَى.

"এটা হচ্ছে সাতাশ অথবা উনত্রিশের রাত, সে রাতে কঙ্করের চেয়ে অধিক সংখ্যায় ফেরেশতারা পৃথিবীতে অবস্থান করেন।" (আহমদ-২/৫১৯, তায়ালিসি-২৫৪৫, সহীহ ইবন খুযাইমাহ-২১৯৪, ইবন কাসির তার তাফসিরে বলেন, এর সনদে সমস্যা নেই-৪/৫৩৫, হায়সামি বলেছেন: এ হাদীসটি আহমদ, বায্যার ও তাবরানি আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য-৩/১৭৫-১৭৬, সহিহ ইবন খুজাইমার টীকায় আলবানি হাদীসটি হাসান বলেছেন-৩/৩৩২, আরো দেখুন: সিলসিলাতুল আহাদিসিস সাহিহা-২২০৫)

উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

اِنَّ اَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ - اَىْ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةٌ كَانَ فِيْهَا قَمَرًا سَاطِعًا، سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ. اَىْ فِيْهَا سُكُوْنٌ - لاَ بَرْدَ فِيْهَا وَلاَ حَرَّ، وَلاَ يَحِلُ لِكَوْكَبٍ اَنْ يُرِىَ بِهِ فِيْهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَاِنَّ اَمَارَتَهَا اَنَّ الشَّمْسَ صَبِيْحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ.

"নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদরের আলামত, তা হবে সাদা ও উজ্জ্বল, যেন তাতে আলোকিত চাঁদ রয়েছে, সে রাত হবে স্থির, তাতে ঠাণ্ডা বা গরম থাকবে না, তাতে সকাল পর্যন্ত কোনো তারকা দ্বারা ঢিল ছোঁড়া হবে না। তার আরো আলামত, সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে সমানভাবে, চৌদ্দ তারিখের চাঁদের

ন্যায়, তার কোনো কিরণ থাকবে না, সেদিন শয়তানের পক্ষে এর সাথে বের হওয়া সম্ভব নয়।" (আহমদ-৫/৩২৪, তাবরানি ফি মুসনাদিশ শামিয়্যিন-১১১৯, দিয়া ফিল মুখতারাহ-৩৪২, হায়সামি ফিয যাওয়ায়েদ-৩/১৭৫, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।)

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنِّيْ كُنْتُ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ نَسِيْتُهَا وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَهِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيْهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا .

"আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে শেষ দশকে। সে রাত হবে সাদা উজ্জ্বল, না-গরম, না-ঠাণ্ডা, যেন আলোকিত চাঁদ নক্ষত্রগুলোকে আড়াল করে আছে, ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে রাতের শয়তান বের হতে পারে না।" (ইবন খুযাইমাহ-২১৯০, ইবন হিব্বা-৩৬৮৮, আলবানি অন্যান্য শাহেদের কারণে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেন :

لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءُ ضَعِيْفَةً .

"লাইলাতুল কদর সাদা-উজ্জ্বল, না গরম না ঠাণ্ডা, সে দিন ভোরে সূর্য উদিত হবে দুর্বল রক্তিম আভা নিয়ে।" (ইবন খুযাইমাহ-২১৯২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. আলেম যদি ভালো মনে করেন, তবে জানা ইলম গোপন করা বৈধ, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লাইলাতুল কদর গোপন করেছেন, যেন মানুষেরা অলসতা না করে ও পুরো দশ রাতের কিয়াম থেকে বিরত না থাকে।

২. আলেমগণ মানুষের জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করবেন, যেমন উবাই ইবনে কাব লাইলাতুল কদর বর্ণনা করেছেন।

৩. মুসলিমদের স্বার্থ নিরূপণে আলেমদের ইজতিহাদ ও ইখতিলাফ বৈধ, এটা নিষিদ্ধ নয়, যদি সঠিক পদ্ধতি ও সত্য অন্বেষণের জন্য হয়।

৪. লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, এতে অধিক সম্ভাব্য রাত হচ্ছে বেজোড় রাতগুলো, এতেও অধিক সম্ভাব্য রাত হচ্ছে সাতাশের রাত, যেমন উবাই ইবনে কাব কসম করে বলেছেন।

৫. লাইলাতুল কদরের অনেক আলামত রয়েছে;

ক. অধিক সংখ্যায় ফেরেশতা নাযিল হন। তাদের শুরুতে থাকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, তারা মুসল্লিদের সাথে মসজিদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সংখ্যা কঙ্করকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়, তবে এ আলামত মানুষের নিকট প্রকাশ পায় না।

খ. সে রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণ কল্যাণ বর্ষিত হয়, যেহেতু বান্দাগণ তাতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে।

গ. সে দিন সকালে সাদা ও উজ্জ্বলতাসহ সূর্য উদিত হয়, তার কিরণ থাকে না। ওলামায়ে কেরাম এর কারণ সম্পর্কে বলেন : ফেরেশতাগণ আসমানে বিচরন করতে থাকেন, ফলে তাদের নূর ও পাখা সূর্যের কিরণের আড়াল হয়। (দেখুন: ইকমালুল মুয়াল্লিম-৪/১৪৮, শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৬৫, আল-মুফহিমক-২/৩৯১, দিবাজ-৩/২৫৯, ফায়যুল কাদির-৫/৩৯৬ কারণ সে রাতে বহু ফেরেশতা অবতরণ করেন।

ঘ. এ রাত সাদা-উজ্জ্বল ও স্থির, না-গরম, না-ঠাণ্ডা, এটা তুলনামূলক বিষয়, বিভিন্ন দেশের ভিত্তিতে ঠাণ্ডা-গরম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ লাইলাতুল কদর পূর্বাপর রাতের তুলনায় বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরম হবে না।

ঙ. শয়তান লাইলাতুল কদরের ভোরে সূর্যের সাথে বের হতে পারে না, লাইলাতুল কদর ব্যতীত সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মধ্য দিয়ে উদিত হয়।

৬. লাইলাতুল কদরের অধিকাংশ আলামত লাইলাতুল কদর শেষে জানা যায়। এর উপকারিতা হচ্ছে: যারা লাইলাতুল কদর পেয়েছে, তারা আল্লাহর শোকর আদায় করবে, আর যারা পায়নি তারা অনুতপ্ত হবে ও আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নিবে।

৭. এসব আলামত প্রত্যেক বছর লাইলাতুল কদরে প্রকাশ পায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের জন্য খাস নয়। (আল-মুফহিম-২/৩৯১)

৮. মুসলিমদের উচিত লাইলাতুল কদর তালাশ করা, যেহেতু তাতে অনেক কল্যাণ বিদ্যমান।

শিক্ষা-৪৩

তেইশে রমযান লাইলাতুল কদর তালাশ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস জুহানি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ : فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ : ثَلاَثٍ وَّعِشْرِينَ.

আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, অঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি দেখেছি আমি সে রাতের সকালে পানি ও মটিতে সেজদা করছি। তিনি বলেন : তেইশ তারিখের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে সালাত আদায় করে ঘুরে বসেন, তখন তার কপাল ও নাকের ওপর পানি ও মাটির আলামত ছিল। তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস বলতেন : সেটা ছিল রমযানের তেইশ তারিখ।

(মুসলিম-১১৬৮, আহমদ-৩/৪৯৫, আবু দাউদ-১৩৭৯)

ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস নবী ﷺ কে বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি খুব দূরের লোক, আমাকে একটি রাতের নির্দেশ দেন যেন আমি আসতে পারি। তিনি বললেন :

أَنْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

"তুমি রমযানের তেইশের রাতে আস।" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক-১/৩২০)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমি রমযানে ঘুমিয়ে ছিলাম, আমাকে নিয়ে আসা হলো, বলা হলো : আজ কদরের রাত। তিনি বলেন : আমি তন্দ্রাসহ দাঁড়িয়ে রাসূলের তাঁবুর রশি ধরে তাঁর নিকট আগমন করলাম, তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি বলেন : আমি লক্ষ্য করলাম সে রাত ছিল তেইশের রাত।" (আহমদ-১/২৫৫, ইবন আবি শায়বাহ-২/২৫০, তাবরানি ফিল কাবির-১১/২৯২, হাদিস নং-১১৭৭৭, হায়সামি মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৩/৭৬, গ্রন্থে বলেন : "আহমদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী।)

চাঁদের দিকে দেখলাম, আমি তা গামলার অর্ধেক টুকরার ন্যায় দেখলাম। আবু ইসহাক সাবিহি তেইশের রাতে চাঁদ অনুরূপ হয়।" (আহমদ-৫/৩৬৯, নাসায়ি ফিল কুবরা-৩৪১১, তার সনদ সহীহ। আহমদ এটা হুযায়ফা সূত্রে আলী থেকেও বর্ণনা করেছেন-১/১০১, আহমদ শাকের তা হাসান বলেছেন-৭৯৩)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِيْنَ طَلَعَ الْقَمَرَ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةَ ـ

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট লাইলাতুল কদরের আলোচনা করলাম, তিনি বললেন : 'তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ করতে পারে সে সময়ের কথা যখন চাঁদ উদিত হয় গামলার অর্ধেক টুকরার ন্যায়?" (মুসলিম-১১৭০)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৪টি

১. নবী করীম ﷺ-কে লাইলাতুল কদর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, এর হিকমত হয়তো : মানুষ যেন অলস না হয় ও অন্য রাতে ইবাদত ত্যাগ না করে।

২. সাহাবিগণ ইবাদত ও যিকর করার উদ্দেশ্যে ফযীলতপূর্ণ রাত অন্বেষণ করতেন ও সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

৩. তেইশের রাত ফযীলতপূর্ণ, এ রাত লাইলাতুল কদরের একটি সম্ভাব্য রাত, অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এ রাতে জাগ্রত থাকা ও অধিক ইবাদত করা।

৪. তেইশের রাতে চাঁদ বড় গামলার [অর্ধেকের] ন্যায় হয়, এসব হাদীস দ্বারা বুঝা যায় উল্লেখিত রাত সে বছর লাইলাতুল কদর ছিল।

শিক্ষা-৪৪

লাইলাতুল কদরের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ـ

"নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।" (সূরা দুখান-৩-৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ط لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ج مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ لا سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

"নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে'। তোমাকে কি জানাব 'লাইলাতুল কদর' কী? 'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাঈল)। তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত"।

(সূরা আল-কাদর-১-৫)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

"লাইলাতুল কদরে যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল পাপ মোচন করা হবে।" (বুখারী-৩৫, মুসলিম-৭৬০)

হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত আছে :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

"লাইলাতুল কদরে যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল পাপ মোচন করা হবে।" (বুখারী-১৮০২, মুসলিম-৭৬০)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেছেন :

"লাইলাতুল কদর সাতাশ অথবা ঊনত্রিশের রাত, সে রাতে পৃথিবীতে ফেরেশতাদের সংখ্যা কঙ্করের চেয়ে অধিক হয়।" (আহমদ-২/৫১৯, তায়ালিসি, তায়ালিসি-২৫৪৫, ইব্‌ন খুযাইমাহ হাদীসটি সহীহ বলেছেন-২১৯৪)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. লাইলাতুল কদরের ফযীলতের কয়েকটি দিক

ক. এ রাত আল্লাহর নিকট খুব মর্যাদাপূর্ণ।

খ. এ রাত এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, যেখানে লাইলাতুল কদর নেই; যা প্রায় তিরাশি বছর চার মাসের সমপরিমাণ।

গ. এ রাতে অগণিত ফেরেশতাদের অবতরণ হয়, যাদের সংখ্যা কঙ্করের চেয়ে বেশি।

ঘ. এ রাতে কুরআনুল কারীম নাযিল করা হয়েছে।

ঙ. এ রাতে অধিক পরিমাণ আযাব থেকে নিরাপত্তা নাযিল হয়, কারণ এতে বান্দাগণ অধিক পরিমাণ ইবাদত করে, যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে রহমত, মাগফেরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন।

চ. এ রাত বরকতময়, কারণ এ রাতের ফযীলত অনেক।

ছ. এ রাতে যে বিশ্বাস, আল্লাহর ওয়াদার ওপর আস্থা ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করবে, তার পূর্বের মাপ মোচন করা হবে।

জ. এ রাতে পূর্ণ বছরের তাকদির লেখা হয়।

ঝ. এ রাতে যে কিয়াম করল ও জাগ্রত থাকল, সে অবশ্যই আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হলো।

২. মুসলিমদের উচিত লাইলাতুল কদর তালাশ করা। এ জন্য শেষ দশকে কিয়াম, সালাত, দো'আ ও যিকরে অধিক মশগুল থাকা। মাহরুম বা বঞ্চিত ব্যতীত কেউ ফযীলতপূর্ণ এ রাত থেকে গাফেল থাকে না। আল্লাহর নিকট দো'আ করছি, তিনি আমাদেরকে এ ফযীলত অর্জনের তওফিক দান করুন।

৩. লাইলাতুল কদরের বরকতের অর্থ তাতে সম্পাদিত আমলের বরকত, কারণ এ রাতে যে যত্নসহ আমল করবে, তার আমল হাজার মাসের আমলের চেয়ে উত্তম। এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ।

৪. এ উম্মতের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে প্রতি বছর এ রাত দান করেন।

৫. লাইলাতুল কদর অন্য সকল রাত থেকে উত্তম, জুমার রাত লাইলাতুল কদর থেকে উত্তম এ কথা শুদ্ধ নয়। হ্যাঁ যদি জুমার রাতে লাইলাতুল কদর হয়, তাহলে তার ফযিলত বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নেই।

৬. নবী ﷺ এর ক্ষেত্রে ইসরা ও মেরাজের রাত লাইলাতুল কদর থেকে উত্তম। কারণ এ রাতে তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ রাতে তাঁর সাথে তাঁর রব কথা বলেছেন। এটা তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সম্মান ও মহান মর্যাদা। তবে অন্যান্য মুসলিমের বিবেচনায় ইসরা ও মেরাজের রাতের তুলনায় লাইলাতুল কদর মহান ও অধিক মর্যাদাশীল।

(মাজমু ফাতাওয়া ইবন তাইমিয়াহ-২৫/২৮৬)

৭. কতক আলেম উল্লেখ করেছেন লাইলাতুল কদর এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য, কতক দুর্বল হাদীসে এ রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এর বিপরীত কতক হাদীসে এসেছে আমাদের পূর্বের উম্মত বা তাদের নবীদের মধ্যেও লাইলাতুল কদর ছিল, তবে এসব হাদীস দুর্বল। (আমাদের পূর্বে লাইলাতুল কদর ছিল যেসব হাদীসে এসেছে, তার মধ্যে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস অন্যতম, তাতে এসেছে :

"আমি বললাম : লাইলাতুল কদর কি নবীদের যুগ পর্যন্ত থাকে, অতঃপর তা উঠিয়ে নেয়া হয়, না কিয়ামত পর্যন্ত থাকে? তিনি বললেন : বরং কিয়ামত পর্যন্ত থাকে।" আহমদ : (৫/১৭), নাসায়ি ফিল কুবরা : (৩৪২৭), হাকেম : (১/৩০৭), তিনি মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন।

৮. মুসলিমের বর্ণনা এসেছে–

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ.

'যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর জেনে ঈমান ও সওয়াবের আশায় কিয়াম করবে, তার পাপ মোচন করা হবে।" এ হাদীস তাদের দলিল, যারা বলে : লাইলাতুল কদর তার জন্যই হবে, যে জানে যে আজ লাইলাতুল কদর। কিন্তু হাদীসের বাহ্যিক শব্দ তা প্রমাণ করে না, বরং হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যে লাইলাতুল কদরে কিয়াম করে লাইলাতুল কদরে কিয়াম করার নিয়তে, আর বাস্তবিক তা লাইলাতুল কদর হয় কিন্তু সে তা নিশ্চিত জানে না সে লাইলাতুল কদর লাভ করবে।"

শিক্ষা-৪৫

শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একদল সাহাবিকে শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّاهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ

"আমি দেখছি তোমাদের সবার স্বপ্ন শেষ সাতের ব্যাপারে অভিন্ন, অতএব যে লাইলাতুল কদর তালাশ করতে চায়, সে যেন তা শেষ সাতে তালাশ করে।" (বুখারী ও মুসলিম।)

অপর বর্ণনায় আছে :

اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ، فَاِنْ ضَعُفَ اَحَدُكُمْ اَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِىْ ـ

"তোমরা শেষ দশে লাইলাতুল কদর তালাশ কর, যদি তোমাদের কেউ দুর্বল হয়, অথবা অপারগ হয়, তবে শেষ সাতে যেন তা অন্বেষণ করা ত্যাগ না করে"।

অপর বর্ণনায় আছে :

تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ

"তোমরা লাইলাতুল কদর শেষ সাতে তালাশ কর।" (দেখুন: বুখারী-১৯১১, মুসলিম-১১৬৫, শেষের দুটি বর্ণনা মুসিলমের)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৭টি

১. এ উম্মতের সম্মিলিত বর্ণনা, সিদ্ধান্ত ও স্বপ্ন নির্ভুল। কারণ নবী ﷺ এখানে তাদের অভিন্ন স্বপ্নকে গ্রহণ করেছেন।
(দেখুন : ইলামুল মুয়াক্কিয়িন-১/৮৪, আর-রূহ-১৩৬, ফাতহুল কাদির-১২/৩৮০)

২. লাইলাতুল কদর তালাশ করা ও তাতে রাত জাগা জরুরি, কারণ তাতে রয়েছে ফযীলত, বরকত ও কল্যাণ। তবে এটা ওয়াজিব নয়, সুন্নাত।
(দেখুন: আল-ইস্তেযকার-৩/৪১৬)

৩. এ হাদীস স্বপ্নের গুরুত্ব প্রমাণ করে, সম্ভাব্য ঘটমান বিষয়ে তার ওপর নির্ভর করা বৈধ, যদি শরিয়তের নির্দেশের বিপরীত না হয়। (দেখুন: ফাতহুল বারি-৪/২৫৭, শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪১১) তবে স্বপ্নের ওপর অধিক নির্ভর করা ঠিক নয়, যা মূল উদ্দেশ্য বিচ্যুত ঘটার কারণ হয়।

৪. স্বপ্ন কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, কখনো হয় মনের ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত, আবার কখনো হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কোনো বিষয়ে যদি মু'মিনদের স্বপ্ন অভিন্ন হয়, তাহলে সেটা সত্য, যেমন তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও বর্ণনা সত্য। কারণ একজনের বর্ণনা অথবা সিদ্ধান্তে অসৎ উদ্দেশ্য গোপন থাকতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারে সকল মুসলিম একমত হতে পারে না।

(দেখুন : মিনহাজুজ সুন্নাহ নব্বীয়াহ-৩/৫০০, মাদারেজুস সালেকিন-১/৫১)

৫. এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশের কথার ওপর আমল করা যায়, যদি কুরআন-হাদীস, ইজমা ও স্পষ্ট কিয়াসের বিরোধী না হয়।

(দেখুন : শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪১৪)

৬. সাহাবিদের স্বপ্ন এ ক্ষেত্রে অভিন্ন যে, রমযানের শেষ সাতে লাইলাতুল কদর বিদ্যমান, নবী ﷺ সে বছর তাদেরকে শেষ সাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব এ রাতগুলো অধিক সম্ভাবনাময়। (ইবন বাত্তাল (র) তার বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইবন ওমরের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "লাইলাতুল কদর শেষ সাতে তালাশ কর"। এর অর্থ : এটা সে বছরের ঘটনা, যে বছর তাদের স্বপ্ন পরস্পর অভিন্ন ছিল, অর্থাৎ তেইশের রাত। কারণ তিনি আবু সাঈদের হাদীসে বলেছেন : তোমরা লাইলাতুল কদর শেষ দশের বেজোড় রাতে তালাশ কর, আমি দেখেছি আমি মাটি ও পানিতে সেজদা করছি। (আবু সাঈদ বলেন) আমাদের ওপর একুশের রাতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। এ হিসেবে দেখা যায় আবু সাঈদের হাদিসে লাইলাতুল কদর শেষ সাতে ছিল না। ইমাম তাহাভি বলেন : এ ব্যাখ্যা হিসেবে হাদিসের মধ্যে কোনো বৈপরিত্ব থাকে না।)

৭. লাইলাতুল কদর কতককে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় দেখানো হয়, সে তার আলামত দেখতে পায়, অথবা স্বপ্নে কাউকে দেখে, যে তাকে বলে: এটা লাইলাতুল কদর। কখনো আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে এমন নিদর্শন প্রকাশ করেন, যার দ্বারা সে লাইলাতুল কদর স্পষ্ট বুঝতে পারে।

(দেখুন: মজমুউল ফাতাওয়া-২৫/২৮৬)

শিক্ষা-৪৬

বিজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল কদর তালাশ করা

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَ حَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسٰى اَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ـ

"নবী করীম ﷺ আমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছেন, অতঃপর দু'জন মুসলিম ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তিনি বলেন : আমি, তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের সংবাদ দেয়ার জন্য বের হয়েছি, কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করল, ফলে তা উঠিয়ে নেয়া হয়। খুবসম্ভব এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা তা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।"

(দেখুন: বুখারী-১৯১৯, নাসায়ি ফিল কুবরা-৩৩৯৪, আহমদ-৫/৩১৩)

আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلِ اَنْ تُبَانَ لَهٗ، فَلَمَّا انْقَضَيْنَ اَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ، ثُمَّ أُبِيْنَتْ لَهٗ اَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ، فَاَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيْدَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ : اِنَّهَا كَانَتْ أُبِيْنَتْ لِىْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَاِنِّىْ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَانِ - اَىْ يَخْتَصِمَانِ - مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَالْتَمِسُوْهَا فِى التَّاسِعَةِ والسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রমযানের মধ্যম দশক ইতিকাফ করেন, যখন তা প্রকাশ করা হয়নি। যখন ইতিকাফ শেষ হয়, তিনি তাঁবু গুটানোর নির্দেশ দেন, অতঃপর তাঁকে বলা হয় নিশ্চয় তা শেষ দশকে, ফলে পুনরায় তিনি তাঁবু টানাতে নির্দেশ দেন, পুনরায় তাঁবু টানানো হয়। অতঃপর তিনি মানুষের নিকট এসে বলেন : হে লোক সকল! আমাকে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছিল, আমি তোমাদেরকে তার সংবাদ দিতে বের হয়েছি, ইত্যবসরে দু'জন ব্যক্তি ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হয়, তাদের সাথে ছিল শয়তান, ফলে আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা তা রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর। তোমরা তা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।

(দেখুন : বুখারী-১৯১২, মুসলিম : ১১৬৭)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. বিভেদ ও ইখতিলাফ নিষেধ। দু'জন মুসলিমের অন্যায় ঝগড়া কখনো তাদের ও অন্যদের ওপর অনিষ্ট ডেকে আনে। কল্যাণ ছিনিয়ে নেয়া হয়, যেমন এখানে লাইলাতুল কদর একরাত থেকে অপর রাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। (ইকমালুল মুয়াল্লিম : ৪/১৪৮) ঝগড়ার কারণে তাদের মাগফেরাত মওকুফ করা হয় এবং তাদের আমল বিবেচনাধীন রাখা হয়, যতক্ষণ না তারা আপোষ করে। (দেখুন : আল-ইস্তেযকার : ৩/৪১২)

২. এ হাদীস প্রমাণ করে, বিশেষ ব্যক্তিদের অপরাধের কারণে কখনো সাধারণ লোক তার খেসারত দেয়। (দেখুন : ইকমালুল মুয়াল্লিম : ৪/১৪৬)

৩. লাইলাতুল কদর বিদ্যমান, এতে কারো দ্বিমত নেই, তবে তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং নবী ﷺ-কে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৫৭, ইবন মুলাক্কিন ফি শারহিল উমদাতে বলেন: "নির্ভরযোগ্য সকল আলেম একমত যে, লাইলাতুল কদর সর্বদা বিদ্যমান আছে এবং পৃথিবীর শেষ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে"। আত-তামহিদ-২/২০০)

৪. লাইলাতুল কদর অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে একটি কল্যাণ হচ্ছে শেষ দশকের ইবাদত। (মিনহাতুল বারি-৪/৪৫৫, শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৫৮)

৫. লাইলাতুল কদরের সম্ভাব্য তারিখ শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলো।

৬. লাইলাতুল কদর নবীﷺএর কাছে প্রথমে গোপন ছিল, অতঃপর তাকে জানানো হয়, অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়।

৭. লাইলাতুল কদর তালাশে নবীﷺএর আগ্রহ, শেষ দশকে জানার পূর্বে তিনি মধ্যম দশকে তা তালাশ করেছেন, অথচ আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৮. লাইলাতুল কদরের প্রতি গভীর আগ্রহ ও তা অন্বেষণ করা নবীﷺএর আদর্শ, যা শেষ দশক জাগ্রত থাকা ব্যতীত অর্জিত হয় না, বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলো।

শিক্ষা-৪৭

লাইলাতুল কদরের দোয়া

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বলেছি : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমি যদি লাইলাতুল কদর জানতে পারি, আমি তাতে কি বলব? তিনি বললেন : তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ .

"হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, মহানদাতা-সম্মানিত, ক্ষমা করা ভালোবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন এ হাদীস হাসান, সহিহ। (তিরমিযী-২৫১৩, ইবন মাজাহ-৩৮৫০, নাসায়ি ফিল কুবরা-১০৭০৮, আহমদ-৬/১৭১, হাকেম হাদীসটি সহীহ বলেছেন, এবং বলেছেন : বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক-১/৭১২)

ইবন মাজার শব্দ হচ্ছে: আয়েশা (রা) বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি দেখেছেন, আমি লাইলাতুল কদর পেলে কি দো'আ করব? তিনি বললেন : তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ .

শিক্ষা ও মাসায়েল ৮টি

১. লাইলাতুল কদরের ফযিলত এবং উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রা)-এর তা অন্বেষণ করা, তাতে কিয়াম ও দো'আ করার গভীর আগ্রহ প্রমাণিত হয়।

২. কল্যাণকর বস্তু জানার জন্য সাহাবিদের প্রশ্ন করার আগ্রহ।

৩. লাইলাতুল কদরের দো'আ ফযীলতপূর্ণ এবং তা কবুলের সম্ভাবনা রাখে।

৪. ব্যাপক অর্থপূর্ণ শব্দের মাধ্যমে দো'আ করা মুস্তাহাব। দো'আয় লৌকিকতা ও এমন শব্দ পরিহার করা, যার অর্থ অস্পষ্ট।

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাতলানো এ দো'আ ব্যাপক অর্থপূর্ণ ও সবচেয়ে উপকারী। এ দো'আতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, কারণ আল্লাহ যখন দুনিয়াতে কোনো বান্দাকে ক্ষমা করবেন, তিনি তার থেকে শাস্তি দূরীভূত করবেন, তার ওপর নিয়ামতরাজি বর্ষণ করবেন। আর যখন তিনি কোনো বান্দাকে আখিরাতে ক্ষমা করবেন, তিনি তাকে আগুন থেকে মুক্তি দেবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

৬. এ হাদীসে আল্লাহর 'ভালোবাসা' গুণটি প্রমাণিত হয়, যেভাবে তার জন্য ভালোবাসা গুণটি উপযোগী। আর তিনি ক্ষমা করা ভালোবাসেন।

৭. মানুষদের ক্ষমা করার ফযীলত, কারণ আল্লাহ ক্ষমা করা পছন্দ করেন, অনুরূপ যারা মানুষদের ক্ষমা করে তাদের তিনি পছন্দ করেন।

৮. নবী ﷺ নিজ উম্মতের কল্যাণ কামনা করেন ও তাদেরকে উপকারী বিষয় শিক্ষা দেন।

শিক্ষা-৪৮

সাতাশে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা

যির ইবনে হুবাইশ (র) বলেন : ""আমি উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাসা করে বলি: তোমার ভাই ইবনে মাসউদ বলেন : যে ব্যক্তি সারা বছর রাতে কিয়াম করবে সে লাইলাতুল কদর লাভ করবে। তিনি বললেন : আল্লাহ তার ওপর রহম করুন, তার উদ্দেশ্য মানুষ যেন অলস না হয়, অন্যথায় তিনি ভাল করে জানেন যে, লাইলাতুল কদর রমযানে, বিশেষ করে শেষ দশকে, বরং সাতাশে। অতঃপর তিনি শপথ করে বলেন, এতে সন্দেহ নেই লাইলাতুল কদর সাতাশে। আমি বললাম : আপনি তা কিভাবে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান, তিনি বললেন : নিদর্শন দেখে অথবা রাসূলের বাতলানো আলামত দেখে :

أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا .

"সেদিন সূর্য উদিত হবে যে, তার কিরণ থাকবে না।"

(মুসলিম-৭৬২, আবু দাউদ-১৩৭৮, তিরমিযী-৩৩৫১, আহমদ-৫৪/১৩০)

ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় আছে :

أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ غَدَاةَ إِذْ كَأَنَّهَا طَسْتٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ ـ

"সেদিন সকালে সূর্য উদিত হবে, যেন তা গামলা, যার কোনো আলো নেই।" (আহমদ-৫/১৩০, ইবন হিব্বান এ হাদীস সহীহ্ বলেছেন, হাদীস নং-৩৬৯০)

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, উবাই বলেছেন : "আল্লাহর শপথ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নিশ্চিত জানে যে, লাইলাতুল কদর রমযানে এবং তা সাতাশে, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে চাননি, যেন তোমরা অলস বসে না থাক।" (তিরমিযী-৭৯৩, তিনি হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ বলেছেন।)

মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

"লাাইলাতুল কদর হচ্ছে সাতাশের রাত।"

(আবু দাউদ-১৩৮৬, ইবন হিব্বান-৩৬৮০, আলবানি তা সহীহ্ বলেছেন।)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে : হে আল্লাহর নবী! আমি খুব বৃদ্ধ ও অসুস্থ লোক, আমার দ্বারা দাঁড়িয়ে থাকা খুব কঠিন, অতএব আমাকে এমন এক রাতের কথা বলুন, যেন সে রাতে আল্লাহ আমাকে লাইলাতুল কদর দান করেন, তিনি বললেন : তোমার উচিত সাতাশ আঁকড়ে ধরা।" (আহমদ-১/২৪০, বায়হাকি-৪/৩১২, তাবরানি ফিল কাবির-১১/৩১১, হাদীস নং-১১৮৩৬, হায়সামি ফি মাজমাউয যাওয়ায়েদ'-৩/১৭৬, গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী। শায়খ আহমদ শাকের হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন-২১৪৯)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৭টি

১. আমাদের পূর্বসূরিগণ কল্যাণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তারা ইবাদতে মগ্ন থাকার জন্য ফযীলতপূর্ণ সময় অনুসন্ধান করতেন।

২. কারণবশত কোনো বিষয় না বলা আলেমের জন্য বৈধ, যেমন মানুষের অলসতা ও নেক আমলে ত্রুটির সম্ভাবনা ইত্যাদি।

৩. নিশ্চিত জ্ঞান বা প্রবল ধারণার ওপর কসম করা বৈধ।

৪. কিরণহীন সাদা-উজ্জ্বলতা নিয়ে সকালে সূর্যের উদয় হওয়া, লাইলাতুল কদরের আলামত।

৫. মুসলিমদের উচিত ফযীলতপূর্ণ মৌসুমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, যেমন লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রমযানের শেষ দশক, যেন অল্প আমলে তার অধিক কল্যাণ অর্জন হয়।

৬. আলেমদের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে; লাইলাতুল কদর পরিবর্তনশীল, তবে সাতাশের রাত অধিক সম্ভাবনাময়, যেমন উবাই ইবনে কাব শপথ করে বলেছেন।

৭. নবী ﷺ বৃদ্ধ লোককে লাইলাতুল কদর সাতাশে বলা অন্যান্য হাদীসের পরিপন্থী নয়, যেখানে অন্যরাতে লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে, কারণ নবী ﷺ তাকে সে বছরের কথা বলেছেন, যে বছর সে জিজ্ঞাসা করেছে। লাইলাতুল কদর সম্পর্কে সব হাদীসের মধ্যে সমতা রক্ষার জন্য এ ব্যাখ্যার বিকল্প ব্যাখ্যা নেই।

শিক্ষা-৪৯

সর্বশেষ রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা

উতাইবাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আমার পিতা আব্দুর রহমান আমাকে বলেছেন : "আবু বকরের নিকট লাইলাতুল কদর উল্লেখ করা হল, তিনি বললেন: আমি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি, তা কখনো আমি শেষ দশদিন ব্যতীত তালাশ করি না। আমি তাকে বলতে শুনেছি: লাইলাতুল কদর তোমরা রমযানের অবশিষ্ট নয় দিনে তালাশ কর, অথবা সর্বশেষ রাতে তালাশ কর।" তিনি বলেন : আবু বাকরাহ রমযানের বিশ দিন সারা বছরের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে সালাত আদায় করতেন, যখন শেষ দশক পদার্পণ করত, যখন তিনি খুব ইবাদত করতেন।"

(তিরমিযী-৭৯৪, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান-সহিহ, আহমদ-৫/৩৯, নাসায়ি ফিল কুবরা-৩৪০৩, বাযযার-৩৬৮১, তায়ালিসি-৮৮১, তারবানি ফি মুসনাদিশ শামিয়্যিন: ১১১৯)

মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "তোমরা লাইলাতুল কদর সর্বশেষ রাতে তালাশ কর।" ইবন খুজাইমাহ এ সম্পর্কে একটি অধ্যায় রচনা করেন: "রমযানের শেষ রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করার নির্দেশ প্রসঙ্গে অধ্যায়, যদিও বছরের যে কোনো সময় সে রাত হতে পারে।"

(আলবানির সহীহ হাদীস সংকলন-১৪৭১, সহীহ ইবনে খুজাইমা-২১৮৯)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৪টি

১. লাইলাতুল কদর শেষ দশকে, এর মধ্যে অধিক সম্ভাব্য হচ্ছে বেজোড় রাত, তবে অবশিষ্ট রাতের বিবেচনায় জোড় রাতে হতে পারে যদি মাস ত্রিশ দিনের হয়, এ জন্য মুসলিমদের উচিত শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ করা।

২. সাহাবিদের লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করা ও তাতে রাত জাগার আগ্রহ।

৩. কখনো রমযানের সর্বশেষ রাতে লাইলাতুল কদর হতে পারে, যেমন বিভিন্ন হাদীস তার স্থানান্তর হওয়া প্রমাণ করে।

৪. ঊনত্রিশে রমযান অথবা ইমামের কুরআন খতমের পর সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও রাত জাগরণে অলসতা না করা, কারণ মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর, যা সর্বশেষ রাতে হতে পারে।

শিক্ষা-৫০
ইতিকাফের বিধান

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَعَهِدْنَآ اِلَى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১২৫)

অন্যত্র বলেন :

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ لا فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ

"আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন।" (বুখারী-১৯২১, মুসলিম-১১৭১)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত রমযানের শেষ দশক ইতিকাফ করতেন, অত:পর তার স্ত্রীগণ তার পরবর্তীতে ইতিকাফ করেছেন।"

(বুখারী-১৯২২, মুসলিম-১১৭২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৪টি

১. ইতিকাফ পূর্বের উম্মতে বিদ্যমান ছিল।

২. ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। ইতিকাফ মহান ইবাদত, বান্দা এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। নবী করীম ﷺ সর্বদা ইতিকাফ করেছেন।"

ইমাম যুহরি (র) বলেছেন: মুসলিমদের দেখে আশ্চর্য লাগে, তারা ইতিকাফ ত্যাগ করেছে, অথচ নবী করীম ﷺ মদিনাতে আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো ইতিকাফ ত্যাগ করেননি।"

(শারহুল ইব্‌ন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৮১)

আতা আল-খুরাসানি (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আগে বলা হতো: ইতিকাফকারীর উদাহরণ সে বান্দার মতো, যে নিজেকে আল্লাহর সামনে পেশ করে বলছে : হে আল্লাহ! যতক্ষণ না তুমি ক্ষমা কর, আমি তোমার দরবার ত্যাগ করব না, হে আমার রব, যতক্ষণ না তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার দরবার ত্যাগ করব না।" (শারহুল ইব্‌ন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৮২)

৩. মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়, পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতিকাফ শুদ্ধ। জুমার জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভাঙ্গবে না, যদিও জুমআর সালাতে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদ থেকে বের হোক না কেন।

৪. যার ওপর জামাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব নয়, সে এমন মসজিদে ইতিকাফ করতে পারবে, যেখানে জামায়াত হয় না, যেমন পরিত্যক্ত মসজিদ, বাজারের মসজিদ ও কৃষি জমির মসজিদ ইত্যাদি।

(দেখুন: শারহুল মুমতি: (৬/৫০৯)

৫. নবী করীম ﷺ রমযানের শেষদশক ইতিকাফ করতেন, অনুরূপ তার স্ত্রীগণ ইতিকাফ করতেন। ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য লাইলাতুল কদর তালাশ করা।

৬. ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমন বৈধ নয়, ইতিকাফ অবস্থায় স্ত্রীগমনের ফলে ইতিকাফ নষ্ট হবে, তবে তার ওপর কাফফারা বা কাযা ওয়াজিব হবে না। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, "ইতিকাফকারী সহবাস করলে তার ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে, পুনরায় সে ইতিকাফ আরম্ভ করবে।" (ইবন আবি শায়বাহ-২/৩৩৮, আলবানি ঃ ইরওয়াউলি গালিলে হাদীসটি সহীহ বলেছেন, তিনি

বলেছেন: হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। ইরওয়াউল গালিল-৪/১৪৮)

৭. ইতিকাফকারী ভুলক্রমে সহবাস করলে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না, যেমন ভঙ্গ হবে না তার সিয়াম।

শিক্ষা-৫১
ইতিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত :

اِنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِىَّ ﷺ وَهِىَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِىْ حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ.

"তিনি ঋতুস্রাবের সময় নবী ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন, যখন তিনি মসজিদে ইতিকাফ করতেন, আর আয়েশা ঘর থেকে তার মাথা গ্রহণ করতেন।"

(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে–

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانَ -

"তিনি মানুষিক প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।"

আবু দাউদের এক বর্ণনায় আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ مُعْتَكِفًا فِى الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِىْ رَأْسَهُ مِنْ خِلَلِ الْحُجْرَةِ فَاَغْسِلُ رَأْسَهُ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ইতিকাফ করতেন, তিনি হুজরার ফাঁক দিয়ে আমার কাছে তাঁর মাথা দিতেন, আমি তা ধুয়ে দিতাম।" অপর বর্ণনায় আছে : "আমি ঋতুবতী অবস্থায় তাঁর মাথা চিরুনি করতাম।" (দেখুন : মালেক-১/৬০, বুখারী-১৯৪১, মুসলিম-২৯৭, আবু দাউদ-২৬৬৯, সর্বশেষ বর্ণনা বুখারী-১৯২৪ ও মুসলিম-১/৩১ এর ভূমিকায় রয়েছে।)

আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ الَّتِيْ لَابُدَّ مِنْهَا .

"যখন তিনি ইতিকাফ করতেন, প্রাকৃতিক জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।" (দেখুন : মূল হাদীস বুখারী-১৯৪১ ও মুসলিমে-২৯৭, রয়েছে, তবে এ বর্ণনায় নাসায়ি ফিল কুবরা থেকে নেয়া-৩৩৬৯)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِنِّيْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيْضُ فِيْهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةً .

"আমি ঘরে প্রবেশ করতাম, সেখানে রোগী থাকত, কিন্তু চলন্ত অবস্থায় ব্যতীত তার সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করতাম না।" (মুসলিম-২৯৭)

আয়েশা (রা) বলেন: "ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযায় হাজির না হওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ বা তার সাথে সহবাস না করা, খুব জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত বের না হওয়া, রোযা ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়, অনুরূপ জামে মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়।" (আবু দাউদ-২৪৭৩, দারা কুতনি-২/২০১, তিনি বলেছেন এখানে ইমাম জুহরি (র)-এর কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বায়হাকি ফিস সুনান-৪/৩২১, তিনি বলেছেন সেটা উরওয়া (র)-এর বাণী। দেখুন; ফাতহুল বারি-৪/২৭৩, আত-তামহিদ-৮/৩২০)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৬টি

১. ঋতুবতী নারী পাক, তার ঋতুর স্থান ব্যতীত। (আত-তামহিদ-৮/৩২৪, তিনি এ ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন-২২/১৩৭, অনুরূপ ইজমা নকল করেছেন ইমাম নববী শরহে মুসলিমে-১/১৩৪, আরো দেখুন: শাহরু ইবনু বাত্তাল-৪/১৬৪) অনুরূপ যার ওপর গোসল ফরয সেও পাক। (দেখুন: শাহরু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৭)

২. ইতিকাফকারী শরীরের কিছু অংশ মসজিদ থেকে বের করলে বাইরে গণ্য হবে না, ইতিকাফ নষ্ট হবে না, যেমন মসজিদের জানালা অথবা দরজা থেকে যদি কিছু নেয়া অথবা গ্রহণ করার ইচ্ছা করে, তাহলে এতে সমস্যা নেই। (শারহুন নববী-৩/২০৮, আউনুল মাবুদ-৭/১০২)

৩. ইতিকাফকারীর মাথা ধৌত করা, চুল আঁচড়ানো, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথা ন্যাড়া করা ও সৌন্দর্য গ্রহণ করা বৈধ। (আউনুল মাবুদ-৭/১০২)

৪. নবী ﷺ-এর চুল খুব ঘন ছিল।

৫. যার চুল খুব ঘন, তার উচিত চুল পরিষ্কার রাখা, চিরুনি করা ও চুলের যত্ন নেয়া। পোশাক-আশাক ও শরীরের পবিত্রতা ত্যাগ করা সুন্নাত কিংবা শরিয়ত নয়। (আল-ইস্তেযকার-১/৩৩০, শারহু ইবনুল মুলাক্কিন-৫/৪৩৮)

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল চিরুনি করা থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের শরীরের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার খাদ্য, তেল ইত্যাদি গ্রহণ করা বৈধ। (শারহু ইবনু বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৬৫)

৭. ইতিকাফকারীর স্ত্রীর দিকে তাকানো এবং স্ত্রীর কাম স্পৃহা ব্যতীত স্বামীর শরীরের কিছু অংশ স্পর্শ করা বৈধ। (শারহুন নববী-১/১৩৪)

৮. স্ত্রীর জন্য স্বামীর খিদমত করা বৈধ, যেমন তার মাথা ধৌত করা, চুল আঁচড়ে দেয়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি। (শারহুন নববী-৩/২০৮)

৯. মানুষিক প্রয়োজন ব্যতীত ইতিকাফকারীর মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ নয়, যেমন পেশাব-পায়খানা, অথবা পানাহার, যদি তা মসজিদে পৌঁছে দেয়ার কেউ না থাকে, অনুরূপ প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বস্তু, যা মসজিদে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তার জন্য বের হলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না।" (আত-তামহিদ-৮/৩২৭, তারহুত তাসরিব-৪/১৬৯, আল-ফুরু-৩/১৩৪, আল-মুগনি-৩/৬৮)

১০. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ না করার কসম করেছে, সে যদি ঘরে মাথা প্রবেশ করে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (আবু দাউদের টীকায় মাআলেমুস সুনান-২/৮৩৪, শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৬৬, শারহু ইবন মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৭, আউনুল মাবুদ-৭/১০২)

১১. ইতিকাফকারী জরুরি প্রয়োজনে বের হলে দ্রুত হাঁটা জরুরি নয়, বরং অভ্যাস অনুযায়ী হাঁটা, তবে প্রয়োজন শেষে দ্রুত ফিরে আসা ওয়াজিব। (আল-মুগনি-৩/৬৯)

১২. ইতিকাফকারী রোগী দেখা অথবা জানাযায় হাজির হবে না, এটা জমহুর আলেমদের অভিমত। (শারহু ইবন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৬৬)

তবে সে চলন্ত অবস্থায় রোগী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারবে, কিন্তু থামবে না। (শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৯))

১৩. ইতিকাফকারী যদি জরুরি প্রয়োজনে বের হয়, যেমন পিতার মৃত্যু অথবা সন্তানের মৃত্যু, তাহলে প্রয়োজন শেষে নতুন করে ইতিকাফ করবে, যদি সে বিনা শর্তে ইতিকাফ করে। (শারহু ইবনু বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/১৬৬)

১৪. হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, নারী তার স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করবে, স্বামীর বাড়িতে যদিও কোনো প্রয়োজন না থাকে, অথবা কোনো শরয়ী কারণে সে বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে, যেমন সফর ও ইতিকাফ। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হবে না।
(শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৪০)

১৫. ইতিকাফকারী প্রয়োজন ব্যতীত ইতিকাফের স্থান থেকে বের হলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (আল-মুগনি-৩/৭০)

১৬. ইতিকাফের জন্য রোযা ও জামে মসজিদ শর্ত কি-না এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী ইতিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়, কারণ নবী ﷺ শাওয়ালে ইতিকাফ করেছেন। পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতিকাফ বৈধ, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাত হয়, কিন্তু জুমা হয় না। ইতিকাফকারী জুমার সালাতের জন্য জামে মসজিদে যেতে পারবে, এ জন্য তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না, তবে উত্তম জামে মসজিদে ইতিকাফ করা। (ফাতাওয়া লাজনায়ে দায়েমা, ফাতাওয়া নং-৬৭১৮)

শিক্ষা-৫২
ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাত

সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিকাফে ছিলেন, আমি রাতে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসি। আমি তাঁর সাথে কথা বলি, অতঃপর রওয়ানা দেই ও ঘুরে দাঁড়াই, তিনি আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তার ঘর ছিল উসামা ইবন যায়েদের বাড়িতে। ইত্যবসরে দু'জন আনসার অতিক্রম করল, তারা নবী ﷺ-কে দেখে দ্রুত চলল, নবী ﷺ তাদের বললেন : থাম, এ হচ্ছে সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই। তারা আশ্চর্য হলো: সুবহানাল্লাহ হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় বিচরণ করে, আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে পারে।" (বুখারী-৩১০৭, মুসলিম-২১৭৫, দ্বিতীয় বর্ণনা বুখারী-২৯৩৪ ও মুসলিমের-২১৭৫)

আলী ইবনে হাসান (রা) বলেন : নবী ﷺ মসজিদে ছিলেন, তাঁর নিকট তাঁর স্ত্রীগণ উপবিষ্ট ছিল, অতঃপর তারা চলে গেল। তিনি সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াইকে বললেন : দ্রুত কর না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের সাথে চলি। সাফিয়্যার ঘর ছিল উসামার বাড়িতে। নবী ﷺ তার সাথে বের হলেন, তার সাথে দু'জন আনসারের সাক্ষাত হলো, তারা নবীকে দেখল, অতঃপর দ্রুত চলল। তিনি তাদের দু'জনকে বললেন : এ হচ্ছে সাফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই। তারা বলল : সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় বিচরণ করে, আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের অন্তরে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। (বুখারী-২০৩৮, মুসলিম-২১৭৫)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৫টি

১. এ হাদীসে উম্মতের ওপর নবী ﷺ-এর দয়া, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা ও তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দেয়ার প্রমাণ মিলে, যাতে রয়েছে তাদের আত্মা ও অন্তরের পরিশুদ্ধতা। কারণ নবী ﷺ আশঙ্কা করেছেন যে, শয়তান তাদের অন্তরে তাঁর সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, আর নবীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা কুফর, তাই তিনি তাদের সতর্ক করলেন।

(শারহুন নববী-১৪/৫৬)

ইমাম শাফে'ঈ (র) বলেন : "তিনি তাদেরকে এ জন্য বলেছেন, কারণ তিনি তাদের ওপর কুফরির আশঙ্কা করেছেন, যদি তারা তাঁর সম্পর্কে কুধারণা করত, তাই তাদের অন্তরে শয়তানের কুমন্ত্রণা সঞ্চার করার পূর্বে, যা তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল, তিনি দ্রুত জানিয়ে দিয়ে তাদের হিতকামনা করলেন।

২. ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাত করা বৈধ, মসজিদে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে সাক্ষাত ও কথা বলতে পারবে রাত-দিন যে কোনো সময়, এতে ইতিকাফের ক্ষতি হবে না। তবে অতিরিক্ত গমনাগমন ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কখনো ইতিকাফ বিনষ্টকারী কর্মে লিপ্ত করে, তাই তা থেকে বিরত থাকা জরুরি।

৩. মুসলিমদের উচিত অপবাদ ও সন্দেহের স্থান থেকে দূরে থাকা, যখন খারাপ ধারণার আশঙ্কা হয় স্পষ্ট করে দিবে যেন তা দূরীভূত হয়ে যায়। বিশেষ করে অনুসরণীয় আলেম ও নেককার লোকদের বিষয়, তাদের এমন কাজ করা বৈধ নয় যা মানুষের অন্তরে সন্দেহের জন্ম দেয়। অনুরূপ

বিচারকের বিচার ব্যাখ্যা করে দেয়া উচিত, যদি বিবাদীর নিকট তার কারণ অস্পষ্ট থাকে ও পক্ষপাত তুষ্টের ধারণা জন্মায়।

৪. শয়তান ও তার ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব, কারণ সে বনী আদমের রক্তের শিরায় বিচরণ করে।

৫. আশ্চর্য হয়ে সুবহানাল্লাহ বলা বৈধ। যেমন আয়েশা (রা) আনহার ওপর অপবাদের ঘটনায় আছে :

سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -

"তুমি অতি পবিত্র মহান, এটা এক গুরুতর অপবাদ।"

(সূরা নূর : আয়াত-১৬)

৬. ইতিকাফকারীর বৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েয। যেমন সাক্ষাতকারীকে উৎসাহ দেয়া, তার সাথে দাঁড়ানো ও তার সাথে কথা বলা, তবে অতিরিক্ত না করা।

৭. ইতিকাফকারীর পাঠ দান করা, শিক্ষণীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা ও দ্বীনি বিষয়ে লেখা বৈধ, তবে বেশি পরিমাণে নয়, কারণ ইতিকাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া।

৮. ইতিকাফকারী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারবে, যেমন খাবার ইত্যাদি।

৯. স্ত্রীর সাথে ইতিকাফকারী নির্জনে মিলিত হতে পারবে, তবে স্ত্রীগমন থেকে সতর্ক থাকবে।

১০. নিরাপত্তা থাকলে নারীদের রাতে বের হওয়া বৈধ।

১১. যার সাথে তার স্ত্রী রয়েছে, তাকে সালাম দেয়া বৈধ, কারণ কতক বর্ণনায় এসেছে তারা উভয়ে নবী ﷺ-কে সালম করেছিল, তিনি তাদের বিরত করেননি।

১২. যদি ব্যক্তির সাথে স্ত্রী বা মাহরাম থাকে, সে যে কাউকে সম্বোধন করতে পারবে, বিশেষ করে যদি তার প্রয়োজন হয়, কোন হুকুম বর্ণনা করা অথবা কোনো অনিষ্ট দূর করা ইত্যাদি, এটা রুচি বিরোধী নয়।

১৩. কথা বা কোনো মাধ্যমে ইতিকাফকারী নিজের ওপর খারাপ ধারণা দূর করতে পারবে, অনুরূপ সে হাতের দ্বারা কষ্ট দূর করতে পারবে, যদি কেউ

তার ওপর সীমালঙ্ঘন করতে চায়। ইতিকাফকারী মুসল্লির চেয়ে বেশি নয়, মুসল্লির জন্য বৈধ তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাঁধা দেয়া, অনুরূপ, ইতিকাফকারী সে ব্যক্তিকে বারণ করতে পারবে, যে তার ওপর সীমালঙ্ঘন করে, এ জন্য তার ইতিকাফ নষ্ট হবে না।

১৪. একান্ত প্রয়োজন না হলে ধীরে কাজ করা ও দ্রুততা পরিহার করা, কারণ নবী করীম ﷺ তাদেরকে বলেছেন : عَلَى رِسْلِكُمَا "তোমরা ধীরে চল।"

১৫. নবী করীম ﷺ স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতেন। কেননা তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর ইতিকাফে তাকে দেখতে এসেছেন, যখন তারা যাওয়ার ইচ্ছা করেন, তিনি সাফিয়্যাহকে বললেন : তাড়াহুড়ো করো না। সাফিয়্যাকে থাকার নির্দেশের কারণ সম্ভবত সে অন্যদের চেয়ে দেরীতে এসেছে, তাই তাকে দেরীতে যেতে বলেছেন, যেন তার নিকট অবস্থানের সময় সবার সমান হয়, অথবা তার বাড়ি অন্য স্ত্রীদের বাড়ি থেকে দূরে ছিল, তাই নবী ﷺ তার ব্যাপারে আশঙ্কা করেছেন। মুসলিমদের উচিত অনুরূপভাবে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ও তাদের প্রতি যত্নশীল থাকা।

শিক্ষা-৫৩

যে ইতিকাফ করার মানত করেছে

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহেলি যুগে মানত করেছি, একরাত মসজিদে হারামে ইতিকাফ করব। নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর, অতঃপর তিনি একরাত ইতিকাফ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছেন "জিইরানা" নামক স্থানে, তায়েফ থেকে ফিরে। তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহেলি যুগে মানত করেছি মসজিদে হারামে একরাত ইতিকাফ করব, আপনার সিদ্ধান্ত কি? তিনি বললেন : যাও, একদিন ইতিকাফ কর। (বুখারী-১৯৩৭, মুসলিম-১৬৫৬)

অপর বর্ণনায় রয়েছে, "আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন : তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর।" (বায্যার-১৪০, বায়হাকি-৯১০/৭৬৩)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৯টি

১. জাহেলি যুগে ইতিকাফ ও মানত প্রচলিত ছিল।

২. ইসলাম পূর্বের মানত ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্ণ করা বৈধ, কেউ তা পূর্ণ করা ওয়াজিব বলেছেন।

৩. ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জাহেলি যুগের মানত থেকে দায় মুক্ত হওয়ার আগ্রহ, এটা তার তাকওয়া ও পরহেযগারি প্রমাণ করে।

৪. ওয়াদা পূর্ণ করার গুরুত্ব, কখনো তার খেলাফ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরকে তা পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তা জাহেলি যুগের ওয়াদা ছিল। (শরহু ইবন বাত্তাল-৪/১৬৮)

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একদিন অথবা একরাত ইতিকাফ করা বৈধ।

৬. এ হাদীস তাদের দলিল, যারা বলে রোযা ব্যতীত ইতিকাফ বৈধ, কারণ রাত সওমের স্থান নয়। (ইতিকাফে যারা রোযা শর্ত বলেন তাদের মধ্যে ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, মালেক, শাবি, আওযায়ি, সাওরি, আহনাফ এবং এটা আহমদের এক ফতওয়া। ইমাম কুরতুবি ও ইবনুল কায়্যিম এ অভিমতকে শক্তিশালী করেছেন। আর যারা বলেছেন ইতিকাফে সওমের শর্ত করা না হলে, রোযা জরুরি নয়, তাদের মধ্যে আলে, ইবনে মাসউদ, হাসান বসরি, আতা ইবনে আবি রাবাহ, ওমর ইবনু আব্দুল আযিয ও ইবনে উসাইমিন রয়েছেন। লাজনায়ে দায়েমার ফতওয়া এর উপর। দেখুন : আল-ইস্তেযকার-৯১০-২৯১-২৯৩, তাহযিবুস সুনান-৭/১০৫-১০৯, শারহুন নববী-১১/১২৪-১২৬, আল-মুফহিম-৪/২৪১, শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৪৬, তুহফাতুল আহওয়াযি-১৫/১১৯, আল-ইফহাম ফি শারহি বুলুগুল মারাম-১/৩৭২, শারহুল মুমতি-৬/৫০৬-৫০৭, ফতওয়া লাজনায়ে দায়েমা-৬৭১৮)

৭. যারা বলেছেন রোযা ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ, আলেমদের দু'ধরনের বক্তব্য থেকে তাদের কথা সঠিক। এ কারণে রোগী ইতিকাফ করতে পারবে, যে রোগের জন্য রোযা ভঙ্গ করেছে। (দেখুন : শারহুল মুমতি-৬/৫০৭)

৮. অজানা বিষয় আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করা, যেমন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তার মানত সম্পর্কে রাসূলূল্লাহ ﷺকে জিজ্ঞাসা করেছেন। অনুরূপ যাকে প্রশ্ন করা হয়, তার ওয়াজিব বলা, গোপন না করা।

(শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৪৬)

৯. কেউ যদি তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ইতিকাফের মানত করে, আর সেখানে পৌঁছতে দীর্ঘ সফরের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে মানত পূর্ণ জায়েয নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন :"তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাবে না। তবে সফরের প্রয়োজন না হলে জায়েয আছে।

(ফতওয়া সাদিয়া-২৩১-২৩২)

শিক্ষা-৫৪
নারীদের ইতিকাফ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার কথা বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর কাছে অনুমতি চান। তিনি তাকে অুনমতি প্রদান করেন। হাফসা আয়েশার কাছে তার জন্য অনুমতি নেয়ার অনুরোধ করেন, তিনি তাই করেন। এ দেখে যয়নব বিনতে জাহাশ তাঁবু তৈরির নির্দেশ দেন, তার জন্য তাঁবু তৈরি করা হলো। আয়েশা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে তাঁর তাঁবুতে যান, তিনি সেখানে অনেক তাঁবু দেখতে পান। জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী? তারা বলল : আয়েশা, হাফসা ও যয়নবের তাঁবু। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এর দ্বারাই কি তোমরা নেকির আশা করেছ? আমি ইতিকাফই করব না।" তিনি ফিরে যান। অতঃপর রমযান শেষে শাওয়ালের দশ দিন ইতিকাফ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইতিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, ফজর সালাত আদায় করে ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। একদা তিনি মসজিদে তার জন্য তাঁবু টানাতে আদেশ করলেন, তাঁবু টানানো হলো, তিনি রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করার ইচ্ছা করেছিলেন। যয়নব তার জন্য তাঁবু টানাতে নির্দেশ করলেন, টানানো হলো, নবী ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁবু টানাতে নির্দেশ করলেন, তাদের জন্য তাঁবু টানানো হলো। তিনি যখন ফজর সালাত আদায় করলেন, দেখলেন অনেকগুলো তাঁবু। তিনি বললেন : তোমরা কি নেকির আশা করেছ? তিনি তার তাঁবু খুলে ফেলার নির্দেশ দেন ও রমযানের ইতিকাফ ত্যাগ করেন, অতঃপর শাওয়ালের প্রথম দশে ইতিকাফ করেন।

(বুখারী-১৯৪০, মুসলিম-১১৭২)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৭টি

১. মহিলাদের মসজিদে ইতিকাফ করা বৈধ, যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। (শারহুন নববী-৮/৭০, আল-মুফহিম-৩/২৪৮, শারহু ইব্নুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪২৯)

ইবনু আব্দিল বার আসরাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি শুনেছি আহমদ ইবন হাম্বলকে ইতিকাফকারী নারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে? তিনি বলেন : হ্যাঁ, নারীরা ইতিকাফ করেছে।" (দেখুন: আত-তামহিদ-১/১৯৫)

২. নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করবে না, এতে কারো মতানৈক্য নেই। (ইবনুল মুলাক্কিন শারহুল উমদাহ গ্রন্থে এ ইজমা নকল করেছেন-৫/৪২৯)

যদি সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ইতিকাফ করে, তাহলে স্বামীর অধিকার রয়েছে তার ইতিকাফ ভঙ্গ করানো। ইতিকাফের অনুমতি দেয়ার পর স্বামী যদি কোনো কারণে তার ইতিকাফ ভাঙ্গতে চায়, তাহলে তার অধিকার রয়েছে। (শারহুন নববী-৮/৭০, আল-মুফহিম-৩/২৪৫, ফাতহুল বারি-৪/২৭৭)

৩. ইতিকাফ আরম্ভ করে প্রয়োজন হলে তা ভঙ্গ করা বৈধ। ইবন বায (রহ.) বলেছেন : "বিশুদ্ধ মতে ইতিকাফ আরম্ভ করলে ওয়াজিব হয় না এবং জুমার কারণে তা ভঙ্গ হয় না।")

৪. মসজিদ ব্যতীত ইতিকাফ শুদ্ধ নয়, যদি অন্য কোথাও ইতিকাফ বৈধ হতো, তাহলে নারীর জন্য বৈধ হতো তার সালাতের জায়গায় ইতিকাফ করা। (শারহুন নববী-৮/৬৮, ফাতহুল বারি-৪/২৭৭)

৫. স্বামীর জন্য নিজ স্ত্রী ও পরিবারকে আদব শিক্ষা দেয়া, তাদের সংশোধন করা জায়েয। যেমন নবী ﷺ স্ত্রীদের ইতিকাফের অনুমতি দেন, অতঃপর তাদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঈর্ষার আশংকায় তাদেরকে তা থেকে বারণ করেন। (শারহুন নববী-৮/৬৯, আল-মুফহিম-৩/২৪৫ মিনহাতুল বারি-৪/৪৬৪, হামিয়াতুস সিনদি আলান নাসায়ি-২/৪৫)

৬. নফল ছুটে গেলে তা কাযা করা বৈধ। (মিনহাতুল বারি-৪/২৭৭)

৭. অতিরিক্ত ঈর্ষা খারাপ, কারণ তা হিংসার ফল, যা নিন্দনীয়।

৮. ভালো কাজ ত্যাগ করা বৈধ, যদি তাতে কল্যাণ থাকে। (শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৮২, ফাতহুল বারি-৪/২৭৭)

৯. শুধু নিয়তের কারণে ইতিকাফ ওয়াজিব হয় না। (ইমাম নববী শারহে মুসলিমে এ ব্যাপারে ঐক্যমত নকল করেছেন-৮/৬৮)

১০. ইতিকাফকারী ইতিকাফের জন্য মসজিদের একটা অংশ নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে, যদি তাতে মুসল্লিদের সমস্যা না হয়। জায়গাটি নির্ধারণ করা চাই মসজিদের খালি অংশে বা শেষ প্রান্তে, যেন অন্যদের কষ্ট না হয়, এবং তার নির্জনতা ও একাকীত্ব অর্জন হয়। (শারহুন নববী-৮/৬৯)

১০. স্ত্রীদের সাথে নবী ﷺ-এর সুন্দর আখলাক ও তাদের সঙ্গে চমৎকার হৃদ্যতা। যেমন তাদেরকে তিনি ইতিকাফ থেকে বারণ করে নিজেও তা ত্যাগ করেন, অথচ তিনি নিজে ইতিকাফ করতে পারতেন, কিন্তু আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও তাদের আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্য তা করেন নি। (এটা ইমাম কুরতুবি উল্লেখ করেছেন, অতঃপর তিনি বলেছেন : "অথবা তার ইতিকাফে বহাল থাকলে এ আশঙ্কার জন্ম হতো যে, ইতিকাফ শুধু তার জন্য খাস, নারীদের জন্য নয়"। আল-মুফহিম-৩/২৪৬, ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেছেন : "তিনি তাদের অন্তরকে খুশি করার জন্য ইতিকাফ পিছিয়ে দেন, যেন এমন না হয় তিনি ইতিকাফ করবেন, আর তারা ইতিকাফ করবে না"। শারহুল বুখারী-৪/১৬৯, শায়খ যাকারিয়া আনসারি উল্লেখ করেছেন, অথবা মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যাবে আশঙ্কায়। দেখুন: মিনহাতুল বারি-৪/৪৪)

অনুরূপ প্রত্যেক মুসলিমের উচিত স্ত্রীদের আদব শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করা, যা প্রতিশোধ ও জেদ দমনের পর্যায় পড়ে।

১২. যদি ইতিকাফকারী নারীর ঋতুস্রাব হয়, তাহলে ঋতুস্রাব তার ইতিকাফ ভেঙ্গে দিবে, সে মসজিদ ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্র হয়ে পূর্বের ইতিকাফ শুরু করবে। (এটা জমহুরের অভিমত, যেমন যুহরি, রাবিয়াহ, মালেক, আওযায়ি, আবু হানীফা ও শাফি, ইবন বাত্তাল তাদের থেকে এ বাণী নকল করেছেন-৪/১৭৪, ইমাম আহমদ অনুরূপ বলেছেন-৪/৪৮৯)

১৩. যদি কেউ নফল ইবাদতের নিয়ত করে, কিন্তু এখনো তা শুরু করেনি, তাহলে সে তা একেবারে ত্যাগ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে আদায় করা বৈধ। (শারহু ইবন বাত্তাল-৪/১৮৩)

১৪. যার মধ্যে কোনো ইবাদতের রিয়া নিশ্চিত জানা যায়, তাকে সে ইবাদত' থেকে নিষেধ করা বৈধ। কারণ নবী ﷺ বলেছেন : "তোমরা কি নেকি ইচ্ছা করেছ।" অর্থাৎ তোমরা নবী ﷺ-এর নৈকট্য ও তাকে পাওয়ার আশা করেছ। এ জন্য তাদের ইতিকাফ নিষেধ করেন ও নিজের ইতিকাফ পিছিয়ে দেন। (শারহু ইবন বাত্তাল : (৪/১৮৩)

১৫. ইতিকাফে স্ত্রী, লোকজন ও অন্যদের থেকে নির্জনতা অবলম্বন করা মুস্তাহাব, তবে যখন প্রয়োজন হয় তা ব্যতীত যেমন সালাত, খানা ইত্যাদি। (শারহু ইবনুল মুলাক্কিন আলাল উমদাহ-৫/৪৩৫)

১৬. রমযানে ইতিকাফ করা সুন্নাত, এটা নবীﷺএর আদর্শ, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় গায়রে রমযানে ইতিকাফ করা বৈধ, যেহেতু নবীﷺশাওয়ালে ইতিকাফ করেছেন। (দেখুন: ফিকহুল ইবাদাত লি ইবন উসাইমিন-২০৮)

১৭. মসজিদের ভেতরের কক্ষে ইতিকাফ করা বৈধ, যার দরজা মসজিদের দিকে খোলা, তার হুকুম মসজিদের হুকুম, আর যদি মসজিদের বাইরে হয়, তাহলে সেটা মসজিদের অংশ নয়, যদিও তার দরজা মসজিদের দিকে। (ফতওয়াল লাজনাহ-৬৭১৮)

শিক্ষা-৫৫

চন্দ্র মাসের অবস্থা

ইবন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীমﷺবলেছেন :

اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا، يَعْنِيْ : ثَلاَثِيْنَ، ثُمَّ قَالَ : وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ : تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ، يَقُوْلُ : مَرَّةً ثَلاَثِيْنَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ـ

“মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। অর্থাৎ ত্রিশ দিন। অতঃপর তিনি বলেন : এরূপ, এরূপ ও এরূপ। অর্থাৎ ঊনত্রিশ দিন। তিনি বলেন : কখনো ত্রিশ দিন, কখনো ঊনত্রিশ দিন।” (বুখারি ও মুসলিম)

বুখারির অপর বর্ণনায় আছে, নবী করীমﷺবলেছেন :

اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا، يَعْنِيْ : مَرَّةً تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ ـ

“আমরা উম্মী উম্মত, লেখা ও হিসাব জানি না, মাস হচ্ছে এরূপ ও এরূপ। অর্থাৎ কখনো ঊনত্রিশ ও কখনো ত্রিশ।”

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে :

اَلشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا ، وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ اَصَابِعِهُمَا ، وَنَقَصَ فِى الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ اِبْهَامُ الْيُمْنَى اَوِ الْيُسْرَى ۔

"মাস এরূপ, এরূপ ও এরূপ। দু'বার উভয় হাতের পুরো আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন, তৃতীয় বার ডান বা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কম দেখালেন।"

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে : ইবন ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন :

اَللَّيْلَةُ النِّصْفُ . فَقَالَ لَهُ : مَا يُدْرِيكَ اَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ، وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ، وَهٰكَذَا فِى الثَّالِثَةِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهِ كُلِّهَا ، وَحَبَسَ اَوْ خَنَسَ اِبْهَامَهُ ۔

"আজকের রাত মাসের অর্ধেক। তিনি তাকে বললেন : কিভাবে বললে আজকের রাতটি মাসের অর্ধেক? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : মাস এরূপ ও এরূপ, তিনি দু'বার হাতের দশ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন, তৃতীয়বার এভাবে ইশারা করেন, তিনি সব আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন, শুধু তার বৃদ্ধাঙ্গুলি বদ্ধ রাখেন।" (বুখারী-৪৯৯৬, মুসলিম-১০৮০, দ্বিতীয় বর্ণনা বুখারীর-১৮১৪, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণনা মুসলিমের-১০৮০)

সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রাসূলুল্লাহ ﷺ একহাত দ্বারা অপর হাতের ওপর আঘাত করলেন, অতঃপর বলেন : "মাস এরূপ ও এরূপ, অতঃপর তৃতীয়বার এক আঙ্গুল কম দেখান।"

(মুসলিম-১০৮৬, নাসায়ি-৪/১৩৮)

ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا ۔

"জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে বলেন, মাস ঊনত্রিশ দিন।" (নাসায়ি-৪/১৩৮, আলবানি সহীহ নাসায়িতে হাদীসটি সহীহ বলেছেন)

ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَمَّا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ اَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِيْنَ ـ

"নবী করীম ﷺ-এর সাথে আমরা অধিক সময় ঊনত্রিশ দিন রোযা পালন করেছি, ত্রিশ দিনের তুলনায়।" (আবু দাউদ-৩৩২২, তিরমিযী-৬৮৯, আহমদ-১/৩৯৭, বায়হাকি-৪/২৫০, আলবানি সহীহ আবু দাউদে হাদীসটি সহীহ বলেছেন।)

ইমাম তিরমিযী বলেন: এ অধ্যায়ে ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা, আয়েশা, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আনাস, জাবের, উম্মে সালামা ও আবু বাকরা থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : "মাস হয় ঊনত্রিশ দিনে।" (জামে তিরমিযী-৩/৭৩)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১২টি

১. চন্দ্র মাস, শরিয়তের বিধান যার ওপর নির্ভরশীল, তা কখনো ত্রিশ, আবার কখনো ঊনত্রিশ দিনের হয়।

২. মাস যখন অসম্পূর্ণ হয়, সওয়াব পরিপূর্ণ হয়। ইবন মাসউদ (রা) সংবাদ দিয়েছেন : তারা নবী ﷺ-এর সাথে অধিক সময় ঊনত্রিশ রোযা পালন করেছেন, ত্রিশ দিনের তুলনায়।

৩. এ হাদীস জ্যোতিষ্ক ও গণকদের প্রত্যাখ্যান করে। এ হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, শরয়ি বিধান রোযা, ঈদুল ফিতর ও হজ্ব ইত্যাদি চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল, গণনার ওপর নয়।

৪. ইশারা ব্যবহার করা বৈধ, বরং এটা শিক্ষা ও ব্যাখ্যার একটি মাধ্যম। (ফাতহুল বারি-৪/১২৭)

৫. দুই মাস, তিন মাস ও চার মাস পর্যায়ক্রমে ঊনত্রিশে মাস হতে পারে, তবে চার মাসের বেশি লাগাতার ঊনত্রিশ দিনে মাস হয় না। (শারহুন নববী আলাল মুসলিম-৭/১৯১)

৬. এ উম্মত উম্মী, কারণ এদের মধ্যে শিক্ষার হার কম, অনুরূপ তাদের নবী ছিলেন উম্মী, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ ـ

"তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে।" (সূরা জুমা-২)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন :

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

"আর তুমি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং তোমার নিজের হাতে তা লিখনি যে বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আনকাবুত-৪৮)

এ উম্মতের ওপর আল্লাহর মহান নিয়ামত যে, তিনি তাদেরকে এ মহান দ্বীন দান করেছেন। তারা অপর থেকে এ কিতাব গ্রহণ করেনি, বরং তারা রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেছে। (উমদাতুল কারি-১০/২৮৬)

৭. এ উম্মত নিজেদের ইবাদত ও ইবাদতের সময় নির্ধারণে শিক্ষা ও গণকদের মুখাপেক্ষী নয়, কারণ শরিয়ত তা ধার্য করেছে দেখার ওপর, যা সবার নিকট সমান। (তাফসির ইবন কাসির-৯১/১১৭)

৮. আমাদেরকে রোযা, সালাত ও অন্যান্য ইবাদত সম্পাদনে শিক্ষা ও গণকের মুখাপেক্ষী হতে বলা হয়নি, তার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং আমাদের ইবাদতের সম্পর্ক প্রকাশ্য নিদর্শনের সাথে, যেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। (শারহু ইবন বাত্তাল আলাল বুখারী-৪/৩১-৩২, আল-মুফহিম-৩/১৩৯, উমদাতুল কারি-১০/২৮৭)

৯. যে একমাস রোযা পালন করার মানত বা কসম করল, যেমন রজব বা শাবান, অতঃপর যখন রোযা আরম্ভ করল, মাস ঊনত্রিশে শেষ হলো, তাহলে সে মানত বা কসম পূর্ণ করল। (মাআলিমুস সুনান আলা হামিশি আবু দাউদ-২/৭৪০)

১০. কেউ যদি মানত করে অথবা কসম করে একমাস রোযা পালন করবে, কিন্তু সে নির্দিষ্ট করেনি, সে যদি ঊনত্রিশ দিন রোযা পালন করে, ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে, কারণ মাস সাধারণত এরূপ হয়। (আল-মুফহিম-৩/১৩৮, খাত্তাবি মাআলিমুস সুনানে-২/৭৪০, উল্লেখ করেছেন, তার ত্রিশ দিন পুরো করতে হবে, তবে আমার নিকট কুরতুবির অভিমত অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। তিনি কেন ত্রিশ বললেন সেটা আমার নিকট স্পষ্ট নয়, অথচ মাস হয় ঊনত্রিশ দিনে।)

১১. সন্দেহের দিন শাবানের মধ্যে গণ্য, তাকে রমযান গণ্য করা ঠিক নয়, কারণ নবী ﷺ চাঁদ দেখার সাথে রমযান সম্পৃক্ত করেছেন। (আল-মুফহিম-৩/১৪০)

১২. হাদীস থেকে বুঝা যায়, চাঁদের জায়গা নির্ধারণের জন্য আধুনিক যন্ত্র যেমন দূরবীন ইত্যাদির সাহায্য নেয়া দোষের নেই, চাঁদ দেখার সুবিধার্থে। এটা হাদীসে নিষিদ্ধ গণনার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে চোখে দেখা অধিক গ্রহণযোগ্য। (শায়খ ইবন বায (রহ.) কে দূরবীন দ্বারা দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন, এটা ব্যবহার করা দোষের নয়, কারণ এটাও দেখার অন্তর্ভুক্ত, গণনার অন্তর্ভুক্ত নয়। মাজমু ফাতাওয়া ও রাসায়েল-১৫/৬৯-৭০)

শিক্ষা-৫৬
সওয়াব পরিপূর্ণ যদিও মাস অসম্পূর্ণ হয়

আবু বকর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ : شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ .

"দু'টি মাস কম হয় না: রমযানের ঈদ ও যিলহজের মাস।" অপর বর্ণনায় আছে:

شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ .

"দুই ঈদের মাস কম হয় না: রমযান ও যিলহজ।" (বুখারী-১৮১৩, মুসলিম-১০৮৯)

এ হাদীসের অর্থ কেউ বলেছেন : এ দু'টি মাস : রমযান ও যিলহজ একবছর একসঙ্গে অসম্পূর্ণ হয় না। এক মাস অসম্পূর্ণ হলে অপর মাস পূর্ণ হয়। সাধারণত এমন হয়।

আবার কেউ বলেছেন : এ দু'মাসের সওয়াব কম হয় না, যদিও তার সংখ্যা কম হয়। এটা অধিক গ্রহণযোগ্য। (ইকমালুল মুয়াল্লিম লিল কাদি ইয়াদ-৪/২৪, আল-মুফহিম-৩/১৪৫-১৪৬)

শিক্ষা ও মাসায়েল ৭টি

১. রমযান ও যিলহজ্জ এ দু'মাসকে ইসলাম বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে কারণ এর সাথে রোযা ও হজ্ব সম্পৃক্ত। (ফাতহুল বারি-৪/১২৫)

২. ঈদুল ফিতরকে রমযান মাসের সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ, অথচ তা শাওয়ালের

প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে :

شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِيْدٌ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ.

"দু'টি মাস অসম্পূর্ণ হয় না, যার প্রত্যেকটিতে ঈদ রয়েছে : রমযান ও যিলহজ।" (আহমদ-৫/৪৭, আইনি উমদাতুল কারিতে এ হাদীস বিশুদ্ধ বলেছেন-১০/২৮৫)

৩. মাস আরম্ভের ক্ষেত্রে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তবে এতে কোনো সমস্যা নেই যদি লোকেরা বৈধভাবে চাঁদ দেখে অথবা চাঁদ দেখা অসম্ভব হলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করার আমল করে।

৪. রমযান ও যিলহজ মাসের ফযিলত ও বিধান বান্দাগণ অবশ্যই লাভ করবে, রমযান ত্রিশ দিন হোক অথবা ঊনত্রিশ দিনের, নবম দিন ওকুফে আরাফ হোক বা অন্যদিনে, যদি তারা যথাযথ চাঁদ দেখার দায়িত্ব পালন করে। (শারহুন নববী-৭/১৯৯, ফাতহুল বারি-৪/১২৬, উমদাতুল কারি-১০/২৮৫)

৫. এ হাদীসের শিক্ষা : এসব হাদীসে তার মনের অতৃপ্তি ও অন্তরের সন্দেহ দূর করা হয়েছে, যে উনত্রিশ দিন রোযা পালন করল অথবা ভুলে গায়রে আরাফার দিন ওকুফ করল, যেমন কেউ যিলহজ মাসের চাঁদ দেখার মিথ্যা সাক্ষী দিল, ফলে লোকেরা আট তারিখে ওকুফে আরাফা করল, এতে কোনো সমস্যা নেই, ইবাদাত বিশুদ্ধ ও সওয়াব পরিপূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। (ফাতহুল বারি-২/১২৬)

৬. এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আমলের সওয়াব সর্বদা কষ্টের ওপর নির্ভর করে না, বরং কখনো আল্লাহ অসম্পূর্ণ মাসকে পূর্ণ মাসের সাথে যুক্ত করে পরিপূর্ণ সওয়াব প্রদান করেন। (হাফেয ইবন হাজার ফাতহুল বারিতে-৪/১২৬, উল্লেখ করেছেন, কতক মালেকি আলেম এ হাদীস দ্বারা তার দলিল পেশ করেছেন)

৭. এ হাদীস তাদের দলিল, যারা বলে রমযানের জন্য এক নিয়ত যথেষ্ট, কারণ আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ মাসকে এক ইবাদত গণ্য করেছেন।

শিক্ষা-৫৭

রমযানে ওমরার ফযীলত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ হজ্ব থেকে এসে উম্মে সিনান আনসারিকে বলেন : তুমি কেন হজ্ব করনি? সে বলল : অমুকের পিতা, অর্থাৎ, তার স্বামীর কারণে। তার চাষাবাদের দুটি উট ছিল, একটি দ্বারা সে হজ্ব করেছে, অপরটি আমাদের জমি চাষ করেছে। নবী করীম ﷺ বললেন : নিশ্চয় রমযানের ওমরা আমার সাথে হজ্বের সমান।

(বুখারী-১৭৬৪, মুসলিম-১২৫৬)

অপর বর্ণনায় আছে নবী করীম ﷺ বলেছেন–

فَاِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيْ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ تَعْدِلُ حَجَّةً ۔

অর্থ : যখন রমযান আগমন করে ওমরা কর, কারণ তখনকার ওমরা হজ্বের সমান। (বুখারী-১৬৯০, মুসলিম-১২৫৬)

উম্মে মাকাল (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اِعْتَمِرِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَاِنَّمَا كَحَجَّةٍ ۔

অর্থ : রমযানে ওমরা কর, কারণ তা হজ্বের ন্যায়। (আবু দাউদ : ১৯৮৯, নাসায়ি ফিল কুবরা : ৪২২৬, তিরমিযী : ৯৩৯, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান, গরিব, ইবনে খুযাইমাহ : ৩০২৫, ও হাকেম: ১/৬৫৬, সহীহ বলেছেন, হাকেম বলেছেন হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্ত মোতাবেক।)

অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে জাবের, আনাস, আবু হুরায়রা ও ওয়াহাব ইবনে আনাস (রা) থেকে। (দেখুন : জামে তিরমিযী : ৩/২৭৬)

নবী করীম ﷺ-এর বাণী : 'রমযানের ওমরা হজ্বের সমান।' ইবনে বাত্তাল (রহ) বলেন "এর দ্বারা বুঝা যায় নবী করীম ﷺ তাকে যে হজ্বের কথা বলেছেন, তা নফল : ছিল, কারণ উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, ওমরা কখনো ফরয হজ্বের স্থলাভিষিক্ত হয় না। এখানে নবী করীম ﷺ-এর বাণী "হজ্বের বরাবর" দ্বারা উদ্দেশ্য সওয়াব ও ফযীলত যা মানুষের কিয়াস ও ধারণার উর্ধ্বে, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহ দান করেন।

(শারহ ইবনে বাত্তাল আলাল বুখারী: ৪/৪২৮, দেখুন : মিনহাতুল বারি : ৪/২৩৩)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. বান্দার ওপর আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি অল্প আমলের বিনিময়ে অধিক সওয়াব দান করেন। এ জন্য আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করি।

২. নবী করীম ﷺ উম্মতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের খবর নিতেন। আল্লাহ যাকে তার বান্দাদের দায়িত্ব দান করেন, তার উচিত অধীনদের সাথে দয়ার আচরণ করা, তাদের হিতকামনা করা ও খবরাখবর নেয়া এবং তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার স্বার্থে কাজ করা।

৩. ফরয হজ্বের মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় রমযানের ওমরা। অবশ্য সওয়াবের দিক থেকে সমান, কিন্তু এ কারণে ফরয আদায় হবে না। এ ব্যাপারে সবাই একমত। (ফাতহুল বারি : ৩/৬০৪, তুহফাতুল আহওয়াযি : ৪/৭)

৪. সময়ের মর্যাদার কারণে আমলের সওয়াব বেড়ে যায়, যেমন বেড়ে যায় একাগ্রতা ও ইখলাসের কারণে।

(দেখুন : ফাতহুল বারি: ৩/৬০৪, আউনুল মাবুদ: ৫/৩২৩, ফায়যুল কাদির : ৪/৩৬১)

৫. এসব হাদীসের উদাহরণ, যেমন এসেছে সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান, অর্থাৎ, সওয়াবের বিবেচনায়, কিন্তু সূরা ইখলাস তিনবার তিলাওয়াত করা পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার সমান নয়।

৬. রমযানের মর্যাদার কারণে ওমরা হজ্বের সমমর্যাদা লাভ করে, কারণ রমযান মাসে ওমরাকারী ওমরার ফযীলত ও রমযানের ফযীলত লাভ করে। এ বরকতপূর্ণ সময় ও মক্কার পবিত্রতার কারণে ওমরা হজ্বের সমান, যে হজ্ব যিলহজ্ব মাসের বরকতপূর্ণ সময় ও মক্কার পবিত্র স্থানে আদায় করা হয়।

(মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৬/২৯৩)

দ্বিতীয়ত রমযানের ওমরায় রয়েছে অধিক কষ্ট, কারণ সওম অবস্থায় আমল কষ্টকর, বা সফরের কারণে যদি সওম ত্যাগ করে, তবু সফরের কষ্ট কম নয়, পরবর্তীতে আবার কাযার কষ্ট। এরূপ কষ্ট রমযান ব্যতীত অন্য মাসে হয় না। নবী করীম ﷺ ওমরার নির্দেশ করে আয়েশা (রা)-কে বলেন–

إِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ، أَوْ قَالَ قَدْرِ نَفَقَتِكَ .

অর্থ : ওমরা হচ্ছে তোমার কষ্ট, অথবা বলেছেন : তোমার খরচ অনুপাতে।

(মুসলিম ১২১১, দেখুন : আল-মুফহিম: ৩/৩৭০)

৭. রমযান মাসে ওমরাকারী এ সওয়াব অর্জন করবে, মক্কায় অবস্থান করুক, বা ওমরা শেষে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করুক।

৮. এ হাদীস প্রমাণ করে না যে, তানয়িম অথবা হারামের বাইরে গিয়ে একমাত্র বারবার ওমরা করা, অথবা একদিনে বারবার ওমরা করা বৈধ, বর্তমান যুগে প্রচলিত এ আমল সুন্নাত পরিপন্থী, সাহাবীদের আমলের বিপরীত, তাদের কারো থেকে বর্ণিত নেই যে, তারা এক সফরে একাধিক ওমরা করেছেন।
(মাজমাউল ফাতাওয়া: ২৬/২৯২, যাদুল মায়াদ : ২/৯৩, তাহযিবুস সুনান)

৯. রমযানে ওমরাকারী ও বায়তুল্লাহ শরীফে ইতিকাফকারীর কর্তব্য আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিফাজত করা। কারণ মক্কার পাপ অন্য স্থানের পাপের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর, বিশেষভাবে যদি রমযানের মহান মাসে হয়।

১০. পরিবার ও সন্তানসহ যে রমযান মাসে হারাম শরীফে অবস্থান করে, তার কর্তব্য পরিবার ও সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা, যেন তারা হারামে লিপ্ত না হয়, অন্যথায় সে সওয়াবের পরিবর্তে পাপ ও গুনাহসহ বাড়ি ফিরবে, যেহেতু সে তাদের প্রতি খেয়াল রাখেনি।

১১. যখন রোযাবস্থায় ওমরার নিয়তে মক্কায় পৌছে, সে হয়তো সওম ভেঙ্গে ওমরা আদায় করবে, অথবা সূর্যাস্তের অপেক্ষা করে ইফতারের পর তা আদায় করবে। সওম ভঙ্গ করে ওমরা আদায় করাই উত্তম, কারণ ওমরার নিয়ম মক্কায় পৌছা মাত্র তা আদায় করা, যেমন নবী করীম ﷺ করেছেন।

শিক্ষা-৫৮

যাকাতুল ফিতর

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلَاةِ ـ

"গোলাম, স্বাধীন, পুরুষ, নারী, ছোট, বড় সকল মুসলিমের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক 'সা' তামার (খেজুর), অথবা এক 'সা' গম যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন এবং সালাতের পূর্বে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।"

(বুখারী-১৪৩২, মুসলিম-৯৮৪)

বুখারির অপর বর্ণনায় আছে, নাফে (র) বলেছেন : "ইবনে ওমর ছোট-বড় সবার পক্ষ থেকে তা আদায় করতেন, তিনি আমার সন্তানদের পক্ষ থেকে পর্যন্ত আদায় করতেন। যারা তা গ্রহণ করত, ইবনে ওমর তাদেরকে তা প্রদান করতেন, তিনি ঈদুল ফিতরের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে তা আদায় করতেন।" (বুখারী-১৪৪০)

আবু সাঈদ খুদরি (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "আমরা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক 'সা' খানা, অথবা এক 'সা' গম, অথবা এক 'সা' খেজুর, অথবা এক 'সা' পনির, অথবা এক 'সা' কিশমিশ দ্বারা।" (বুখারী-১৪৩৫, মুসলিম-৯৮৫)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "রোযাদারকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন। সালাতের পূর্বে যে আদায় করল, তা গ্রহণযোগ্য যাকাত, যে তা সালাতের পর আদায় করল, তা সাধারণ সদকা।" (আবু দাউদ-১৬০৯, ইবনে মাজাহ-১৮২৭, হাকেম বলেছেন হাদীসটি সহীহ, বুখারীর শর্ত মোতাবেক-১/৫৬৮, আলবানি সহীহ আবু দাউদে হাদীসটি হাসান বরেছেন।)

কায়স ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : "যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সদকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন, যখন যাকাত ফরয হলো, তিনি আমাদের নির্দেশ দেননি, নিষেধও করেননি, তবে আমরা তা আদায় করতাম।" (নাসায়ি-৫/৪৯, ইবনে মাজাহ-১৮২৮, আহমদ-৬/৬, হাফেয ইবন হাজার হাদীসটি সহীহ বলেছেন, ফাতহুল বারি-৩/২৬৭))

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৩টি

১. যাকাতুল ফিতর সকল মুসলিমের ওপর ফরয, যা ফরয হয়েছে যাকাতের পূর্বে। যাকাত ফরযের পর পূর্বের নির্দেশের কারণে তা এখনো ফরয।

২. প্রত্যেক মুসলিমের নিজ ও নিজের অধীনদের পক্ষ থেকে, যেমন স্ত্রী-সন্তান ও যাদের ভরণ-পোষণ তার ওপর ন্যস্ত, যাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

৩. সস্ত্রী-সন্তান যদি কর্মজীবী অথবা সম্পদশালী হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকের নিজের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা উত্তম, কারণ তারা প্রত্যেকে যাকাতুল ফিতর প্রদানে আদিষ্ট। হ্যাঁ, যদি তাদের অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে, তাহলে জায়েয আছে, যদিও তারা সম্পদশালী।

৪. যাকাতুল ফিতরের মূল্য দেয়া যথেষ্ট নয়, এটা জমহুর আলেমের অভিমত। কারণ নবী ﷺ এর নির্দেশ দেননি, তিনি এরূপ করেননি, তাঁর কোনো সাহাবি এরূপ করেনি, অথচ প্রতি বছর যাকাতুল ফিতর আসত। অধিকন্তু ফকিরকে খাদ্য দিলে সে নিজে ও তার পরিবার তার দ্বারা উপকৃত হয়, অর্থ প্রদানের বিপরীত, কারণ সে অর্থ জমা করে পরিবারকে বঞ্চিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত মূল্য আদায়ের ফলে শরিয়তের এ বিধান তেমন আড়ম্বরতা পায় না।

৫. যাকাতুল ফিতর আদায়ের প্রথম সময় আটাশে রমযান, সাহাবায়ে কেরাম ঈদের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে তা আদায় করতেন, সর্বশেষ সময় ঈদের সালাত, যেমন হাদীসে এসেছে।

৬. হকদার ফকির-মিসকিনদের এ যাকাত দিতে হবে, কারণ নবী ﷺ বলেছেন : "মিসকিনদের খাদ্য স্বরূপ।" প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের দেয়া ভুল যদি তারা অভাবী না হয়, যেমন কতক লোক কুরবানি ও আকিকার গোস্তের ন্যায় যাকাতুল ফিতর পরস্পর আদান-প্রদান করে, এটা সুন্নাতের বিপরীত। কারণ এটা যাকাত, হকদারকে দেয়া ওয়াজিব, কুরবানি ও আকিকার গোস্তের অনুরূপ নয়, যা হাদীয়া হিসেবে দেয়া বৈধ। আরেকটি ভুল যে, কত মুসলিম প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিবারকে যাকাতুল ফিতর আদায় করে, অথচ বর্তমান সে সচ্ছল হতে পারে, কিন্তু পূর্বের ন্যায় যাকাত দিতে থাকে, এটা ঠিক নয়।

৭. নিজ দেশের অভাবীদের যাকাতুল ফিতর দেয়া উত্তম, তবে অন্য দেশে দেয়া জায়েয, বিশেষ করে যদি সেখানে অভাবের সংখ্যা বেশি থাকে, তাদের চেয়ে বেশি অভাবী নিজ দেশের কারো সম্পর্কে জানা না থাকে, অথবা তার দেশের অভাবীদের দেয়ার অন্য লোক থাকে।

৮. **যাকাতুল ফিতরের কতক বিধান ও উপকারিতা :**

ক. বান্দার ওপর আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা হয়, যেমন তিনি পূর্ণ মাস সিয়ামের তওফিক ও রমযান শেষে পানাহারের অনুমতি প্রদান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ -

"আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।" (সূরা বাকারা-১৮৫)

খ. এটা শরীরের যাকাত, যা আল্লাহ পূর্ণ বছর সুস্থ রেখেছেন।

গ. যাকাতুল ফিতর বান্দার রোযাকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করে, যেমন হাদীসে এসেছে, যাকাতুল ফিতর রোযাদারকে অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করে।

ঘ. যাকাতুল ফিতর দ্বারা ফকির-মিসকিনদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদেরকে ভিক্ষা থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যেন ঈদের দিন তারাও অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় আনন্দ ও বিনোদন করতে পারে।

ঙ. যাকাতুল ফিতর দ্বারা রোযাদারকে অনুগ্রহ ও অনুদানের প্রতি উৎসাহী করা হয় এবং তাকে লোভ ও কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়।

৯. এক মিসকিনকে এক পরিবার বা একাধিক ব্যক্তির সদকাতুল ফিতর দেয়া বৈধ, যেমন বৈধ একজনের সদকাতুল ফিতর কয়েকজনকে ভাগ করে দেয়া।

১০. শেষ রমযানের সূর্যাস্তের ফলে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে না, কারণ সে ওয়াজিব হওয়ার আগে মারা গেছে। অনুরূপ কেউ যদি সূর্যাস্তের পর জন্মগ্রহণ করে, তার পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব।

১১. কর্মচারী ও ভাড়াটে মজুরদের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব নয়, তবে চুক্তির মধ্যে তাদের সাথে অনুরূপ শর্ত থাকলে আদায় করতে হবে। হ্যাঁ, অনুগ্রহ ও দয়া হিসেবে তাদের পক্ষ থেকে মালিকের আদায় করা বৈধ।

১২. যদি সদকাতুল ফিতর আদায় করতে ভুলে যায়, ঈদের পর ছাড়া স্মরণ না হয়, তাহলে সে যখন সদকা আদায় করবে, এতে সমস্যা নেই, কারণ ভুলের জন্য সে অপারগ।

১৩. যদি কাউকে সদকাতুল ফিতর ফকিরের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহলে ঈদের আগে তার নিকট তা পৌঁছে দেয়া জরুরি। তবে যদি কোনো ফকির কাউকে সদকাতুল ফিতর তার জন্য সংরক্ষণ করে রাখার দায়িত্ব দেয়, তাহলে ঈদের পর পর্যন্ত তার নিকট তা সংরক্ষণ করা বৈধ।

শিক্ষা-৫৯
ঈদের বিধান

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সেখানে দুটি দিন ছিল, সেদিন দুটিতে তারা আনন্দ-ফুর্তি করত। তিনি বললেন : এ দুটি দিন কি? তারা বলল : আমরা জাহেলি যুগে এতে আনন্দ-ফুর্তি করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তোমাদের এ দিন দু'টির পরিবর্তে আরো উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।

আবু উবাইদ মাওলা ইবনে আযহার বলেন : আমি ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে ঈদে করেছি, তিনি বলেন : এ দুটি দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম নিষেধ করেছেন : রমযানের সিয়াম শেষে তোমাদের ঈদুল ফিতরের দিন। দ্বিতীয় দিন হচ্ছে ঈদুল আযহার, সেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানি থেকে খাবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর ও কুরবানির ঈদের সওম পালন নিষেধ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর দিনে বের হন, অত:পর দুই রাকায়াত সালাত আদায় করেন, পরস্পর কোন সালাত আদায় করেননি।

উম্মে আতিয়্যাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেমন যুবতী, ঋতুবতী ও কিশোরীদের নিয়ে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে যাই, তবে ঋতুবতীরা সালাত থেকে দূরে থাকবে, তারা দোআ ও কল্যাণে অংশগ্রহণ করবে।

শিক্ষা ও মাসায়েল ১৫টি

১. আল্লাহ তা'আলা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দান করে এ উম্মতের ওপর অনুগ্রহ করেছেন। মুসলিম উম্মাহকে তিনি এর মাধ্যমে জাহেলি ঈদ ও উৎসব থেকে মুক্ত করেছেন।

২. আমাদের দুটি ঈদ কাফেরদের ঈদ ও উৎসব থেকে বিভিন্ন কারণে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন :

৩. আমাদের ঈদ চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল, গণনার ওপর নয়, যেমন কাফেরদের উৎসবগুলো গণনার ওপর নির্ভরশীল।

৪. আমাদের দু'টি ঈদ মহান ইবাদত ও ইসলামের ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন- সিয়াম, ঈদুল ফিতর, হজ্ব ও কুরবানি।

৫. দুই ঈদে সম্পাদিত কাজগুলো ইবাদত, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে, যেমন তাকবীর, সালাতুল ঈদ ও খুতবা ইত্যাদি, কাফেরদের ঈদ ও উৎসবের বিপরীত, যেখানে কুফর ও গোমরাহীর প্রদর্শন হয়, বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও শয়তানি কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

৬. দুই ঈদের দিনে অনুগ্রহ, দয়া ও পরস্পর দায়িত্বশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যেমন সদকাতুল ফিতর ও কুরবানি।

ক. আমাদের দু'টি ঈদ ভ্রান্ত আকিদা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন নববর্ষ, নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যু, কারো স্মরণ, কোন ব্যক্তির মর্যাদা অথবা সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং এ ঈদ দুটি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

খ. আমাদের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে এসব নিয়ামতের মোকাবিলায় আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা ও তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা, ঈদ, খুশি ও আনন্দের দিনে।

গ. ঈদের দিন আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরি হচ্ছে ফরয ত্যাগ করা, নারীদের পোশাক-আশাকে শিথীলতা অবলম্বন করা ও পুরুষদের সাথে মেলামেশা করা। পোশাক-আশাক, পানাহার ও অনুষ্ঠানে অপচয় ও গান বাদ্য করা।

ঘ. ঈদের দিন সুন্নাত হচ্ছে ঈদের সালাতের জন্য গোসল করা ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা। আমাদের সালাফে সালেহীন বা পূর্ব পুরুষগণ অনুরূপ করতেন।

ঙ. ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সকালে খেজুর খাওয়া সুন্নাত, কারণ নবী ﷺ অনুরূপ করেছেন। আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে ঈদের দিন দ্রুত পানাহার করা সুন্নাত।

চ. ঈদের সালাতে বাচ্চা ও নারীদের যাওয়া সুন্নাত, তারা সালাতে উপস্থিত হবে ও মুসলিমদের দো'আয় অংশগ্রহণ করবে। ঋতুবতী নারীরা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে, তারা শুধু খুতবা ও দো'আয় অংশগ্রহণ করবে।

৭. ঈদের সালাতে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত, অনুরূপ এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, যেমন নবী ﷺ থেকে প্রমাণিত।

৮. সালাত শেষে খুতবা শ্রবণ করা ও দো'আয় আমীন বলার জন্য সালাতের

স্থানে বসে থাকা উত্তম। নবী ﷺ ঋতুবতী নারীদের ব্যাপারে বলেছেন : "তারা কল্যাণ ও মুসলিমদের দো'আয় অংশগ্রহণ করবে।

৯. ঈদের সালাতে পূর্বাপর সালাত নেই, কিন্তু মুসলিম যখন মুসল্লা অথবা মসজিদে প্রবেশ করে, সে দুই রাকাত সালাতের ব্যাপারে আদিষ্ট, নিষিদ্ধ সময়ে পর্যন্ত। কারণ 'দুখুলুল মসজিদ' মসজিদে প্রবেশের কারণে জরুরি হয়, যা নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করা বৈধ।

১০. ইমাম সাহেবের অপেক্ষার সময়ে তাকবীরে লিপ্ত থাকা উত্তম, কারণ এটা ইবাদতের সময়, এ মুহূর্তে সে কুরআন তিলাওয়াত বা নফল সালাত আদায় করতে পারে, যদি নিষিদ্ধ সময় না হয়, তবে তাকবীরে মশগুল থাকা উত্তম।

১১. যদি লোকেরা সূর্য ঢলার পূর্বে ঈদ সম্পর্কে জানতে না পারে, তাহলে পরদিন সালাত আদায় করবে। যদি কেউ ঈদের সালাতে ইমামের তাশাহুদে অংশগ্রহণ করে, সে তার সাথে বসে যাবে, অতঃপর দু'রাকাত কাযা করবে ও তাতে তাকবীর পড়বে।

১২. ঈদের সালাত ছুটে গেলে বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তার কাযা নেই, কারণ ঈদের সালাত কাযা করার কোন দলিল নেই।

১৩. ঈদের দিন আনন্দ করা বৈধ, যদি সীমালঙ্ঘন অথবা ওয়াজিব বিনষ্ট না হয়। মুসলিমদের উচিত ঈদের দিন পরিবারে সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা, কারণ ঈদের দিন আনন্দ করা দ্বীনের একটি অংশ।

১৪. ঈদের দিন খাবারে অনেক লোক একত্র হওয়া ভালো, কারণ এতে ঈদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হয় ও মুসলিমদের জমায়েত হয়।

১৫. ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোনো সমস্যা নেই, আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে বর্ণিত, ঈদের দিন সাক্ষাতের সময় তারা পরস্পরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। তারা বলতেন : تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ "আল্লাহ আমাদের থেকে ও আপনাদের থেকে কবুল করুন।" তবে শুভেচ্ছার শব্দ দেশ ও অঞ্চল অথবা সময়ের ব্যবধানে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যদি হারাম শব্দ অথবা কাফেরদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়, যেমন তাদের হারাম উৎসবে ব্যবহৃত শুভেচ্ছা পদ্ধতি গ্রহণ করা।

শিক্ষা-৬০
শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফযীলত

আবু আইয়ুব আনসারি (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ .

"সে রমযানের রোযা পালন করল, অতঃপর তার অনুগামী করল শাওয়ালের ছয়টি, তা পুরো বছর রোযার ন্যায়।" (মুসলিম-১১৬৪)

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذٰلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ .

"রমযানের রোযা দশ মাসের সমতুল্য, ছয়দিনের সিয়াম দুই মাসের সমতুল্য, এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।" অপর বর্ণনায় রয়েছে :

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ . مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .

"যে ঈদুল ফিতরের পর ছয়দিন রোযা পালন করবে, তা পূর্ণ বছরে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে সৎকাজ নিয়ে এসেছে, তার জন্য হবে তার দশ গুণ।" (সূরা আন-আম-১৬০, সূরা আনআম-১৬০, আহমদ-৫/২৮০, ইবন মাজাহ-১৭১৫, দারামি-১৭৫৫, নাসায়ি ফিল কুবরা-২৮৬০, সহীহ ইবন খুযাইমাহ-২১১৫৪ সহীহ ইবন হিব্বান-৩৬৩৫)

শিক্ষা ও মাসায়েল ১১টি

১. শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত প্রমাণিত হয়। প্রতি বছর রমযানের রোযার সাথে যে শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করল, সে সারা বছর রোযা রাখল।

২. বান্দার ওপর আল্লাহর অশেষ রহমত, তিনি বান্দার অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক সওয়াব ও বিরাট প্রতিদান প্রদান করেন।

৩. ঈদের পর দ্রুত শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করা, যেন এ রোযা ছুটে না যায়, কিংবা কোনো ব্যস্ততা এসে না পড়ে।

৪. শাওয়ালের শুরু, শেষ বা মাঝে, এক সঙ্গে বা পৃথকভাবে এ রোযা রাখা- বৈধ। বান্দা যেভাবে তা সম্পাদন করুক, সে আল্লাহর নিকট এর পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে, যদি আল্লাহ্ তা কবুল করেন। (ইবন কুদামার মুগনি-৪/৪৪০, শারহুন নববী আলা মুসলিম-৮/৫৬)

৫. যার ওপর রমযানের কাযা রয়েছে, সে প্রথমে কাযা আদায় করবে, অতঃপর শাওয়ালের ছয় রোযা আদায় করবে। হাদীসের বাণী থেকে এমন বুঝে আসে, কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : "যে রমযানের রোযা রাখল" অর্থাৎ পূর্ণ রমযান। যার ওপর কাযা রয়েছে, সে পূর্ণ রমযান রোযা রাখেনি। তার ওপর পূর্ণ রমযান রোযা রাখা প্রয়োগ হয় না, যতক্ষণ না সে কাযা করে। (শারহুল মুমতি-৬/৪৬৬) দ্বিতীয়ত নফল ইবাদতের চেয়ে ওয়াজিব কাযা আদায় করা শ্রেয়।

৬. আল্লাহ্ তা'আলা ফরযের আগে নফলের বিধান রেখেছেন, যেমন নফলের বিধান রেখেছেন ফরযের পর। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বাপর সুন্নাত রয়েছে, অনুরূপ রমযানের সিয়ামের পূর্বাপর রোযা রয়েছে। অর্থাৎ শাবান ও শাওয়ালের রোযা।

৭. এসব নফল ইবাদত ফরযের মধ্যে ঘটে যাওয়া ত্রুটিসমূহ দূর করে। কারণ এমন রোযাদার নেই যে অযথা বাক্যালাপ, কুদৃষ্টি ও হারাম খাবার ইত্যাদি দ্বারা তার রোযার ইতি করেনি।

৩. রমযানের ৩০ ফতোয়া

ফতোয়া-১

রোযা ফরজ হওয়া

প্রশ্ন : কেন আল্লাহ তাআলা রোযার বিধান দিলেন? রোযা ফরজ করার হিকমত বা উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : সিয়াম বা রোযা ফরজ করার নানা কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. তাকওয়া (খোদাভীতি) প্রতিষ্ঠা

সিয়াম তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জনে সাহায্য করে। প্রবৃত্তগত চাহিদা পূরণ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে। আমরা দেখতেই পাচ্ছি সিয়াম পেট ও লজ্জাস্থানের চাহিদাকে দমন করে। আর এ দুটো জিনিস মানুষকে যাবতীয় খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। এ দুটো জিনিসের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে হারাম ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব এ দুটো জিনিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তাকওয়া অর্জন করা যাবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ـ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হলো যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা-১৮৩)

২. আত্মার পরিশুদ্ধতা ও প্রশিক্ষণ

রোযার মাধ্যমে ধৈর্য বা ছবরের জন্য আত্মার প্রশিক্ষণ অর্জন হয়। এর মাধ্যমে সিয়াম পালনকারী আল্লাহর সকল প্রকার আদেশ পালন ও তার নিষেধাবলি থেকে বিরত থাকার শক্তি অর্জন করেন।

৩. আল্লাহ্ ভীতিকে শক্তিশালী করা

রোযা এমন একটা ইবাদত যা মানুষ না করেও প্রকাশ করতে পারে যে সে সিয়াম পালনকারী। তাই সিয়াম সত্যিকার সততা, মহান আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ দাসত্ব আল্লাহকে ভালোবাসার চরম পরাকাষ্ঠার প্রমাণ বহন করে। সিয়াম পালনকারী একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তার প্রতিদানের আশা করে। তার ভয়েই সে সিয়াম পালন করে। তাইতো রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى مَا شَاءَ عَزَّ وَجَلَّ، اِلاَّ الصَّوْمَ، فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ .

প্রত্যেক মানব সন্তানের নেক আমলের প্রতিদান দশগুণ থেকে বৃদ্ধি করে সাত শতগুণ বা তার বেশি পরিমাণে দেয়া হবে কিন্তু রোযার বিষয়টি ব্যতিক্রম। কারণ, তা আমারই জন্য, তার প্রতিদান আমি নিজে। কেননা সিয়াম সাধনাকারী আমারই জন্য তার খাওয়া-দাওয়া ও যৌন চাহিদা পরিত্যাগ করে।

(বুখারী ও মুসলিম)

৪. আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ অনুধাবন করা

পৃথিবীতে ক্ষুধা-চাহিদা নিবারণ করার জন্য আল্লাহ্ যদি আমাদের নেয়ামত ও উপকরণ না দিতেন তা হলে অবস্থা কেমন হতো !

৫. স্বাস্থ্য ও দেহের শক্তি বৃদ্ধি করা

মূলত: সিয়াম ঈমান ও তাকওয়া বাড়ায় যা সিয়াম পালনকারীকে যাবতীয় পাপাচার থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়াও আরো অনেক উপকার রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো যা বর্তমানে গবেষণা ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে সিয়াম দেহকে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে ও স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখে।

ফতোয়া–২

রোযা আদায়ে অপারগ ব্যক্তির হুকুম

প্রশ্ন : এমন বৃদ্ধ লোক যে রোযা রাখলে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, সে কি রোযা রাখবে?

উত্তর : যদি সিয়াম পালনে তার ক্ষতি হয়, তার জন্য সিয়াম পালন জায়েয নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ـ

তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের প্রতি দয়াশীল। (সূরা নিসা : আয়াত-২৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন–

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ـ

তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৯৫)

তাই যে বৃদ্ধ লোকের স্বাস্থ্যের জন্য সিয়াম ক্ষতিকর তার জন্য সিয়াম পালন জায়েয নয়। এর সাথে ভবিষ্যতে সিয়াম পালনের সামর্থ্যবান হওয়ার সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলে, সে প্রত্যেকটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে বা দান করবে। এতেই সে সিয়ামের দায় থেকে মুক্ত হবে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–৩

তারাবির সালাত

প্রশ্ন : তারাবির সালাতের বিধান কী?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য সালাতকে সুন্নাত করেছেন। তিনি তার সাহাবীদের নিয়ে তিন রাত্রি তারাবীহ্ আদায় করেছেন। উম্মতের ওপর ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পরের দিন তিনি আর জামায়াতের সাথে তারাবীহ্ আদায় করেননি। মুসলমানগণ আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকাল ও উমর (রা)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে এ অবস্থায়ই ছিল। এরপর আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) বিশিষ্ট সাহাবী তামীম আদদারী (রা) ও উবাই ইবনে কাআব (রা)-এর ইমামতিতে তারাবীর জামায়াতের ব্যবস্থা করেন। যা আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। আলহামদুলিল্লাহ! এ তারাবীর জামায়াত শুধু রমযান মাসেই সুন্নাত।

সালাতে তারাবীহতে অন্যান্য সালাতের মতো বিনয়-নম্রতা, একাগ্রতা ও ধীর-স্থিরভাবে রুকু, সিজদা, কওমা ও জলছা আদায় করতে হবে। অনেক লোককে দেখা যায় সালাতে তারাবীহ আদায়ে এত তাড়াতাড়ি করে যার কারণে সালাতের অনেক সুন্নাত ছুটে যায় বরং অনেক ওয়াজিবও ছুটে যায়। তাদের এ তাড়াহুড়া দেখলে মনে হয় কে আগে মসজিদ থেকে বের হবে এর যেন একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতা চলছে।

ফতোয়া–৪

তারাবির সালাতে তাড়াহুড়া করা

প্রশ্ন : তারাবির সালাতে তাড়াহুড়ো করার হুকুম কী ?

উত্তর : তারাবির নামায আদায়ে অতি মাত্রায় তাড়াহুড়ো করা এবং তারাবির নামায আদায়ে অবহেলা করা একটি শরিয়ত বিরোধী কাজ। যেমন, মুরগির ঠোকর দেয়ার মতো করে সালাত আদায় করা এবং তারাবির নামাযে কুরআন খতম করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি ক্বিরাত পড়া।

শেখ জামাল উদ্দিন আল কাসেমি (র) বলেন, মনে রাখতে হবে, তারাবির সালাত রমযান মাসে অবশ্যই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ,।

বেশিরভাগ মসজিদের ইমামদের দেখা যায়, তারা তাদের মসজিদসমূহে তারাবির সালাত তাড়াহুড়ো করে সালাত আদায় করতে অভ্যস্ত। ফলে তারা সালাতের আরকান সুন্নাত ইত্যাদি আদায়ে অবহেলা করে। সালাত তাড়াহুড়া করে শেষ করার প্রবণতায় তারা রুকু সেজদা আদায়ে ধীরস্থিরতা ছেড়ে দেয়, কিরাত পড়তে তাড়াহুড়া করে এবং কুরআনের আয়াতের শব্দগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলে।

এ জাতীয় সালাত এবং নেক আমল দ্বারা শয়তান মু'মিনদের ধোঁকা দেয় ও তাদের বোকা বানানোর চক্রান্ত করে।

শয়তান তাদের আমল করা সত্ত্বেও আমলটিকে নষ্ট করে দেয় এবং যারা এ জাতীয় তাড়াহুড়ার অনুকরণ করে, তাদের সালাত অনেক সময় ইবাদতের পরিবর্তে তা হাসি ঠাট্টায় পরিণত হয়।

তাই আমরা বলি, একজন মুসলিমের ওপর কর্তব্য হলো, সে তার সালাতের বাহ্যিক যেমন : কিরাত, দাঁড়ানো, রুকু সেজদা ইত্যাদি এবং আধ্যাত্মিক যেমন: একাগ্রতা, অন্তরের উপস্থিতি, পরিপূর্ণ ইখলাস, কিরাত এবং সালাতের তাসবীহ ইত্যাদির অর্থের মধ্যে চিন্তা ফিকির করা।

সালাতের বাহ্যিক সৌন্দর্য হলো, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আর সালাতের বাতিনি সৌন্দর্য নামাযীর অন্তর বা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত।

ইমাম গাজ্জালি (র) বলেন, যে ব্যক্তি সালাতের বাহ্যিক দিকটি লক্ষ্য রাখেন কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেন না, তার একটি উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে কোন একজন বাদশাকে একটি মৃত ছাগলের বাচ্চা উপহার দিল

আর যে ব্যক্তি সালাতের জাহেরি কাজগুলোতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, কোন বাদশাকে একটি কান কাটা, উভয় চক্ষু নষ্ট এমন একটি জন্তু হাদিয়া দিলেন।

মনে রাখতে হবে, এখানে এ দু'জন লোকই একজন বাদশাকে মানহানি করেছে এবং বাদশার মর্যাদাকে খাট করেছে। তবে উভয় ব্যক্তির অপরাধ অবশ্যই এক রকম নয়, ফলে তাদের উভয়ের শাস্তিও এক জাতীয় হবে না।

তারপর ইমাম গাজ্জালি (র) বলেন : নিশ্চয় তুমি তোমার পালনকর্তাকে তোমার সালাত হাদিয়া দিচ্ছ, তোমাকে অবশ্যই এ জাতীয় সালাত হাদিয়া দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যে সালাত দ্বারা তোমাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

শেখ উসাইমিন (র) রাসূল ﷺ-এর কিয়ামুলাইল এবং তার সাহাবিদের কিয়ামুললাইলের আলোচনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন–

বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ যেভাবে তারাবির সালাত আদায় করেন তা শরিয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তারা তারাবির সালাত এত দ্রুত আদায় করে, সালাতের ওয়াজিব, নামাযে ধীরস্থিরতা এবং তা দিলে আরকান ইত্যাদির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না, অথচ এগুলো সালাতের রুকন, যেগুলো আদায় ব্যতীত সালাত শুদ্ধই হয় না।

তারা তাদের পিছনের নামাজি– অসুস্থ ব্যক্তি, দুর্বল এবং বৃদ্ধদের কেবল কষ্ট দেয় এবং তারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে এবং অন্যদের ওপরও অত্যাচার করে।

বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, একজন ইমামের জন্য এত তাড়াহুড়া করা, যাতে তার পিছনে নামাযীরা সুন্নাত আদায় করতে পারে না, তাহলে তার সালাত অবশ্যই মাকরূহ হবে।

আর যদি ইমাম এমন তাড়াহুড়া করে যার ফলে নামাযীরা তার পিছনে ফরজ আদায় করতেও সক্ষম হয় না, তার পরিণতি কি হতে পারে? আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব (র)-কে তারাবির নামাযে তাড়াহুড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন,

তিনি প্রশ্নকারীকে বলেন –

তোমার কথা ইমাম তাড়াতাড়ি করলে তার পিছনে অনেক মানুষ সালাত আদায় করবে আর যখন সে ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করে তখন তার পিছনে নামাযীর সংখ্যা কমে যাবে- এর আলোকে আমি বলব, শয়তানের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নেক আমল থেকে বিরত রাখা, আর শয়তান যখন তা করতে সক্ষম হয়ে উঠে না, তখন তার জীবন মরণ চেষ্টা থাকে মানুষের আমলকে নষ্ট করা।

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশের বেশিরভাগ ইমাম তারাবির নামাযে এমন সব কাজ করে যা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

তারা অর্থহীন সালাত আদায় করে, তারা ঠিক মতো রুকু করে না এবং ঠিক মতো সেজদা করে না। অথচ ঠিক মতো রুকু সেজদা না করলে সালাতই শুদ্ধ হয় না।

মনে রাখতে হবে, মূলত: সালাতের উদ্দেশ্যই হলো একাগ্রচিত্তে আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়ানো এবং কুরআন তিলাওয়াত চলাকালে তা হতে উপদেশ গ্রহণ করা।

কিন্তু সালাতের এ মহৎ উদ্দেশ্য তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করলে তা পূরণ হয় না।

কাজেই ইমামের সাথে তাড়াহুড়া করে বিশ রাকায়াত আদায় করার চেয়ে ধীরস্থির খুশু ও বিনয়ের সাথে ইমামের পিছনে দশ বা আট রাকায়াত পড়াই উত্তম।

রাকায়াতের আধিক্যের চেয়ে সুন্দরভাবে সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান হও। আর এটিই তোমার জন্য উপকারী ও সর্বোত্তম।

আমরা যে কথাগুলো আলোচনা করলাম, এর ওপরই আমল করা উচিত।

আর যদি ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং মোক্তাদিরা তাড়াহুড়া নামাযে অভ্যস্ত এবং তারা যদি ইমাম এর সাথে সুন্নাত অনুযায়ী সালাত আদায় করতে অসম্মতি জানান তখনও ইমামের জন্য করণীয় হলো, সে ধীরস্থির সালাত আদায়ে উৎসাহী হবে এবং কোনভাবেই নামাযে এমন তাড়াহুড়া করবে না যাতে ধীরস্থিরতার বিঘ্ন হয়।

এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের জন্য নামাযে পূর্ণ রুকু সেজদা এবং ধীরস্থিরতা বজায় রেখে তাড়াহুড়া করে দীর্ঘ কিরায়াত পড়ার চেয়ে ছোট কিরায়াত পড়া শ্রেয়।

অনুরূপভাবে দীর্ঘ কিরাত এবং রুকু সেজদায় ধীরস্থিরতা বজায় রেখে, আট বা দশ রাকায়াত সালাত আদায় করা তাড়াহুড়া করে বিশ রাকায়াত সালাত আদায় করার তুলনায় উত্তম।

কারণ, সালাতের আসল এবং চালিকা শক্তিই হলো মানুষের মন আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। অনেক সময় আছে তখন কম-বেশির চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে।

কিতাবুস্‌সুনান ওয়াল মুবতাদিয়াত গ্রন্থকার বলেন, অনেক ইমামের সালাত পাগলের সালাতের সাদৃশ্য। বিশেষ করে তারাবির সালাতে তিনি বলেন তাদের দেখা যায় তারা বিশ মিনিটে তেইশ রাকাত সালাত আদায় করেন এবং প্রত্যেক রাকায়াতে তা সূরা আলা, দোহা এবং সূরা রহমানের এক-চতুর্থাংশ পড়ে সালাত শেষ করেন। এ জাতীয় সালাত সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বাতিল, কারণ তাদের সালাত হলো মুনাফিকদের সালাত সমতুল্য।

আল্লাহ মুনাফিকদের সালাত প্রসঙ্গে বলেন–

وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا.

এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন তারা অলসতা করে। তারা লোক দেখানো সালাত আদায় করে এবং তারা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে।

তাদের সালাত সফল মু'মিনদের সালাতের মতো নয়, যাদের সালাত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ .

অবশ্যই ঐ মু'মিনগণ সফলকাম যার তাদের নামাযে বিনয়ী।

এবং তাদের সালাত রাসূল ﷺ যে ধরনের সালাত আদায় হতে বারণ এবং নিন্দা করেছেন– কাকের ঠোকর, নামাযে চুরি ইত্যাদি-সে সালাতের মতোই নয়।

আল্লামা দারমি আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন, আমরা বিভিন্ন মানুষের নিকট হতে ইলম অর্জন করার জন্য হাজির হতাম, তখন আমরা তার সালাতের প্রতি লক্ষ্য করতাম, যখন দেখতাম তার সালাত সুন্দর, আমরা বলতাম তার অন্য সব কিছুই সুন্দর। আর যখন দেখতে পেতাম তার সালাত অসুন্দর, আমরা তার থেকে দূরে সরে যেতাম এবং বলতাম তার অন্য সব কিছুই এর চেয়েও অধিক অসুন্দর।

ফতোয়া–৫

কুরআন মাজীদ দেখে ইমামের ভুল সংশোধন

প্রশ্ন : দেখা যায় কোনো কোনো মুক্তাদী ইমাম সাহেবের ভুল সংশোধনের জন্য তারাবীতে কুরআন মাজীদ বহন করেন অথচ ইমাম সাহেবের ভুল সংশোধনের প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনিও কুরআন মাজীদ দেখে দেখে তেলাওয়াত করছেন। এ বিষয়ে নির্দেশ কী?

উত্তর : সালাতে কুরআন মজীদ বহন করা উচিত নয়। তবে যদি দরকার হয় তবে অন্য কথা। যেমন : ইমাম সাহেব কাউকে বললেন আমি উত্তমরূপে তেলাওয়াত করতে জানি না, আমি চাই তুমি কুরআন মাজীদ নিয়ে আমার পিছনে থাকবে যদি আমি কোন ভুল করি তবে তা ধরিয়ে দেবে। এ জাতীয় কারণ ছাড়া মুক্তাদীর কুরআন বহন করা ঠিক নয়। কারণ, এতে মন অন্য দিকে চলে যায়। তা ছাড়া বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার যে সুন্নাত রয়েছে, তা আদায় করতে ব্যাঘাত ঘটে। উত্তম হলো বর্ণিত কারণ ছাড়া এ কাজ পরিহার করা। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–৬

সন্দেহের দিন রোযা পালন

প্রশ্ন: হতে পারে আজ রমযানের ১ তারিখ ইহা মনে করে শাবান মাসের শেষ দিনে সতর্কতা স্বরূপ সিয়াম পালনের বিধান কী?

উত্তর : সন্দেহের দিন বলতে শাবান মাসের ৩০ তারিখকে বুঝায়। ঐ দিন সতর্কতা অবলম্বন করে সিয়াম পালনের বিধান প্রসঙ্গে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো ঐ দিন রোযা রাখা হারাম।

সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) বলেছেন–

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَشُكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখল সে রাসূলে করিমﷺ-এর অবাধ্য হলো।

দ্বিতীয়ত: সন্দেহের দিন সিয়াম সাধনাকারী আল্লাহর দেয়া সীমা অতিক্রম করল। কেননা আল্লাহ তাআলার সীমা হলো, কেহ রমযানের চাঁদ না দেখে বা

চাঁদ প্রমাণিত না হলে রমযানের রোযা রাখবে না। তাই তো রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন–

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ، اِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ .

তোমাদের কেহ যেন রমযান মাসকে এক বা দু দিন বৃদ্ধি না করে। তবে যার অন্য কোন নিয়মিত সাওম সে দিনে হয়ে যায়, তার কথা ভিন্ন। (রমযানের ১লা তারিখ সন্দেহ করে রোযা রাখা যাবে না) আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

ফতোয়া–৭

ডাক্তার যদি রোজা রাখতে নিষেধ করেন

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি কঠিন হাঁপানী রোগে ভুগছে। দু'বছর পর্যন্ত তার চিকিৎসা চলছে। ডাক্তার তাকে রমযানে রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। তাকে বলেছে যদি সে সিয়াম পালন করে তবে রোগ বাড়বে। এ অবস্থায় সিয়াম বর্জনের বিধান কী ?

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ .

যে কেহ রমযান মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে। আর যে রোগাক্রান্ত অথবা ভ্রমণে থাকে সে যেন অন্য সময়ে আদায় করে নেয়। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৫)

অর্থাৎ রোগের কারণে রোযা পালনে যদি কষ্ট হয় অথবা সুস্থতা লাভে বিঘ্ন ঘটে তাহলে সে রমযানে রোযা পালন না করে অন্য সময়ে আদায় করবে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা কষ্টকর তা চান না।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৫)

উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি ডাক্তার মুসলিম, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হন এবং বলেন সিয়াম রোগের ক্ষতি করবে অথবা সুস্থতা লাভে বিলম্ব হবে তবে রোযা পালন না করা জায়েয আছে। আর যদি ডাক্তার মুসলিম না হন অথবা মুসলিম কিন্তু সৎ নন তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, রোগী যদি অনুভব করে যে রোযা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে তা হলে সে রোযা পালনে বিরত থাকতে পারবে। পরে সুযোগ মতো সময়ে কাজা আদায় করে নিবে। কাফ্‌ফারা দেয়ার দরকার হবে না। আল্লাহ্ তাআলাই বেশি জানেন।

ফতোয়া–৮

রমযান মাসে ইসলাম গ্রহণকারীর সিয়ামের হুকুম

প্রশ্ন : রমযানের কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কেহ ইসলাম গ্রহণ করে তা হলে তাকে কি চলে যাওয়া সিয়াম আদায় করতে বলা হবে?

উত্তর : না তাকে পূর্বের রোযা আদায় করতে হবে না। কেননা সে তখন কাফের ছিল। আর কাফের থাকাকালীন সময়ে যে নেক কাজ অতিবাহিত হয়ে গেছে তাকে তা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْلَهُمْ مَاقَدْ سَلَفَ ـ

যারা কাফির তাদের বলে দাও যদি তোমরা কুফরির অবসান ঘটাও তাহলে তিনি তোমাদের অতীতে যা কিছু গেছে তা মাফ করে দিবেন।

(সূরা আনফাল : আয়াত-৩৮)

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কাউকে অতীতের সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করা হয়নি।

কিন্তু কথা থেকে যায় সে রমযানের দিনের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে কি খাওয়া-দাওয়া, যৌন-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে, না কাজা আদায় করতে হবে, এ বিষয়ে উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

তবে বিশুদ্ধতম মতো হল তাকে দিনের অবশিষ্ট সময়টা খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কাজা আদায় করতে হবে না। কেননা দিনের শুরুতে যখন রোযা ওয়াজিব হওয়ার সময় এসেছে তখন তার ওপর তা ওয়াজিব হয়নি। তার মাসয়ালাটা ঐ কিশোরের মতো যে দিনের মধ্যবর্তী সময়ে বালেগ হয়েছে। তাকে বিরত থাকতে হবে। কাজা করতে হবে না।

ফতোয়া–৯

রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে তৈল ও সুরমার ব্যবহার

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় মাথায় তৈল ব্যবহার করা, চোখে সুরমা দেয়া, রান্নার সময় স্বাদ গ্রহণ করা ও থুথু গিলে ফেললে রোযা কি মাকরূহ হয়?

উত্তর : মাথায় তৈল ব্যবহার করলে, চিরুনী দ্বারা আচড়ালে অথবা চোখে সুরমা ব্যবহার করলে রোযা মাকরূহ হয় না। ডেকচি-হাঁড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে, থুথু গিলে ফেললে অথবা মাছি গলায় চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয় না। রোযাদার গরমের প্রখরতার কারণে পোশাক পানিতে ভিজিয়ে তা দেহে রাখতে পারবে। এর দ্বারা রোযা মাকরূহ হবে না।

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رضى) اِذَا كَانَ صَوْمُ اَحَدِكُمْ فَلْيَصْبَحْ دَهِيْنًا مُتَرَجِّلاً - قَالَ الْحَسَنُ لاَ بَاْسَ بِالسَّعُوْطِ لِلصَّائِمِ اِنْ لَمْ يَصِلِ اِلٰى حَلَقِهِ وَيَكْتَحِلُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضى) لاَ بَاْسَ اَنْ يَتَطَعَّمَ الْقَدْرَ اَوْ الشَّيْءَ - قَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيْقَهُ - قَالَ الْحَسَنُ اِنْ دَخَلَ حَلَقَهُ الذُّبَابَ فَلاَشَيْءَ عَلَيْهِ - بَلْ اِبْنُ عُمَرَ (رضى) ثَوْبًا فَاَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখবে, তাকে তৈল ব্যবহার এবং চিরুনী ব্যবহার করা প্রয়োজন। হাসান (রা) বলেন, "রোযাদারের জন্য নাকে ঔষধ ব্যবহার ক্ষতিকর নয়, তবে শর্ত হলো গলায় না পৌছতে হবে।" আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : রোযাদার ডেগচি-হাঁড়ির স্বাদ পরীক্ষা করলে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। আতা এবং কাতাদা (র) বলেন : রোযাদার নিজের থুথু গিলে খেতে পারবে।" হাসান (রা) বলেন : যদি মাছি রোযাদারের গলায় চলে যায়, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রোযাবস্থায় কাপড় ভিজিয়ে তা দেহে রাখতেন। (সহীহ আল বুখারী : ২/২৪৫, ২৪৭, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৫, ২৪৪, ২৪৫; তাগলীক : ৩/১৫১, ১৬৮, ১৫২, ১৬৬, ১৫৬, ১৫১, ১৭৯৪)

ফতোয়া–১০

সালাতে অধিক নড়াচড়া করা প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমি কোনো কোনো ভাইকে দেখেছি তারা মসজিদে নামায (সালাত) আদায় করার সময় নড়াচড়া করেন। কখনো আবার এক পা সামনে নিয়ে যান। এতে কি সালাত বাতিল হয়ে যায়?

উত্তর : মূলত প্রয়োজন ব্যতীত সালাতে নড়াচড়া করা মাকরূহ। তবে সালাতের মধ্যে নড়াচড়া করা পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : ১. ওয়াজিব নড়াচড়া, ২. হারাম নড়াচড়া, ৩. মুস্তাহাব নড়াচড়া, ৪. মুবাহ বা জায়েয নড়াচড়া, ৫. মাকরূহ নড়াচড়া।

১. ওয়াজিব বলতে বুঝায় এমন নড়াচড়া যার ওপর সালাত শুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। যেমন সালাত অবস্থায় কারো পাগড়িতে নাপাক বস্তু দেখা গেল। তখন ওয়াজিব হবে নড়াচড়া করে নাপাক বস্তুটি ফেলে দিয়ে পাগড়িকে নাপাকী থেকে সংরক্ষণ করা। যেমন হাদীসে এসেছে যে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে ইমামতি করছিলেন, এমতাবস্থায় জিবরীল (আ) এসে বললেন যে, আপনার জুতায় নাপাকী আছে। তখন তিনি সালাতের মধ্যে জুতা খুলে ফেললেন ও সালাতে নিমগ্ন থাকলেন। এমন আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো কিবলা পরিবর্তনের মাসআলা। সকলে সালাতে মগ্ন ছিলেন। একজন এসে সংবাদ দিলেন কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। সাথে সাথে সকলে সালাতের মধ্যেই ঘুরে গেলেন।

২. আর হারাম নড়াচড়া বলতে বুঝায় কোন ধরনের প্রয়োজন ব্যতীত অনর্থক অধিক নড়াচড়া করা। এতে সালাত বাতিল হয়ে যায়। যা সালাত বাতিল করে তা সালাতের মধ্যে করা হারাম বলেই গণ্য এবং আল্লাহর বিধানের সাথে বিদ্রূপ করার অন্তর্ভুক্ত।

৩. আর মুস্তাহাব নড়াচড়া হলো সালাতের মধ্যে কোন মুস্তাহাব আমল সম্পাদন করার জন্য যে সকল নড়াচড়া করার প্রয়োজন হয়। যেমন কেহ কাতার সোজা করার জন্য অথবা সামনের কাতারে স্থান পূরণ করার জন্য সামনে চলে গেল অথবা কাতারের খালি স্থান পূরণ করার জন্য সরে দাঁড়াল। এ জাতীয় কাজের জন্য নড়াচড়া করলে অসুবিধা নেই, কারণ ইহা সালাতের পূর্ণতার জন্য করা হয়। তাই তো হাদীসে এসেছে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রা) সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাকে ধরে পিছন দিক থেকে ডান পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

৪. আর মুবাহ নড়াচড়া হলো প্রয়োজনে নড়াচড়া করা। কম হোক বা বেশি। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়রত অবস্থায় তার নাতনী উমামাহ বিনতে জয়নবকে কোলে তুলে নিতেন, যখন তিনি সেজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন। এ হলো প্রয়োজনে অল্প নড়াচড়া করার উদাহরণ। প্রয়োজনে অধিক নড়াচড়া করার দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন :

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ـ

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে। বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হবে। যদি ভয়ের সম্ভাবনা থাকে তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায়ে যত্নববান হবে, যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৩৮-২৩৯)

পথচলা অবস্থায় সালাত আদায় করলে বেশি নড়াচড়া করতে হয়। কিন্তু ইহা প্রয়োজনে, তাই তা সালাত ভঙ্গ করবে না।

৫. আর উপরে উল্লেখিত নড়াচড়া ব্যতীত যত ধরনের নড়াচড়া আছে সবগুলো মাকরূহ নড়াচড়া বলে গণ্য।

এর ওপর ভিত্তি করে আমি ঐ ভাইকে বলব যাকে প্রশ্নকারী নড়াচড়া করতে দেখেছেন, আপনি যে নড়াচড়া করেছেন তা নিশ্চয়ই মাকরূহ। এতে সওয়াব কমে যায়। আর এক পা'কে অপর পায়ের চেয়ে আগে বাড়ানো উচিত নয়। বরং সুন্নাত হলো আপনার দুপা সমান্তরাল থাকবে। শুধু আপনার নয় সকল মুসল্লিদের পা সমান্তরাল থাকবে। কেননা কাতার সোজা করা ওয়াজিব। যদি তা ছেড়ে দেয়া হয় তবে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদের পিঠে ও কাঁধে হাত দিয়ে কাতার সোজা করে দিতেন আর বলতেন–

لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ ـ

তোমরা পৃথক হয়ো না, যদি হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের অন্তর পৃথক করে দিবেন।

তিনি একদিন কাতার সোজা করার বিধান জারি করার পর এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে তার বুক সামনে নিয়ে গেছে তখন বললেন–

عِبَادَ اللّٰهِ لَتَسُوُّنَّ بَيْنَ صُفُوْفِكُمْ اَوْ لَيُخَالِفُ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ -

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা রাখবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন।

আসল কথা হলো কাতার সোজা করা ওয়াজিব। এটা ইমাম ও মুক্তাদীর উভয়ের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–১১

হায়েজ নিফাস অবস্থায় সিয়াম পালনের হুকুম

প্রশ্ন : মেয়েদের হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় সিয়াম পালনের বিধান কী? তারা যদি এক রমযানের সিয়ামের কাজা অন্য রমযান পর্যন্ত দেরী করেন তা হলে কোন অসুবিধা আছে কিনা?

উত্তর : হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় মেয়েদের জন্য ওয়াজিব হলো সিয়াম ছেড়ে দেয়া। এ অবস্থায় সালাত ও সিয়াম কোনোটাই আদায় করা জায়েয হবে না। সুস্থতার পর তাদের সিয়াম কাজা আদায় করতে হবে। সালাতের কাজা আদায় করতে হবে না। হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اِنَّهَا سُئِلَتْ : هَلْ تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ -

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো হায়েজ থেকে পবিত্রতার পর নারীরা কি সালাত ও সাওমের কাজা আদায় করবে? তিনি বললেন : "এ অবস্থায় আমাদের সিয়ামের কাজা আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সালাতের নয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

সিয়াম কাজা করা আর সালাত কাজা না করা প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) যা বলেছেন উলামায়ে কেরাম তার সাথে একমত পোষণ করেছেন অর্থাৎ ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ বিধানে আল্লাহর এক অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটেছে। সিয়াম বছরের একবার আসে বলে তা কাজা করা কষ্টকর হয় না। কিন্তু সালাত কাজা করার বিধান হলে তা কষ্টকর হয়ে যেত।

যদি শরয়ী ওজর (সংগত কারণ) ছাড়া কেহ এক রমযানের সিয়ামের কাজা অন্য আরেক রমযানের পর পর্যন্ত দেরী করে তাহলে সে এ কাজের জন্য তাওবা করবে। কাযা আদায় করবে এবং প্রত্যেকটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার দান করবে। এমনিভাবে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও মুসাফির যার ওপর রোজার কাজা আদায় করাসহ কাফ্ফারা দিতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে এবং তওবা করবে। আল্লাহ তাআলাই বেশি জানেন।

ফতোয়া-১২

হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়া

প্রশ্ন : যদি হায়েজবতী মহিলা ফজরের ওয়াক্তের আগে তার হায়েজ বন্ধ হয়ে যায় এবং সে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর গোসল করে তা হলে তার বিধান কী?

উত্তর : যার হায়েজ সুবহে-সাদেকের পূর্বে বন্ধ হয়েছে কিন্তু গোসল করেছে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তার রোজা বিশুদ্ধ হবে। মূল কথা হলো নারীর নিশ্চিত হতে হবে যে সে হায়েজ থেকে মুক্ত হয়েছে। দেখা যায় অনেক নারী মনে করে যে তার হায়েজ বন্ধ হয়েছে অথচ তা বন্ধ হয়নি। তাই তো সাহাবায়ে কিরামের যুগে অনেক নারী আয়েশা (রা)-এর কাছে কাপড়ের টুকরা নিয়ে এসে তাকে দেখাতেন যে তারা হায়েজ থেকে মুক্ত হয়েছেন কিনা। তিনি তাদের বলতেন–

لَا تَعْجِلْنَ حَتّٰى تَرِيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ .

তোমরা তাড়াহুড়া করে হায়েজ বন্ধ হয়েছে মনে করো না, যতক্ষণ না সাদা পানি দেখ।"

অতএব তাড়াহুড়া না করে নারীদের নিশ্চিত হতে হবে যে তার হায়েজ এ মেয়াদের জন্য একেবারে বন্ধ হয়েছে কিনা। যখন সে নিশ্চিত হবে তখন সাওমের নিয়ত করবে। যদিও সে গোসল ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর করে তাতে সাওমের নিয়ত করতে অসুবিধা নেই।

কিন্তু সাথে সাথে তাকে সালাতের বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। ফজরের সালাত ওয়াক্তমত আদায় করার জন্য তাড়াতাড়ি গোসল করবে। কোনো কোনো নারীকে দেখা যায় তারা ফজরের ওয়াক্তের মধ্যে হায়েজ মুক্ত হয় কিন্তু ভালোভাবে গোসল করার অজুহাতে সে সূর্য উদয়ের পর গোসল করে, এ রকম করা ঠিক নয়। কেননা তার জন্য ওয়াজিব হলো তাড়াতাড়ি গোসল করে ফজরের সালাত ওয়াক্ত মতো আদায় করা।

এমনিভাবে যার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে তার মাসয়ালাও অনুরূপ। সে যদি ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর গোসল করে তাতে সিয়ামের নিয়ত করতে কোনো অসুবিধা হবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–১৩

মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা আদায় করা

প্রশ্ন : মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কাযা রোযা আদায় করা কী যাবে?

উত্তর : মৃতব্যক্তির কাজা রোযাসমূহ তার ওয়ারিসদের আদায় করে দেয়া উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে আর তার ওপর ফরয রোযা অবশিষ্ট থাকলে তখন তার ওয়ারিসগণ কাজা আদায় করে দিবে।" (বুখারী, মুসলিম)

ফতোয়া–১৪

প্রশ্ন : থু থু গিলে ফেলার বিধান কী? রোযা পালনরত অবস্থায় যদি থু থু গিলে ফেলে তাতে অসুবিধা আছে কিনা?

উত্তর : রোযা পালনকারী যদি মুখে অবস্থিত থু থু গিলে ফেলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর এ মাসআলায় উলামাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই। কেননা বার বার থু থু ফেলা যেমন কষ্টকর তেমনি থু থু না গিলে থাকাও সম্ভব নয়।

কিন্তু কাশি ও শ্লেষ্মা যদি মুখে এসে যায় তবে তা ফেলে দিতে হবে। সিয়াম সাধনা অবস্থায় তা গিলে ফেলা না জায়েয। কেননা কাশি ও শ্লেষ্মা থুথুর মতো নয়। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–১৫

রোযা পালনকারীর মিসওয়াক ও টুথ পেস্ট ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : রোযা পালনকারী কী রমযানের দিনের বেলায় টুথ পেস্ট বা টুথ পাউডার ব্যবহার করতে পারবেন?

উত্তর : যদি গলার মধ্যে না যায় তবে টুথ পেস্ট ও পাউডার ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। এমনিভাবে দিনের শুরুতে ও শেষে যে কোনো সময়ে মিসওয়াক করতে কোন অসুবিধা নেই।

কতিপয় আলেম দুপুরের পর মিসওয়াক করাকে মাকরূহ বলেছেন। অবশ্য এ মত শুদ্ধ নয়। সঠিক কথা হলো যে কোন সময় মিসওয়াক করা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক সম্পর্কে যা বলেছেন তা "আম" অর্থাৎ ব্যাপক। তিনি বলেছেন–

اَلسِّوَاكُ مُطَهِّرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ـ

মিসওয়াক মুখকে পবিত্র ও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। (নাসায়ী, আয়েশা (রা) থেকে)

তিনি আরো বলেছেন–

لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ـ

যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তা হলে আমি প্রত্যেক সালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী ও মুসলিম)

আর এ হাদীস জোহর ও আছরের সালাতকেও শামিল করে। কারণ এ দু সালাত দুপুরের পরেই হয়ে থাকে।

ফতোয়া–১৬

গর্ভবতী ও শিশুকে দুধ দানকারী নারীর রোযা না রাখা

পশ্ন : গর্ভবতী নারী কী রমযানে সিয়াম থেকে বিরত থাকতে পারে?

উত্তর : গর্ভবতী মহিলা দুঅবস্থার যে কোন এক অবস্থা থাকবে। হয়তো সে শক্তিশালী হবে। রোযার কারণে তার কষ্ট হবে না ও গর্ভস্থিত বাচ্চার ওপর তার প্রভাব পড়বে না। এমতাবস্থায় তার রোযা পালন করতে হবে।

আর যদি সে দুর্বল হয়। রোযা রাখল সে বরদাশত করতে পারবে না বলে মনে হয় তা হলে সে রোযা আদায় করবে না। সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে রোযা ছেড়ে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব হবে। সন্তান প্রসবের পর সে কাজা আদায় করবে। রোযা পালন করলে অনেক সময় বাচ্চাকে দুধ পান করানোর সমস্যা দেখা দেয়। কেননা দুগ্ধ দানকারী মায়ের খাবার-দাবার গ্রহণের দরকার। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে যখন দিন বড় হয়ে থাকে। তখন সে সিয়াম বর্জন করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। অন্যথায় তার বাচ্চার ক্ষতি হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় আমরা তাকে বলব আপনি রোযা থেকে বিরত থাকুন। যখন আপনি সমস্যা মুক্ত হবেন তখন কাজা আদায় করবেন। কোনো কোনো আলেম বলেছেন গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারী নারী রোযা থেকে বিরত থাকতে পারেন যখন রোযার কারণে বাচ্চার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হয়, নিজের ক্ষতির কারণে নয়। তাই তার জন্য ওয়াজিব হবে কাজা আদায় করা ও কাফ্‌ফারা। তবে কাফ্‌ফারা ঐ ব্যক্তি আদায় করবেন যার দায়িত্বে রয়েছে এ সন্তানের ভরণ-পোষণ। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো কাফ্‌ফারা আদায়ের দরকার হবে না।

আর যে ব্যক্তি অন্য কাউকে পানি বা আগুন থেকে উদ্ধার করার জন্য সাওম ভঙ্গ করেছে তার বিধানও ঐ নারীর মতো যে তার বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কায় রোযা থেকে বিরত থাকল অর্থাৎ সে সাওম থেকে বিরত থাকবে ও পরে কাজা আদায় করবে।

উদাহরণ : আপনি দেখলেন একটি ঘরে আগুন লেগেছে। সে ঘরের ভিতর মুসলমানগণ আছেন তখন তাদের উদ্ধার করার জন্য রোযা ভঙ্গ করে খাবার গ্রহণ করে শক্তি অর্জন করত তাদের উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। এটা শুধু জায়েয নয় বরং ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–১৭

রোযার উদ্দেশ্যে মাসিক বন্ধের জন্য ট্যাবলেট খাওয়া

প্রশ্ন : রমযানে রোযা পালনের উদ্দেশ্যে ট্যাবলেট ইত্যাদি খেয়ে মাসিক বন্ধ রাখা জায়েয কিনা?

উত্তর : রমযানে রোযা যেন ছেড়ে দিতে না হয় এ উদ্দেশ্যে মাসিক (হায়েজ) বন্ধ রাখার জন্য ঔষধ গ্রহণ করা নারীদের জন্য জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো সৎ-নেককার চিকিৎসকের দ্বারা জেনে নিতে হবে যে এটা তার স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি করবে না এবং তার জরায়ুতে কোনো প্রতিক্রিয়া বা সমস্যা সৃষ্টি করবে না।

কিন্তু এ জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা উত্তম। যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রোযা থেকে বিরত থেকে অন্য সময় আদায় করার অবকাশ দিয়েছেন তখন তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করাই উত্তম। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–১৮

না জেনে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর খাবার গ্রহণ করার হুকুম

প্রশ্ন : আমি সাহারী খাওয়ার জন্য জাগ্রত হয়ে পানি পান করলাম। তারপর দেখলাম বেশ আগেই ফজরের সময় হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমার সাওম বাতিল হবে কিনা?

উত্তর : ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে অথচ আপনি এখনও সাহারীর সময় আছে মনে করে পানাহার করেছেন। এ অবস্থায় আপনার কোনো পাপ হবে না এবং সাওমের কাজা ও আদায় করা প্রয়োজন হবে না।

কেননা কুরআন ও হাদীসের অনেক প্রমাণাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, মানুষের ভুলে যাওয়া ও অবগতি না থাকার কারণে শাস্তি দেয়া হবে না।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ۔

যে ব্যক্তি ভুলে গেল যে আমি রোযা অবস্থায় আছি অতঃপর খাওয়া-দাওয়া করল সে যেন তার সাওম অব্যাহত রেখে পূর্ণ করে (ভেঙে না ফেলে)। কেননা আল্লাহ তা আলা তাকে আহার করিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–১৯

রোযা ভঙ্গ করার নিয়ত করে সাওম ভঙ্গ করা

প্রশ্ন : অনেকে বলে থাকেন যে রোযা ভঙ্গ করার নিয়ত করল সে সাওম ভঙ্গ করে ফেলল। এটা কি সঠিক?

উত্তর : হ্যাঁ এটা সঠিক, যে রোযা ভঙ্গের নিয়ত করল সে যেন তার সাওম ভেঙে ফেলল। কারণ সাওম দুটি মৌলিক বিষয় দ্বারা গঠিত।

প্রথম বিষয় নিয়ত। দ্বিতীয় বিষয় হলো সাওম ভঙ্গ করে এমন সকল বিষয় থেকে বিরত থাকা। যখন সাওম ভঙ্গের নিয়ত করল তখন প্রথম বিষয়টি চলে গেল। আর এ নিয়তটিই তো ছিল ইবাদতের মধ্যে অধিক প্রয়োজনীয়। কেননা সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।

যেমন আমরা বললাম 'তার রোযা ভেঙে ফেলল' এ কথার অর্থ হলো সে নিজে সাওম না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও সে খাওয়া-দাওয়া বা এমন কোনো কাজ করেনি যা সাওম ভঙ্গ করে। যদি কোনো ব্যক্তি নফল সাওম পালন অবস্থায় নিয়ত করল সে সাওম ভঙ্গ করে ফেলবে, এরপর খাওয়া-দাওয়া বা সাওম ভঙ্গকারী কিছু করার আগে নিয়ত পরিবর্তন করল অর্থাৎ নফলের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না।

কিন্তু ফরজের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। এজন্য সে ফরজ সাওমের জন্য শর্ত হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন নিয়তসহ কাটানো। কিন্তু নফলের বিষয়টা এ রকম নয়। বিষয় দুটির পার্থক্য ভালোভাবে বুঝার জন্য ছোট একটা ভূমিকার অবতারণা করছি : যে কোনো ইবাদতের নিয়ত ভেঙে ফেলা দু'ধরনের।

১. কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ত ত্যাগ করলে বা ভেঙে ফেললে কোন অসুবিধা হয় না। এটা হলো ইবাদতটা শুরু করার পর। যেমন কেহ সালাত অথবা সাওম বা হজ অথবা যাকাত আদায় করার পর নিয়ত ছেড়ে দিল। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা বিষয়টা তার স্থানে চলে গেছে। এমনিভাবে কেহ পবিত্রতা অর্জন করার পর তার নিয়ত ছেড়ে দিল, তাতে তার তাহারাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

২. কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ত পরিত্যাগ করলে ইবাদতটা বিশুদ্ধ হয় না। যেমন আপনি ইবাদতেরত থাকা অবস্থায় তার নিয়ত পরিত্যাগ করে ফেললেন। আপনি সালাতে থাকাকালীন তার নিয়ত ত্যাগ করলেন। অথবা সাওমে বা অজু করা অবস্থায় নিয়ত ছেড়ে দিলেন। এ সকল ক্ষেত্রে ইবাদত বিশুদ্ধ হবে না।

এ দু'অবস্থার পার্থক্য যখন বুঝে আসবে তখন বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–২০

রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রীকে চুম্বন ও আলিঙ্গন

প্রশ্ন : যদি কোনো পুরুষ রমযানে দিনের বেলা তার স্ত্রীকে চুমো দেয় বা আলিঙ্গন করে তা হলে তার সাওম কী নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর : যদি সাওম অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাস ছাড়া চুমো দেয় বা আলিঙ্গন করে তবে তা জায়েয। এতে সাওমের কোন অসুবিধা হয় না। কেননা নবী করীম ﷺ সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দিতেন ও আলিঙ্গন করতেন। তবে এতে যদি সহবাসে লিপ্ত হয়ে পরার সম্ভাবনা থাকে তবে তা মাকরূহ হবে। আর চুমো বা আলিঙ্গনের কারণে যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তবে দিনের অবশিষ্ট অংশ সাওম অবস্থায় থেকে পরে সাওমের কাজা আদায় করবে। কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। এটা বেশিরভাগ আলেমদের অভিমত। চুমো বা আলিঙ্গনের কারণে যদি মজী বের হয় তবে এতে সাওমের কোনো ক্ষতি করে না। এটা অধিকতর বিশুদ্ধ মত। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–২১

রোযা কাযা করা

প্রশ্ন : কোন কোন অবস্থায় রোযা কাজা করা আবশ্যক?

উত্তর : যে সকল বিষয়ে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে যথা–অসুস্থতা, ভ্রমণ, বার্ধক্য, জিহাদ আর নারীদের বিষয়ে গর্ভ, স্তন্যদান ইত্যাদি কারণসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি মনের আবেগে রোযা রাখে। কিন্তু তা পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলা উত্তম। এমতাবস্থায় সে পরে শুধু কাজা আদায় করবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضى) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَرَاٰى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَاهٰذَا؟ فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمَ فِى السَّفَرِ ـ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সফরকালে একদা লোকজনের সমাগম দেখলেন, তাঁরা সবাই এক ব্যক্তির ওপর ছায়া করে আছে। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হলো, লোকজন বললেন, একজন রোযাদার। তারপর রাসূলে করীম ﷺ বললেন, সফররত অবস্থায় রোযা পালন নেকীর কাজ নয়।" (বুখারী)

ফতোয়া–২২

নাক, চোখ, কানে ঔষধ বা সুরমা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : নাকে চোখে ড্রপ ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার অথবা কানে ঔষধ ব্যবহার কী রোযা ভঙ্গ করে?

জওয়াব : নাকে দেয়া ঔষধ যদি পেটে পৌঁছে যায় অথবা গলায় চলে যায় তা হলে রোজা ভেঙে যায়।

লকীত ইবনে সাবুরা থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন–

بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ ـ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا ـ

তোমরা উত্তমরূপে পানি পৌঁছাও কিন্তু সাওম পালনরত অবস্থায় নয়।

অতএব সাওম পালনকারীর জন্য নাকে এমন ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয নেই যা গলা অথবা পেটে চলে যায়। যদি পেটে বা গলায় না যায় তবে অসুবিধা নেই।

আর চোখে বা কানে ঔষধ ব্যবহার করলে অথবা চোখে সুরমা ব্যবহার করলে সাওমের কোন ক্ষতি হয় না। কেননা এতে সাওম ভঙ্গের বিষয়ে কুরআন-হাদীসের কোন প্রমাণ নেই। চোখ বা কান দ্বারা কখনো খাদ্য গ্রহণ করা যায় না। চোখ, কান শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কেউ পা দ্বারা খাদ্য পিষে আর খাবারের স্বাদ সে মুখে অনুভব করে তবুও তার সাওম নষ্ট হবে না। কেননা পা দ্বারা খাবার গ্রহণ সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে চোখে কানে ঔষধ দিলে অথবা সুরমা ব্যবহার করলে তার স্বাদ যদি অনুভূত হয় তবে সাওম নষ্ট হবে না। এমনি যদি কেহ দেহে তেল ব্যবহার করে তার স্বাদ অনুভব করে তার সাওমের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–২৩

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা

প্রশ্ন : যে কিশোরের বয়স পনেরো বছর পর্যন্ত পৌছেনি তাকে কী রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হবে, যেমন তাকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে?

উত্তর : হ্যাঁ এ জাতীয় কিশোর-কিশোরীদের রোযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হবে, যদি তারা সিয়াম পালনের সামর্থ্য রাখে। আর সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদের সন্তানদেরকে সিয়াম সাধনার নির্দেশ দিতেন।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, অভিভাবক তার অধীন সকল অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সিয়াম আদায়ের নির্দেশ দিবেন। যাতে তারা শিশুকাল থেকে ইসলামী আচার-আকীদায় অভ্যস্ত হয়ে যায় ও এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। সিয়াম পালন যদি তাদের কষ্টের কারণ হয় তবে জোর-জবরদস্তি করবে না।

অনেক পিতা-মাতা স্নেহ ও আদরের বশবর্তী হয়ে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের রোজা থেকে বারণ করেন। এটা মোটেও উচিত নয়। কারণ এটা সাহাবায়ে কেরামের আমলের বিরোধী। সন্তানদের ইসলামী শরীয়তের অনুশীলন ও তাতে অভ্যস্ত করাই মূলত তাদের সত্যিকার স্নেহ ভালোবাসার দাবি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ الرَّجُلَ رَاعٍ فِىْ أَهْلِ بَيْتِهٖ، وَمَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ -

প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের জিম্মাদার ও তার অধীনস্থদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে। তাই পরিবারের কর্তার উচিত পরিবারের সকলকে আল্লাহর ভয় ও তাঁর বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দেয়া। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া-২৪

রোযা ভঙ্গকারী কারণগুলো সাওম ভঙ্গ করে না

প্রশ্ন : যদি দেখা যায় রমযানের দিনের বেলা কোনো সিয়াম পালনকারী ভুলে খাওয়া-দাওয়া করছে তখন কী তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে?

উত্তর : যদি কেহ দেখে রমযানে দিনের বেলায় কোন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি পানাহার করছে তখন তাকে সাওমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কেননা এটা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার (নাহী আনিল মুনকার) অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ.

তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় কাজ হতে দেখবে সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এর সামর্থ্য না রাখে তবে যেন মুখ দ্বারা বাধা দেয়। যদি এরও সামর্থ্য না রাখে তবে অন্তর দ্বারা।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিয়াম সাধনা অবস্থায় পানাহার করা একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু তার ভুলে যাওয়ার কারণে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত। কিন্তু যে দেখে বাধা না দেবে সে দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। অতএব সাওম পালনকারীকে কিছু খেতে দেখলে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

স্মরণ হওয়ার পর সাওম পালনকারীর উচিত হবে তাড়াতাড়ি খাওয়া বন্ধ করে দেয়া। সে এ ভুলকে খাওয়া-দাওয়া করার সুযোগ মনে করে তা যেন অব্যাহত না রাখে। যদি মুখে খাবার থাকে তবে তাড়াতাড়ি ফেলে দেবে। স্মরণ হওয়ার পর গিলে ফেলা জায়েয হবে না।

তাই বলছি তিনটি অবস্থায় সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তা সাওম ভঙ্গ করে না।

১. যখন সাওমের কথা ভুলে যায়।

২. যখন অজ্ঞ হয়ে যায়।

৩. যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে।

যদি রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে তবে তার সাওম পূর্ণ হতে কোনো অসুবিধা হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّهُ أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ .

যে রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে সে যেন তার সাওম অব্যাহত রাখে কারণ তাকে আল্লাহ তাআলা পানাহার করিয়েছেন।

"যখন অজ্ঞ হয়ে যায়"– এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন কেহ মনে করল এখনও ফজরের ওয়াক্ত হয়নি; সাহরী খেল। অথবা মনে করল সূর্য অস্ত গেছে অথচ তা অস্ত যায়নি; ইফতার করল। তাহলে তার সাওম বিশুদ্ধ হবে।

হাদীসে এসেছে সাহাবী আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন–

أَفْطَرْنَا فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে আমরা ইফতার করলাম। তারপর সূর্য দেখা গেল। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাওম কাজা করতে বলেননি। যদি কাজা করা ওয়াজিব হতো তবে তিনি অবশ্যই কাজা করতে আদেশ দিতেন। আর যদি আদেশ দিতেন তা অবশ্যই আমাদের নিকট পৌঁছে যেত। কেননা তিনি কোন কিছুর আদেশ করলে তা আল্লাহর শরীয়তে পরিণত হয়ে যায়, আর তার শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষিত ও সকলের নিকট পৌঁছে গেছে।

আর অনিচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করার দৃষ্টান্ত যেমন কেহ কুলি করার সময় পানি ভিতরে চলে গেল এতে রোযা ভাঙবে না, কেননা সে পান করার ইচ্ছা করেনি। অনুরূপভাবে কারো স্বপ্নদোষ হয়ে বীর্যপাত হলো এতে তার সাওমের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা সে নিদ্রায় ছিল, ইচ্ছা করেনি।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ .

তোমরা কোনো ভুল করলে কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর ইচ্ছা করলে অপরাধ হবে। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫)

ফতোয়া–২৫

এতেকাফ

প্রশ্ন : এতেকাফ কী মসজিদে করতে হবে?

উত্তর : পুরুষদেরকে মসজিদেই এতেকাফ করতে হবে। রমযান মাসে এতেকাফের জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। এতেকাফ অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার নামাযে অংশ নেয়া, স্ত্রী সহবাস করা, মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত এতেকাফের স্থান থেকে বাহিরে যাওয়া নিষেধ।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اَلسُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ اَنْ لاَ يَعُوْدَ مَرِيْضًا وَلاَ يَشْهَدُ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسُّ اِمْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرُهَا وَلاَ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ اِلاَّ لَمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اِعْتِكَافَ اِلاَّ فِىْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ -

আয়েশা (রা) বলেন : এতেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো সে যেন কোনো অসুস্থকে দেখতে না যায়, জানাযায় অংশগ্রহণ না করে, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তার সাথে সহবাস না করে এবং ইতেকাফের স্থান থেকে মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বের না হয়। রোযা ছাড়া ইতেকাফ হয় না। আর জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য স্থানে এতেকাফ হয় না। (আবু দাউদ)

নারীদের এতেকাফ করা চাই।

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ -

আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশ তারিখে এতেকাফ পালন করতেন। রাসূল ﷺ-এর পর তাঁর সহধর্মীনিরা এতেকাফ পালন করেন। (মুসলিম)

নারীরা নিজের গৃহে এতেকাফ আদায় করবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَتَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের জন্য তাদের ঘর মসজিদ থেকে অনেক উত্তম। (আবু দাউদ)

যদি কেউ দশ দিন এতেকাফ করতে না পারে, তাহলে যত দিন সম্ভব ততদিন এতেকাফ থাকবে। এমনকি শুধু এক রাত করলেও জায়েয হবে।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ عَمَرَ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ : اَوْفِ بِنَذْرِكَ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, উমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত এতেকাফ করার মান্নত করেছিলাম, তা কি পূর্ণ করতে হবে? নবী করীম ﷺ বললেন, মান্নত পূর্ণ কর। (বুখারী)

ফতোয়া–২৬

রমযানের দিনের বেলা ইচ্ছা করে বীর্যপাত করার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কেহ রমযানের দিনের বেলা ইচ্ছা করে বীর্যপাত করে তা হলে তার করণীয় কী? তাকে কি এ দিনের রোযার কাজা আদায় করতে হবে? যদি কাজা আদায় করার প্রয়োজন হয় কিন্তু সে পরবর্তী রমযান আসার আগেও কাজা আদায় করল না তা হলে তার বিধান কী?

উত্তর : প্রথমত: নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বীর্যপাত করা হারাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ـ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ـ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ـ

(মু'মিন তারা) যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। এদের ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। (সূরা আল মু'মিনুন : আয়াত-৫-৬)

আর এ জাতীয় কাজে দেহেরও ক্ষতি।

রমযানের দিনের বেলা কোন সাওম পালনকারী যদি এ জাতীয় কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে ফেলে তাহলে সে পাপী হবে। তার ঐ দিনের সাওম কাজা করতে হবে। কারণ বীর্যপাত করা সহবাসের মতোই।

বুখারীতে এসেছে আয়েশা (রা) বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ؛ وَكَانَ اَمْلَكَكُمْ لِاِرْبِهِ .

আল্লাহর রাসূল ﷺ সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দিতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য ছিলেন।

একথার দ্বারা অনুধাবন করা যায় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না রমযানের দিনের বেলা সাওম অবস্থায় তার চুমো দেয়া জায়েয নেই। চুমো দিতে গিয়ে কামাবেগে যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে সাওম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। কাজা আদায় ও তওবা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : যার ওপর রোযার কাজা ওয়াজিব সে পরবর্তী রমযান আসার পূর্বে যদি কাজা আদায় না করে তবে তার এ অলসতার জন্য তওবা ইস্তিগফার করতে হবে, কাজা আদায় করতে হবে ও প্রতিটি সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের এক জামায়াত এ ফতওয়া দিয়েছেন। একটি সাওমের কাফ্ফারা হলো অর্ধ সা খাদ্য যা বর্তমানে প্রায় এক কেজি পাঁচশো গ্রাম পরিমাণ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ফতোয়া–২৭

ঈদের সালাত বিলম্বে পড়া

প্রশ্ন : ঈদের সালাত বিলম্বে পড়া উত্তম নয় কী?

উত্তর : ঈদুল ফিতরের সালাতের ওয়াক্ত এশরাকের সালাতের সময় হয়।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضى) صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اُضْحٰى

فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ وَقَابَلَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন যে, তিনি লোকজনের সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার সালাতের জন্য ঈদগাহে গমন করেন এবং ইমামের দেরী করাকে অপছন্দ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমরা তো এ সময়ে সালাত পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম, তখন এশরাকের সময় ছিল। (আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

ঈদুল ফিতরে সালাত অপেক্ষা ঈদুল আযহার নামায তাড়াতাড়ি পড়া সুন্নাত। পক্ষান্তরে ঈদুল ফিতরের সালাত বিলম্বে পড়া সুন্নাত।

عَنْ اَبِى الْحُوَيْرِثِ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلٰى عَمْرِوبْنِ حِزَمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ عَجِّلَ الْاَضْحٰى وَاَخِّرَ الْفِطْرَ وَذَكَرَ النَّاسَ -

আবুল হুয়াইরিছ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানের গভর্ণর আমর ইবনে হাযম-এর প্রতি এ মর্মে প্রজ্ঞাপন জারী করলেন, ফিতরের নামায বিলম্বে পড় এবং লোকজনকে উপদেশ দাও। (শাফেয়ী)

ঈদগাহে আসা যাওয়ার সময়ে অধিক পরিমাণে তাকবীর বলা সুন্নাত।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ حَتّٰى يَاْتِىَ الْمُصَلّٰى ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلّٰى حَتّٰى اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيْرَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ঈদের দিন সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে গমন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌছার পরও তাকবীর বলতেন। যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন তখন ছেড়ে দিতেন। (শাফেয়ী)

মাসনূন তাকবীরের শব্দ নিম্নরূপ–

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

-আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আইয়্যামে তাশরীক' অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহজ্জে এ তাকবীর পড়তেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

(ইবনে আবি শায়বা)

ফতোয়া-২৮

এক দেশে রোযা রেখে অন্য দেশে ঈদ করা

প্রশ্ন : পৃথিবীর এক দেশে রোযা শুরু করে অন্য অন্য প্রান্তে গেলে তাদের সাথে কী ঈদ করবে?

উত্তর : রমযান মাসে একদেশ থেকে অন্য দেশে সফর করার পর যদি মুসাফিরের রোযার সংখ্যা উপস্থিত এলাকায় রমযান মাসের রোযার সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে বৃদ্ধি রোযাগুলো ছেড়ে দিবে অথবা নফলের নিয়ত করে রাখবে। আর যদি সংখ্যা কম হয়, তাহলে অপূর্ণ রোযাগুলো ঈদের পর পূর্ণ করে নিবে।

عَنْ كُرَيْتٍ مَوْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) اَنَّ اُمَّ الْفَضَلَ بَعَثَتْهُ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ . فَقَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلٰى رَمَضَانَ وَاَنَا بِالشَّامِ فَرَاَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فِىْ اٰخِرِ الشَّهْرِ فَسَاَلَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ (رضى) ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتٰى رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ؟ فَقُلْتُ رَاَيْنَاهُ فَلاَ نَزَالَ نَصُوْمُ حَتّٰى نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ اَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ اَفَلاَ نَكْتَفِىْ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامَهُ؟ فَقَالَ لاَ هٰكَذَا اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল ফদল বিনতে হারিছ তাঁকে সিরিয়ায় মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে নিলাম। আমি সিরিয়া থাকা

অবস্থায়ই রমযানের চাঁদ দেখা গেল। জুমার দিন সন্ধ্যায় আমি চাঁদ দেখলাম। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এবং চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন দিন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম, জুমার দিন আমি দেখেছি এবং লোকেরাও দেখেছে। তারা সাওম পালন করেছে এবং মুআবিয়া (রা)ও সাওম পালন করেছেন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম মু'আবিয়া (রা)-এর চাঁদ দেখা এবং তার রোযা রাখা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? তিনি বললেন, না যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"

(মুসলিম : ৪/২০, হাদীস নং-২৩৯৫, আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ)

ফতোয়া-২৯

সদকাতুল ফিতরের হিকমত

প্রশ্ন : সদকাতুল ফিতরে কী হিকমত বা কল্যাণ আছে? তার পরিমাণ কত? এবং কার ওপর ওয়াজিব?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। নারী, পুরুষ, ছোট, বড়, স্বাধীন, অধীন সকলের জন্য ওয়াজিব।

ঈদের দিনে যদি কোনো মুসলিম ও তার পরিবারবর্গের খাবারের চেয়ে এক সা (প্রায় ৩ কেজি) খাবার অতিরিক্ত থাকে, তা হলে তার ওপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়ে যায়।

একজন মুসলিম সে নিজের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে তেমনি নিজে যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে তাদের পক্ষ থেকেও আদায় করবে।

ফিতরার পরিমাণ হলো মাথাপিছু এক সা খেজুর অথবা এক সা আটা বা কিসমিস অথবা গম।

সকদাতুল ফিতর প্রবর্তনের রহস্য অনেক। আমরা যা দেখছি তা হলো-

১. সদকাতুল ফিতর শরীরের যাকাত।

২. এ দ্বারা দরিদ্র মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। ঈদে আনন্দ উপভোগে তাদের সাহায্য করা হয়। যাতে ধনী-দরিদ্র সকলে ঈদের আনন্দে শামিল হতে পারে।

নবী করীম ﷺ বলেছেন–

اَغْنُوْهُمْ عَنِ الْمَسْاَلَةِ فِى الْيَوْمِ .

এ দিনের জন্য তোমরা তাদের ধনী করে দাও।

৩. আল্লাহ্ তাআলা যে রোযা আদায়ের তাওফিক দিয়েছেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয় সদকাতুল ফিতর আদায় করে।

৪. যদি সিয়াম পালনে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে এর পূর্ণতার জন্য সদকাতুল ফিতরের ভূমিকা আছে।

ফতোয়া–৩০

নারীদের ঈদের সালাতে গমন

প্রশ্ন : ঈদুল ফিতরের জামায়াতে নারীদের অংশগ্রহণ জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয। বরং তাদের ঈদের জামায়াতে অংশগ্রহণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

সাহাবী উম্মে আতীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

أُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتَ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعَوْتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ، قَالَتْ اِمْرَاَةٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ : لَتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

আমাদের নারীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে নারীরা মুসলিমদের জামায়েত প্রত্যক্ষ করতে পারেন ও তাদের সাথে সালাতে অংশগ্রহণ করেন।

মাসিকগ্রস্ত নারীগণ ঈদগাহ থেকে দূরে থাকবে। এক নারী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের একজনের ওড়না নেই, সে কীভাবে যাবে? তিনি বললেন, "সে তাদের এক সাথীর ওড়না নিয়ে পরিধান করবে ও যাবে।

কিন্তু নারীরা সুগন্ধি ও চাকচিক্যময় বেশ-ভূষা এবং পুরুষদের সাথে একত্রিত হওয়া পরিহার করবেন। আল্লাহ্ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

৪. ঈদ ও ঈদ উদযাপন

রমযানের ঊনত্রিশ কিংবা ত্রিশ তারিখের সন্ধ্যা বেলায় পশ্চিম আকাশে যখন শাওয়ালের এক ফালি সরু চাঁদ ওঠে তখন মুসলিমদের মনে এক নতুন খুশির বান ডাকে। এ খুশি তারা কিভাবে উদযাপন করবে? অন্যান্য জাতির মতো রং তামাশায়? গান বাজনায়? আলোক সজ্জায়? লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতায়? আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়? এর উত্তর নিম্নে আলোচিত হলো।

মহানবী ﷺ মাক্কায় তের বছর থাকাকালীন সিয়াম ও ঈদের বিধান ছিল না। অতঃপর কাফিরদের অমানুষিক যুলম ও নির্যাতনে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় গিয়ে বিভিন্ন দিক সুবিন্যাস্ত করতে তাঁর একটি বছর কেটে যায়। এ সময় মুশরিকদের প্রাক– ইসলামী যুগের দু'টি পর্ব এসে যায়। তাতে মদীনার মুশরিকদের খুবই আনন্দ ও খুশী মানায় এবং যে যার ইচ্ছামত রং-তামাশা, গান-বাজনা ও লাগামহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় দিন কাটায়। ঐ সব আমোদ-প্রমোদ ও ফূর্তিবাজী দেখে মুসলিমদের বিশেষ করে বাপ-দাদার ভিটেমাটি ত্যাগকারী মুহাজিরদের মনটা কেমন হাহাকার করে উঠে। তাই মুসলিমদের খুশীর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুশরিকদের দু' পর্বের বদলে মুসলিমদের দুটি ঈদের ব্যবস্থা করে দেন। যেমন আনাস (রা) বলেন, প্রতি বছর মুশরিকদের জন্য দুটি দিন ছিল। যেদিন তারা খেল তামাশা করত। অতঃপর নবী ﷺ যখন মদীনায় আসেন তখন তিনি বলেন, তোমাদের দু'টি দিন ছিল। যেদিন তোমরা খেল-তামাশা করতে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঐ দুটি উৎসবকে তোমাদের খাতিরে উত্তম জিনিস দ্বারা বদলে দিয়েছেন। তা হলো ইয়াওমুল ফিতর ও ইয়াওমুল আযহা।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড ১৭৭ পৃষ্ঠা : আবু দাউদ ১ম খণ্ড ১৬১ পৃ: মিশকাত-১২৬পৃ.)

আরবি 'আইন, ওয়াও, দাল' আওদ ধাতু থেকে ঈদ শব্দটি গঠিত। ঈদ শব্দের অভিধানিক অর্থ যা বার বার ফিরে আসে। প্রতি বছরেই ইয়াওমুল ফিতর ও ইয়ামুল আযহা ফিরে আসে বলে ইসলামী শরীআতে ঐ দু'টি ঈদ নামে বিশেষিত করা হয়েছে। (মুফরাদ-তু গারাবিল কুরআন, ৩৫৮পৃ.)

ইসলামী ঈদের ধরণকরণ

রমযানের এক মাস সিয়াম পালনের নির্দেশ যিনি দিয়েছিলেন সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামী ঈদের ধরণকরণ সম্পর্কে বলেছেন :

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ـ

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ চান যে, তোমরা রমযানের গণনাগুলো পূর্ণ কর এবং আল্লাহ মাহাত্ম্য বর্ণনা কর যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এভাবেই হয়তো তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৫)

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রমযানের সিয়াম শেষ করে আল্লাহর নির্দেশিত প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তাঁর মহানত্ব বর্ণনা করা। তাঁর মহানত্ব বর্ণনার বিভিন্ন দিক হলো ঈদের রাতে নফল সালাত পড়া। তাকবীর ধ্বনি দ্বারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করা। ফিতরা আদায় করে গরিব ও মিসকীনদেরও ঐ খুশীতে শরীক করা। মাঠে গিয়ে দু'রাকআত সালাত পড়ে আল্লাহর সামনে মাথানত করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা প্রভৃতি কাজ করা। এবার উক্ত বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর কুরআনের সবচেয়ে বড় ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সমস্ত সিয়াম পালনকারীরই কর্তব্য যখন তারা শাওয়ালের মাস দেখবে তখন থেকেই তাকবীর দেবে যতক্ষণ না ঈদগাহ থেকে ফিরে আসে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, আলি তুকাববিরুল্লাহ-তোমরা আল্লাহর মহানত্ব বর্ণনা করবে। (ফাতহুল বায়ান ১ম খণ্ড ২৩৯পৃ.)

ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ মন্তব্যটি প্রমাণ করে যে, ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার পর থেকেই তাকবীর দেয়া শুরু করতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমদ (র)-এর একটি মতে রমযানের শেষ রাতে সূর্য ডোবার পর থেকে ঈদের সালাত শুরু হওয়া পর্যন্ত তাকবীর দিতে হবে। ইমাম আহমদের মতে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর চলবে। (আলমুগনী ২য় খণ্ড-২৬৯পৃ.)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (র)-এর মতে, তাকবীরের শুরু নতুন চাঁদ দেখা থেকে এবং শেষ হবে ইমামের খুৎবাহ শেষ করা পর্যন্ত। (ইখতিয়ারাতে ৪৯পৃ.)

কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ঈদুল ফিতরে তাকবীরের কোন বিধান নেই। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খণ্ড-২১৯ পৃ.)

আল্লামা যায়লায়ী হানাফী (র) বলেন, তাঁর (অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার) ঐ মতের সমর্থনে আমি কোন হাদীস পাইনি। তবে ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে ঈদুল আযহার মতো ঈদুল ফিতরেও তাকবীর দিতে হবে।

(নাসাবুর রায়াহ ২য় খণ্ড : ২০৯ পৃ.)

ভারতগৌরব আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন (সূরা বাকারার) উক্ত আয়াতটির ভাবার্থ এ যে, রমাযান শেষ হবার পরই ঐ দিন ও রাতে তাকবীর দেয়া শরীয়আত সম্মত। রমযান শেষ হওয়া থেকে ঈদের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত খুব বেশি তাকবীর দেয়ার হুকুম আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। তাই ঘরে ও পথে, মসজিদে ও বাজারগুলোতে সালাতের পরই উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দেয়া উচিত। কারণ, হানাফীরা বলেছেন যে, ঈদুল ফিতরে তাকবীর নেই– কিন্তু এ দুর্বল বান্দাহ বলে যে, ঈদ হচ্ছে ইসলামেরই একটি বিশেষ নিদর্শন। ইসলামের ঐ নিদর্শনাবলির প্রকাশ অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এ জন্যই সালাত জামাআত সহকারে পড়া শরয়ী বিধান। অতএব ঈদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়াটাও শরীআত সম্মত হবে। (মুওয়াত্তার ফারসী শারহ মুসাফফা ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃ.)

অধিকাংশ আলিমের মতে ঈদের রাতে তাকবীর দিতে হবে না। তবে ইদগাহে যাবার সময় তাকবীর দিতে দিতে যেতে হবে। সাহাবীদের মধ্যে আলী, ইবনে উমার ও আবু উমামাহ এবং উমার ইবনে আব্দুল 'আযীয, সা'ঈদ ইবনে যুবাইর, নাখয়ী, আবুয যিনাদ, আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ, এবং হাম্মাদ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও ইমাম আওযায়ী প্রমুখের অভিমত তাই। (শারহে মুহাযযাব ৫ম খণ্ড-৭৪১ পৃ. আলতিসাম লাহোর, ২৬ রমাযান-৩শাওয়াল, ১৪০৮ হিজরী সংখ্যা)

এ মতের সমর্থনে দুটি হাদীসও পাওয়া যায়। যেমন ইবনে উমার (রা) যখন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিতে দিতে ঈদগাহে পৌঁছতেন। তারপরও তিনি ইমাম না আসা পর্যন্ত তাকবীর দিতে থাকতেন। (দারাকুতনী ১৮০পৃ. বায়হাকী ৩য় খণ্ড ২৭৯ পৃ.)

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও একটি হাদীস পাওয়া যায়। কিন্তু এটির সূত্র দুর্বল। (মুস্তাদরাকে হাকিম ১ম খণ্ড ২৯৮পৃ.)

একটি দুর্বল সূত্রের হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেন, তোমরা তাকবীর দ্বারা তোমাদের ঈদগুলোকে সৌন্দর্য দান কর। (তাবারানী সাগীর ও আওসাত, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড- ১৯৭. পৃ. কানযুল উমমাল ৮ম খণ্ড- ৩৪৩ পৃ.)

উক্ত সমস্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের সবারই উচিত দু' ঈদের সময়ে পথে-ঘাটে খুব বেশি করে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পড়া এবং ঈদগুলোকে সুশোভিত করে তোলা। এ তাকবীরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইমাম ইবনে হাযম (র) বলেন, সূরা বাকারার (পূর্বোক্ত) আয়াতটির ভিত্তিতে ঈদুল ফিতরের (চাঁদ) রাতে তাকবীর দেয়া ফরয। মাত্র একবারও তাকবীর দিলে ঐ ফরয আদায় হয়ে যাবে।

(আল মুহাল্লা ৫ম খণ্ড-৮৯পৃ.)

তাকবীরের শব্দসমূহ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সময় এ তাকবীর দিতেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰه اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

ইমাম নববী (র) বলেন, দারাকুতনীর এ হাদীসের সূত্রগুলো দুর্বল।

(শারহুন নিকায়াহ ১ম খণ্ড-১৩০ পৃ.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আরাফার দিনে ফজরের সালাত থেকে ইয়াওমুন নাহরে আসরের সালাত পর্যন্ত উক্ত শব্দগুলো সহকারে তাকবীর দিতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবার ২য় খণ্ড-১৬৫পৃ.)

আল্লামা যায়লায়ী (র) বলেন, এ হাদীসের সূত্র উত্তম।

(নাসবুর রায়াহ, ২য় খণ্ড-২২৪ পৃ.)

ইবনে আববাস (রা) তাকবীরে এ শব্দগুলো বলতেন, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা আল্লাহু আকবার ওয়া আজাল্ল, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খণ্ড- ১৬৭ ও ১৬৮পৃ.)

আর এক সাহাবী ইবনে মুগাফফাল (রা) ঈদগাহে রওয়ানা হবার সময় বলতেন : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ২য় খণ্ড-১৬৭ ও ১৬৮পৃ.)

ঈদের সালাতের আগে করণীয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের দিনে গোসল করতেন। (ইবনে মাজাহ ৯৪ পৃ.)

তারপর তিনি সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরতেন। কখনো তিনি সবুজ রংয়ের চাদর পরতেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড-১৭৮ পৃ.)

আবার কখনো লাল ফুলের বুটি দেয়া চাদর পরতেন।

(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড-১২১ পৃ.)

জাবির (রা) বলেন, দু' ঈদে ও জুমু'আতে নবী ﷺ তাঁর লাল বুটি দেয়া বিশেষ চাদরটি পড়তেন। (ইবনে খুযাইমাহ, নায়লুল আওতার ৩য় খণ্ড-১৬৬ পৃ.)

প্রত্যেক ঈদে তিনি এক বিশেষ ইয়ামানী চাদর পরতেন। (কিতাবুল উম্ম ২০৬ পৃ.)

তারপর তিনি সর্বোত্তম খুশবু লাগাতেন। (হাকিম, ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড-২২১ পৃ.)

তিনি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদুল ফিতরের জন্য সকালে ঘর থেকে বের হতেন।

(বুখারী ১৩০ পৃ.)

এবং ঈদুল আযহার দিনে সালাত না পড়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড-৭১ পৃ. ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬ পৃ.)

আলী (রা) বলেন, সুন্নাত হলো ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড- খণ্ড-৬৯ পৃ:, বুলুগুল মারাম ৩৫পৃ.)

তাই তিনি হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং হেঁটেই বাড়ি ফিরতেন। (ইবনে মাজাহ ৯৩)

তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অপর রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

(ইবনে খুযাইমাহ ২য় খণ্ড, ৩৪৩পৃ.)

এবং ঘর থেকে ঈদগাহ পর্যন্ত তিনি তাকবীর দিতে দিতে যেতেন।

(হাকিম, তালখীসুল হাবীর, ১৪২ পৃ.)

ঈদের সালাতের সময়

হাসান ইবনে আহমদ আল বান্না কিতাবুল আযাহীতে বর্ণনা করেছেন, জুনদুব বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিতরের সালাত পড়েন তখন সূর্য দু'বল্লম উপরে ছিল এবং সূর্য এক বল্লম উপরে থাকাকালীন ঈদুল আযহা পড়ান। (তালখীসুল হাবীব ১৪৪ পৃ.)

সে যুগে ঘড়ি আবিষ্কৃত না হওয়ায় সাহাবীগণ একটা অনুমান করে এক ও দুই বল্লমের কথা বলে সময়টা বোঝাতে চেয়েছেন। অন্য এক সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে

বুসর (রা) একদা ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহা পড়তে বের হন। অত:পর ইমাম সাহেব দেরী করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন, এ সময়েই আমরা (রাসূলুল্লাহর যুগে) সালাত পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম। এটা হলো ইশরাকের সময়। (মুসনাদে আহমদ, আবু দউদ ১ম খণ্ড-১৬১ পৃ, ইবনে মাজাহ ৯৪ পৃ. হাকিম ১ম খণ্ড-২৯৫ পৃ, ও বায়হাকী, মিরআত ২য় খণ্ড-৩৪৫ পৃ.)

শাইখুল হাদীস মাও: ইউনুস (র) বলেন, সূর্যোদয়ের পর থেকে এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ইশরাকের ওয়াক্ত। (দস্তরুল মুত্তাকী ১৪২ পৃ.)

অর্থাৎ আনুমানিক সোয়া ঘণ্টা। সুতরাং সব হাদীসগুলো একত্রিত করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সুর্যোদয়ের পর দেড় ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল আযহার এবং আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ঈদুল ফিতর পড়া উত্তম। যদিও এ সালাত হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীদের মতে সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পর থেকে মাথার উপর হতে পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ার আগে পর্যন্ত পড়া চলে। আহলে হাদীসদের মতও তাই। তবে সময় পার করে পড়ার ব্যাপারে সবারই মতে আপত্তিকর। অনেক গ্রামাঞ্চলে চাঁদের খবর সঠিক সময়ে পেয়েও ঈদুল ফিতরের সালাত বেলা ১০/১১ টায় পড়া হয়। এটা সুন্নাত নয়। তবে হ্যাঁ, চাঁদের খবর দেরীতে পাওয়ার কারণে যদি সাওয়ালের আগে পর্যন্ত ঈদুল ফিতর পড়া সম্ভব হয় তাহলে দেরী করে পড়াতে আপত্তি নেই। কিন্তু যাওয়ালের আগে সম্ভব না হলে অথবা চাঁদের খবর যদি দুপুরের পর পাওয়া যায় তাহলে তখনই সিয়াম ভেঙ্গে ফেলে পরের দিন সকালে সালাত পড়তে হবে।

(আবু দাউদ ১ম খণ্ড -৩১৯ পৃ.)

ঈদের সালাতের জায়গা

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন। (বুখারী, ১৩১ পৃ. মুসলিম ১ম খণ্ড-২৯০ পৃ. মিশকাত ১২৫ পৃ.)

আবূ হুরায়রাহ (রা) বলেন, একবার বৃষ্টি হওয়ায় নবী সবাইকে নিয়ে মসজিদে ঈদের সালাত পড়েন।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড-১৬৪ পৃ. ইবনে মাজাহ-৯৪ পৃ, মিশকাত-১২৬ পৃ.)

উক্ত দু'টি হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন এক মাঠেই ঈদের সালাত পড়া উত্তম ও সুন্নাত। তবে বৃষ্টি হলে এবং মাঠে সালাত পড়া সম্ভব না হলে মসজিদে ঈদের সালাত পড়া যাবে। হানাফী, মালিকী, হাম্বলী ও আহলে হাদীসের অভিমত তাই। কিন্তু শাফি'ঈদের মতে ঈদের সালাত মসজিদে পড়া মাঠের চেয়েও উত্তম।

(মিরকাত ২য় খণ্ড-৩২৭ পৃ.)

মদীনার পূর্বদিকে মাসজিদে নববী থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঈদগাহ ছিল এক হাজার হাত দূরে। 'উমর ইবনে শিবহ আখবারে মদীনাতে এ বর্ণনা দিয়েছেন।
(ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড-২১৭পৃ.)

একবার ছাড়া আজীবন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ঈদগাহে ঈদের সালাত পড়েছেন।
(যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড-১২১ পৃ.)

ঈদের সালাতে আযান ও ইকামত নেই

জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কয়েকবার দু' ঈদের সালাত পড়েছি বিনা আযানে ও বিনা ইকামতে।
(মুসলিম ১ম খণ্ড-২৮৯ পৃ. মিশকাত ১২৫ পৃ. বুখারী ১৩১ পৃ. নাসায়ী ১ম খণ্ড-১৭৭পৃ.)

ঈদের সালাতের প্রকারভেদ

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ ঈদের দিনে দু' রাকআত সালাত পড়েন। তার আগে এবং পরে কোন সালাতেই তিনি পড়েননি।
(সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদে আহমদ, বুলূগুল মারাম-৩৫ পৃ.)

একদা ওয়াসিলাহ ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে বলেন,

تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ ـ

উচ্চারণ : তাকাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা।

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের এবং আপনার তরফ থেকে ঈদকে কবুল করুন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ তাকাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা। (ইবনে আদী)

হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীসটি য'ঈফ। তবে অন্য একটি হাসান সূত্রে যুবায়ের ইবনে নুফায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন ঈদের দিনে সাক্ষাত করতেন তখন একে অপরকে বলতেন- তাকাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা। (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড-৪৪৬পৃ.)

তাবারানী কাবীরেও একটি য'ঈফ হাদীস আছে তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা বলার। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ-২য় খণ্ড, ২০৬ পৃ.)

মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ বলেন, একদা আমি আবূ ওমামাহ বাহেলী প্রমুখ সাহাবীদের সাথে ছিলাম। তারা যখন ঈদের সালাত পড়ে ফিরছিলেন তখন একে অপরকে বলছিলেন : তাকাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়া মিনকা। ইমাম আহমদ বলেন, এ হাদীসটির সূত্র উত্তম। (মুগনী ২য় খণ্ড-৩৯৯ পৃ.)

ঈদের সালাতের তরীকা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ঈদগাহে যাবার সময় একটা লাঠি বা বল্লম বয়ে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সালাত শুরুর আগে সেটা তাঁর সামনে সুতরা হিসেবে গেড়ে দেয়া হতো। (বুখারী ১৩৩ পৃ.)

অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধতেন। তারপর তিনি সানা পড়তেন। (ইবনে খুযায়মা)

এরপর তিনি পরপর সাতটি তাকবীর দিতেন। প্রতি দু' তাকবীরের মাঝখানে তিনি একটু করে চুপ থাকতেন। এ চুপ থাকার মাঝে তিনি কোন বিশেষ যিকর করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবনে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অত্যধিক পাবন্দির কারণে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু' হাত তুলতেন এবং প্রত্যেক তাকবীরের পর হাত বাঁধতেন। (বায়হাকী)

এভাবে সাতটি তাকবীর বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহা পড়তেন, তারপর সূরা কা-ফ, কিংবা সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা পড়তেন। অতঃপর তিনি রুকু ও সিজদাহ করতেন।

এভাবে প্রথম রাকআত সম্পূর্ণ করার পর সিজদা থেকে উঠে তিনি পরপর পাঁচটি তাকবীর দিতেন। তারপর সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা কামার কিংবা সূরা গাশিয়াহ পড়তেন। অতঃপর তিনি রুকু ও সিজদা করে দু'রাকআত সালাত শেষ করতেন। সালাম ফিরার পর তিনি একটি তীরের উপর ভর দিয়ে যমীনে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। তখন ঈদগাহে কোন মিম্বর নিয়ে যাওয়া হতো না। তারপর দু'আ করে শেষ করে দিতেন। (যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড-১২১-১২২ পৃ.)

ঈদের সালাতে সুন্নাতী কিরাআত

নু'মান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের ও জুমু'আতে সূরা সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা (সূরা আ'লা) ও হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ (সূরা গাশিয়া) পড়তেন। আর যখনই ঈদ ও জুমু'আ এক দিনে পড়তো তখনও তিনি ঐ সূরা দু'টিকে উক্ত দুই সালাতেই পড়তেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড-২৮৮ পৃ.)

আবু আকিদ লাইসী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনে সূরা কাফ ও সূরা কামার পড়তেন।

(মুসলিম ১ম খণ্ড ২৯১ পৃ : আবু দাউদ ১ম খণ্ড-৬২ পৃ : মিশকাত -৮০পৃ.)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, ইবনে আব্বাস(রা) বলেন, নবী ﷺ দু ঈদের সালাতে আম্মা ইয়াতাসাআলুন এবং ওয়াশ শামসে ওযোহাহা পড়তেন।

(মুসনাদে বাযযার, নায়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড ১৮০পৃ.)

আর এক হাদীসে আছে, আবু বকর (রা) একবার ঈদর দিনে সূরা বাকারাহ পড়েন। (ইবনে আবী শাইবাহ)

উক্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করার পর ইমাম শাওকানী (র) মন্তব্য করেন এ ব্যাপারে অধিকাংশ হাদীসে প্রমাণ করে যে, দু' ঈদে সূরা আলা ও সূরা গাশিয়াহ পড়া পছন্দনীয়।

ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমতও তাই। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে সূরা কাফ ও সূরা কামার পড়া বাঞ্ছনীয়। (নায়লুল আওতার, ৩য় খণ্ড ১৮০ পৃ.)

ইমাম আবু হানীফার (র)-এর মতে কোন খাস সূরা নির্দিষ্ট নেই।

(নায়লুল আওতার)

তাই যার যা ইচ্ছা সে তা পড়বে। আহলে হাদীসগণ বলেন, যে কেউ তার ইচ্ছা মতো সূরা পড়তে পারে, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পছন্দ অনুযায়ী বেশির ভাগ সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ এবং কখনো সূরা কাফ ও সূরা কামার পড়া উত্তম যাতে করে নবী ﷺ এর সুন্নাত পালনেও নেকী পাওয়া যায়।

নবী ﷺ দু ঈদের কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন। (মুসনাদে শাফি'ঈ, মিশকাত ১২৬ পৃ, তাবারানী আওসাত, কানযুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড ৪০৩ পৃ. মুহাল্লা ৬ষ্ঠ খণ্ড-পৃ.)

ঈদের সালাতে কতটি বাড়তি তাকবীর

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের সালাতে কিছু বাড়তি তাকবীর দিতেন। তার সংখ্যা ক'টি সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঐ বাড়তি তাকবীর ৬, ৯, ১২ এবং ১৩। এর মধ্যে ৯ (নয়) তাকবীর সংক্রান্ত তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসটির শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, ঐ হাদীসটি ইবনে মাসউদ (রা)-এর ব্যক্তিগত আমাল, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আমাল নয়।

মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত আব্দুর রহমান ইবনে আওফের হাদীসে ১৩ তাকবীরের যে রিওয়ায়াতটি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, ঐ হাদীসে ১২ তাকবীরে তাকবীরে তাহরীমাকেও গণ্য করা হয়েছে।

আবু দাউদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ও মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত হাদীসে আছে, আবু মূসা আশআরীকে একদা জিজ্ঞেস করা হয় যে, দু' ঈদের

সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তাকবীর কেমন ছিল? তিনি বলেন জানাযার মতো চার তাকবীর। (আওনুল মামুদ ১ম খণ্ড-৪৪৭ পৃ.)

এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তাকবীরে তাহরীমাসহ প্রথম রাকআতে কিরাআতের আগে ৪ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের পরে রুকুর তাকবীরসহ ৪ তাকবীর। অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর বাদ দিয়ে বাড়তি তাকবীর হয় ৬ তাকবীর। এটাই ইমাম আবূ হানীফার অভিমত। এ হাদীস দ্বারা কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রথম রাকআতে তাকবীর কিরাআতের আগে হবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের পরে হবে।

মুহাদ্দিসীনে কিরামের সবাই বলেন, উক্ত তিনটি রিওয়ায়াতের সনদে অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। বিধায় সব বর্ণনাগুলোই য'ঈফ। তাছাড়া হানাফী জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ-গ্রন্থ হিদায়াতে আছে যে, ঐ ৬ তাকবীর ইবনে মাসউদের উক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমাল ১২ তাকবীর। কারণ, তিরমিযীতে ৫টি, আবু দাউদে ৪টি, ইবনে মাজাতে ৪টি, মুওয়াত্তা ইমাম মালিকে ২টি এবং বায়হাকী, মুসনাদে বাযযার, মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, দারাকুতনী, তাবারানী এবং হানাফীদের দুই হাদীসগ্রন্থ তাহাভী ও মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রভৃতি ১১টি হাদীস গ্রন্থে ২টিরও অধিক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ঈদের সালাতে ১ম রাকআতে কিরাআতের আগে সাত তাকবীর এবং ২য় রাকআতে কিরাআতের আগে পাঁচ তাকবীর মোট বার তাকবীর দিতেন। (তিরমিযী ১ম খণ্ড-৭০ পৃ. আবু দাউদ ১ম খণ্ড-১৬৩ পৃ. ইবনে মাজাহ-৯২ পৃ. দারাকুতনী, ১৮১ পৃ. তাহাভী ২য় খণ্ড-৩৩২ পৃ. মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ ১৪১ পৃ. মুওয়াত্তা মালিক ৬৩ পৃ.)

শাফি'ঈ, মালিকী, হাম্বলী ও আহলে হাদীসদের ফতওয়া তাই। ইমাম আবূ হানীফার দু' ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বার তাকবীরের ওপর আমাল করতেন। (রদ্দুল মুহতার-৬৬৪ পৃ.)

ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, বার তাকবীর সংক্রান্ত হাদীসটির সূত্র হাসান ও উত্তম। তিনি তাঁর 'ইলালে কুবরা' গ্রন্থে বলেন, আমি হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এর চেয়ে বেশি সহীহ আর কোন হাদীসই এ বিষয়ে নেই। (নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড-২১৭ পৃ, শারহুন নিকায়াহ ১ম খণ্ড-১২৯ পৃ.)

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র) বলেন, বার তাকবীরের বর্ণনাগুলো নবী ﷺ থেকে হাসান বা উত্তম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর বিরোধিতায় কোন শক্তিশালী

কিংবা দুর্বল হাদীসও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়নি। (আল মুগনী-২য় খণ্ড-৩৮১পৃ.)

আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) বলেন, হারামাইন বা মাক্কা-মাদীনাবাসীদের (বার তাকবীরের) 'আমলটাই প্রাধান্যযোগ্য।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ ২য় খণ্ড-৩১ পৃ.)

মুওয়াত্তা ইমাম মালিকের ফারসী ভাষ্যে তিনি বলেন, হারামাইনবাসীদের 'আমলটাই সঠিক। (মুসাফফা ১ম খণ্ড-১৭৮ পৃ.)

আল্লামা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (র) হানাফী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-এর বার তাকবীরের ওপর 'আমলটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত নয়, বরং তা হলো নবী ﷺ এরই নির্দেশ। যার ওপর 'আমল অপরিহার্য। (আততালীকুল মুমাজ্জাদ-১৪১ পৃ.)

তাকবীরগুলোর গুরুত্ব

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে বাড়তি তাকবীরগুলো বলা ওয়াজিব। সুতরাং যদি কেউ এ তাকবীর ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা এ তাকবীরগুলো বলা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। তাই অধিকাংশ ওলামার মতে এটা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। এটা ভুল করে কিংবা ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলেও সালাত বাতিল হবে না। ইবনে কুদামাহ বলেন, এ ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই।

(আল মুগনী ২য় খণ্ড-৩২৩ পৃ., নায়লুল আওতার-৩য় খণ্ড-১৮৬ পৃ.)

তাকবীরগুলোর মাঝে দু' হাত তোলার বিধান

এ ব্যাপারে ইমাম নাযীর হুসাইন দেহলভী (র) বলেন, কোন মারফূ' হাদীস দ্বারা জানা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদের তাকবীরগুলোর মাঝে দু' হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলেছিলেন। সেজন্য হাত না তোলাই উচিত।

(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১ম খণ্ড ২১৬ পৃ.)

উমার (রা) জানাযা ও ঈদের (সালাত) প্রত্যেক তাকবীরে দু' হাত তুলতেন।

(বাইহাকী ৩য় খণ্ড-২৯৩ পৃ.)

তাই আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (র) বলেন, তা তোলা উচিত।

(ফাতাওয়া সানায়িয়্যাহ, ১ম খণ্ড, ৩২৭ পৃ.)

তবে আমার বুখারীর রসমী ওস্তাদ (২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ বুধবার সকার ৬ টায় আমি এবং আল্লামার পুত্র মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব তাদের ইউ. পি.

আযমগড় জিলার মোবারকপুর শহরের বাড়িতে বুখারীর দু'টি হাদীস পড়ে আল্লামা রহমানী সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হই– আলহামদুলিল্লাহ আলা যা-লিক। –লেখক) শাইখুল হাদীস আল্লামা ওবায়দুল্লাহ রহমানী সাহেব বলেন, এ ব্যাপারে সহীহ মারফূ হাদীসের কোন প্রমাণ নেই বলে আমার মতে হাত না তোলা উত্তম। কিন্তু কেউ যদি 'উমার, ইবনে 'উমার ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বর্ণিত মাওকূফ হাদীস অনুযায়ী হাত তুলে তাতে আপত্তি নেই।

(মিরকাত ২য় খণ্ড, ৩৪২ পৃ.)

আল্লামা ইবনে কুদামাহ (রা) বলেন, ইবনে উমার (রা)-এর ঐ হাত তোলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোন বিরোধিতার বর্ণনা জানা যায় না।

(আল মুগনী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃ.)

ঈদের জামা'আত না পেলে

একদা আনাস (রা) ঈদের জামাআত না পাওয়ায় নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে দু' রাকআত সালাত পড়েন। (বুখারী ১৩৫ পৃ.)

ইমাম বাইহাকী (র) বলেন, যদি কেউ ঈদের জামাআত না পায় তাহলে সে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে নিয়ে দু' রাকআত সালাত কাযা পড়বে।

(বাইহাকী ৩য় খণ্ড-৩০৫ পৃ.)

যদি কেউ ঈদের সালাত এক রাকআত পায় তাহলে সে ঈদের ফযীলত পাবে এবং ইমামের সালাম ফেরার পর সে দ্বিতীয় রাকআত একা পড়ে নেবে। যে ব্যক্তি জামাআত পাবে না সে একাও দু' রাকআত পড়তে পারে। যদি দু-তিন জন বা তার চেয়ে বেশি লোক জমা হয় এবং তারা পুরুষ হোক কিংবা নারী তাহলে তারা জামা'আত করে দু' রাকআত পড়তে পারে। এমতাবস্থায় খুৎবার প্রয়োজন নেই। (বুখারী, দস্তুরুল মোত্তাকী ১৪৫ পৃ.)

ঈদের সালাতের পরই খুৎবাহ পাঠ

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হতেন। অতঃপর প্রথম কাজ সালাত আদায় করতেন। তারপর সালাম ফিরে লোকেদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। তখন সব লোকেরা লাইন দিয়ে বসে থাকত। অতঃপর তিনি তাঁদেরকে ওয়াজ ও নসীহত করতেন এবং কোন কাজের নির্দেশ দিতেন। যদি কোন সৈন্য পাঠাবার প্রয়োজন হতো

তাহলে তা পাঠাতেন অথবা কোন কিছুর নির্দেশ থাকলে তার হুকুম দিতেন। তারপর বাড়ি ফিরতেন।

(বুখারী, ১৩১ পৃ. মুসলিম ১ম খণ্ড-২৯০ পৃ. মিশকাত ১২৫ পৃ. নাসায়ী ১ম খণ্ড-১৭৯ পৃ.)

এ হাদীস এবং অন্যান্য আরো হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুগের চাহিদা অনুসারে সময়োপযোগী বক্তৃতা করতেন। কোন বাঁধা গদ তিনি শ্রোতাদের শোনাতেন না। যেমন আজকের যুগে কিছু মুসলিম ভাইয়েরা বাঁধা গদের খুৎবাহ গ্রন্থ আরবিতে পড়ে শুনান। ফলে আরবি না জানা শ্রোতাগণ ঐ খুৎবাহর ভাবার্থ কিছুই বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহ সহীহ হাদীস মোতাবেক আমাদের চলার তাওফীক দান করুন– আমীন!

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে যে, পুরুষদের সামনে নসীহত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের নিকটে যেতেন এবং তাদেরকেও ওয়াজ ও নসীহত করতেন এবং দান খয়রাত করার হুকুম দিতেন। তখন মেয়েরা তাদের কানের ও হাতের গহনা খুলে বেলালকে দিতেন।

(বুখারী ১৩১ পৃ. মুসলিম ১ম খণ্ড-২৮৯ পৃ. মিশকাত ১২৫ পৃ.)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পুরুষদের সামনে ঈদের যে নাসীহত হয় তার আওয়াজ যদি মেয়ে মুসল্লীরা শুনতে না পায়, তাহলে ইমামের উচিত পুরুষদের খুৎবা শেষ করে মেয়েদের কাছে গিয়ে কিছু বক্তব্য পেশ করা। ইমাম নববী (র) বলেন, খতীবের উচিত ঈদুল ফিতরের খুৎবায় শ্রোতাদেরকে ফিতরার নিয়ম কানুন শেখানো এবং ঈদুল আযহার খুৎবায় কুরবানীর বিধান শেখানো।

(রওয়াতুত তা-লেবনী ২য় খণ্ড-৭৩ পৃ.)

মহানবী ﷺ-এর ঈদের খুৎবাহ দেয়ার সময় ঈদগাহে কোন মিম্বার থাকত না।

(বুখারী-১৩১ পৃ.)

তাই তিনি বেলালের কাঁধে হাত রেখে বৃক্ততা করতেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড-২৮৯ পৃ.)

কখনো তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন।

(আবু দাউদ ১ম খণ্ড-১৬২ পৃ.)

আবার কখনো বল্লমের উপর ভর রেখে খুৎবাহ দিতেন।

(মুসনাদে শাফি'ঈ, মিশকাত ১২৬ পৃ.)

খুৎবার ভেতরে তিনি বেশি করে তাকবীরও দিতেন। (ইবনে মাজাহ, ৯২ পৃ.)

কিন্তু তাই বলে তিনি তাকবীর দ্বারা ঈদের খুৎবাহ শুরু করতেন না। কারণ, কোন

হাদীস দ্বারা এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি দু' ঈদের খুৎবাহ তাকবীর দিয়ে শুরু করেছিলেন। সেই জন্য শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) বলেন, 'আল হামদু লিল্লাহ' দ্বারা ঈদের খুৎবাহ শুরু করাই ঠিক। কারণ, নবী ﷺ সমস্ত খুৎবাই 'আল হামদু লিল্লাহ' দ্বারা শুরু করতেন। (যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড পৃ.)

ঈদের খুৎবাহ শোনার গুরুত্ব

আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একবার ঈদের সালাত পড়ে বললেন, এখন আমি বক্তৃতা করব। অতএব যার বক্তৃতা শোনার জন্য বসতে ভালো লাগে সে বসে থাক এবং যার চলে যেতে ভালো লাগে সে চলে যাক। (আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড-১৬৩ পৃ.)

তাই ইমাম মালিককে এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তিনি ইমামের সাথে ঈদুল ফিতরের সালাত পড়ার পর খুৎবাহ শোনার আগে চলে যেতে পারেন কি? তিনি বললেন, না ততক্ষণ তিনি যেতে পারবেন না যতক্ষণ ইমাম না যান। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ৬৪ পৃ.)

আগে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈদের সালাতের শেষে দু'আর গুরুত্ব এত যে, হায়েযওয়ালী মহিলাদের চাদর ধার করেও ঐ দু'আয় শরীক হতে বলা হয়েছে। (তিরমিযী ১ম খণ্ড-৭০ পৃ.)

সুতরাং যারা পূর্বোক্ত দলীলের অযোগ্য মুরসাল হাদীসটির ভিত্তিতে ঈদের খুৎবাহ না শুনে চলে যাবে তারা ঈদের গুরুত্বপূর্ণ দু'আ থেকে বঞ্চিত হবে। অতএব ঈদের খুৎবাহ না শুনে যাওয়া যাবে না। বরং মনোযোগ দিয়ে ঈদের খুৎবাহ শুনতে হবে এবং ঐ সময় আপোষে কথা বলাও চলবে না। কারণ বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বাসরীর (র) মতে ইমামের ঈদের খুৎবাহ দেয়া অবস্থায় (শ্রোতাদের) কথা বলা আপত্তিকর। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ২য় খণ্ড-১৭১ পৃ.)

ঈদের খুৎবাহ এক না একাধিক

জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ঈদুল ফিতরে কিংবা ঈদুল আযহার দিনে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন। তারপর তিনি একবার বসলেন, আবার দাঁড়ালেন।

(ইবনে মাজাহ ৯২-৯৩ পৃ.)

এ হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ওয়ায়দুল্লাহ রহমানী বলেন, এর সূত্রের রাবী ইসমাঈল ইবনে মুসলিম এবং আবূ বাহর রিজালবিদদের মতে অত্যন্ত দুর্বল।

(মিরআত ২য় খণ্ড ৩৩০ পৃ.)

সুতরাং হাদীসটি য'ঈফ। তাই দলীলের অযোগ্য।

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ঈদের সালাত পড়লেন বিনা আযান ও ইকামাতে এবং তিনি দু'টি খুৎবাহ দিতেন, যার মাঝে একবার বসে দুটিকে আলাদা করতেন। (মুসনাদে বাযযার, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃ.)

আল্লামা হায়সামী (র) বলেন, এ হাদীসের সূত্রে এমন কিছু রাবী আছেন যাদেরকে আমি চিনি না। সুতরাং হাদীসটি যঈফ। ইমাম শাফি'ই (র) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উকবাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেন, দু' ঈদের খুৎবায় মাঝখানে একবার বসে দুই খুৎবাহ দেয়া সুন্নাত।

(মুসনাদে শাফি'ঈ, শারহুন নিকায়াহ ১ম খণ্ড-১২৮ পৃ.)

উক্ত তিনটি হাদীস প্রমাণ করে যে, ঈদের খুৎবাহ জুমু'আর মত দু'টি। কিন্তু এ তিনটি বর্ণনা সম্পর্কে মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) তদীয় খুলাসাহ গ্রন্থে বলেন, ঈদের খুৎবাহ দু'বার হবার ব্যাপারে কোন প্রমাণই নেই। তবে জুমু'আর উপরে অনুমান ছাড়া আর কোন ভরসা নেই।

(মুসনাদে শাফি'ঈ, শারহুন নিকায়াহ ১ম খণ্ড-১২৮ পৃ, নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড-২২১ পৃ.)

ভিত্তিহীন কিয়াস ও অনুমান দ্বারা কোন ফায়সালা ও তথ্য প্রমাণিত হয় না। সেজন্য ঈদের খুৎবাহ কেবল মাত্র একটি, দু'টি নয়।

ঈদের দিনে মুসাফাহ ও কোলাকুলি

ঈদের দিনে 'খাস করে' মুসাফাহ এবং কোলাকুলি ও আলিঙ্গন করার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলেই তাকে সালাম করতে হবে। (মুসলিম, মিশকাত ১৩৩ পৃ.)

এবং মুসাফাহও করতে পারে। যেমন আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি একদা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার কোন ভাই অথবা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে সে কি তার জন্য ঝুঁকতে পারে? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, সে কি তাকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করবে এবং চুমু দেবে। তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, তাহলে সে কি তার একটি হাত ধরে মুসাফাহ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (তিরমিযী, মিশকাত ৪০১ পৃ.)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, যাদের সাথে সচরাচর দেখা হয় তাদের সাথে ঈদগাহে দেখা হলে সালাম ও মুসাফাহ করা যেতে পারে। কিন্তু কোলাকুলির

প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, কারো সাথে যদি বহুদিন পর ঈদগাহে সাক্ষাত হয় তাহলে তার সাথে কোলাকুলি করা যেতে পারে। যেমন একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পালক ছেলে যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) কোন যুদ্ধ বা সফর থেকে ফিরে বাড়ি ঢুকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন।

(তিরমিযী, মিশকাত ৪০১ পৃ.)

উক্ত সাধারণ ও ব্যাপক ভাব প্রকাশক হাদীসগুলোর ভিত্তিতে অন্যান্য দিনের মতো ঈদের দিনেও সচরাচর সাক্ষাৎকারীদের সাথে সালাম ও মুসাফাহ করা যাবে এবং বহুদিন পর সাক্ষাৎকারীর সাথে মুআনাকা বা কোলাকুলি করা যাবে। তবে ঐ কাজগুলো অন্যান্য দিনে না করে বরং ঈদগাহে বা ঈদের দিনে নির্দিষ্টভাবে করলে রাসূলের সুন্নাত সম্মত হবে না।

ঈদগাহ থেকে ফিরার পর করণীয় সুন্নাত

ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে রওয়ানা হলেন। তারপর লোকদেরকে নিয়ে সালাত পড়লেন। তার আগে পরে কোন সালাতই তিনি (ঈদগাহে) পড়েননি। (ইবনে মাজাহ ৯৩ পৃ.)

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের সালাত পড়ে যখন বাড়ি ফিরতেন তখন ঘরে দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন।

(সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ২য় খণ্ড ৩৬২ পৃ: হাকিম ১ম খণ্ড-২৯৭ পৃ : ইবনে মাজাহ ৯৩ পৃ.)

উক্ত বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে ঈদের দিনে ঈদগাহে ঈদের জামা'আতের আগে ও পরে কোন সুন্নাত বা নফল সালাত নেই। ঐ দিন ঈদগাহ থেকে ফিরার পর ঘরে দু' রাক'আত নফল সালাত পড়া নবী ﷺ-এর সুন্নাত। অতএব যারা সুন্নাতে রাসূলের আশিক তাদের উচিত ঈদগাহ থেকে ফিরে ঘরে দু' রাক'আত নফল সালাত পড়া। না পড়লে আপত্তি নেই।

ঈদের দিনে আপোষে মুবারাকবাদ

একদা ওয়াসিলাহ ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ (তাকাব্বালাল্লা-হু মিন্না ওয়ামিনকা) অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের এবং আপনার তরফ থেকে ঈদকে কবুল করুন। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকা। (ইবনে 'আদী)

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এ হাদীসটি য'ঈফ। তবে অন্য

একটি হাসান সূত্রে যুবায়ের ইবনে নুফায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন ঈদের দিনে সাক্ষাৎ করতেন তখন একে অপরকে বলতেন– تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ (ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড-৪৪৬ পৃ.)

তাবারানী কাবীরেও একটি য'ঈফ হাদীস আছে "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকা" বলার। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২য় খণ্ড-২০৬ পৃ.)

মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ বলেন, একদা আমি আবূ উমামাহ বাহিলী প্রমুখ সাহাবীদের সাথে ছিলাম। তাঁরা যখন ঈদ পড়ে ফিরছিলেন তখন একে অপরকে বলছিলেন- تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, এ হাদীসটির সূত্র উত্তম। (মুগনী ২য় খণ্ড-৩৯৯ পৃ.)

ঈদের দিনের মাহাত্ম্য

রাসূলুল্লাহু ﷺ বলেন : যেদিন ঈদুল ফিতরের দিন সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করতে থাকেন। অতঃপর বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! মজদুরের পুরস্কার কি, যে তার কাজ পুরোপুরি করেছে? তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তার পুরস্কার তাকে পুরোপুরি এর প্রতিদান দেয়া। এবার আল্লাহ বলেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! আমার দাস ও দাসীরা তাদের ওপর চাপানো কর্তব্য পালন করেছে। তাপর তারা উচ্চৈঃস্বরে (তাকবীর) ধ্বনি দিতে দিতে দু'আর জন্য (ঈদগাহে) রওয়ানা হয়েছে। আমার সম্মান ও গাম্ভীর্যের কসম! এবং আমার উদারতা ও উচ্চমর্যাদার কসম! আমি তাদের ডাকে অবশ্য অবশ্যই সাড়া দেব। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের খারাপগুলো ভালো দ্বারা বদলে দিলাম। নবী ﷺ বলেন : তাই তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরতে থাকে।

(বাইহাকীর শুআবুল ঈমান, মিশকাত ১৮৬-১৮৩ পৃ.)

৫. রমযানের পর করণীয় ও বর্জনীয়

রমযান অতিক্রান্ত হলে আমরা বিদায় জানাচ্ছি মাহে রমযানকে। এই তো বিদায় দিচ্ছি কুরআন তিলাওয়াত, তাকওয়ার অনুশীলন, ধৈর্য, জিহাদ, রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের মুবারক মাসটিকে। তাহলে কি আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পেরেছি? আমরা কি সর্ব-প্রকার জিহাদে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করতে পেরেছি। রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তি লাভের উপযোগী আমল করার চেষ্টা করেছি?

রমযানের শিক্ষা

রমযানের রোযা সাধনার মাধ্যমে বান্দা রহমত, মাগফিরাত ও মুক্তির সুসংবাদের আনন্দ লাভ করে। ঈদুল ফিতরের দিন তার আংশিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল্লাহ এর মাধ্যমে বান্দার আনন্দের সামান্য নমুনা দেখান। মু'মিনের আসল আনন্দতো হবে বেহেশতে আল্লাহর সাথে। সত্যিকার আনন্দ বা খুশী আসে আল্লাহর আনুগত্য বা আদেশ-নিষেধ মানার মাধ্যমে। তাই রমযানের পরে আল্লাহর অন্যান্য আদেশ-নিষেধ মেনে চললে সেই আনন্দ পূর্ণতা লাভ করবে।

ঈদে নতুন কাপড়-চোপড় ও সাজ-সজ্জার প্রচলন আছে। এ প্রসঙ্গে একজন আরবি কবি বলেছেন–

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ * بَلِ الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا * وَلٰكِنَّ الْعِيْدَ لِمَنْ تَرَكَ الْخَطَايَا ـ

অর্থ : 'ঈদ সেই ব্যক্তির জন্য নয় যে নতুন পোশাক পরে, বরং ঈদ সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। ঈদ সে ব্যক্তির জন্য নয় যে সওয়ারীতে আরোহণ করে, বরং ঈদ সে ব্যক্তির জন্য যে গুনাহর কাজ ত্যাগ করে।'

এক নেক ও বুজুর্গ ব্যক্তি ঈদের দিন কিছু লোককে খেলাধুলায় মশগুল দেখে বললেন, 'তোমরা যদি নেক কাজ করে থাক তাহলে তা নেক কাজের শুকরিয়া নয়, আর যদি পাপ কাজ করে থাক তাহলে দয়াবান আল্লাহর সাথে এভাবে আর কত করবে?

হজ্জের দিন আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্তের সময় খলীফা ওমার বিন আবদুল আযীয কিছু লোককে উট ও ঘোড়ার উপর দ্রুত দৌড়াতে দেখে মন্তব্য করেন, 'আজ যার ঘোড়া বা উটে দ্রুতগামী সে বিজয়ী প্রতিযোগী নয়, বরং সেই বিজয়ী প্রতিযোগী যার গুনাহ মাফ হয়েছে।' রমযানেও গুনাহ মাফের প্রতিযোগিতাই কাম্য অন্য কোন প্রতিযোগিতা নয়।

আলী (রা)-এর মতে, মুসলমানের ঈদ প্রতিদিন। প্রতিদিনই তারা গুনাহ থেকে দূরে থেকে সওয়াব ও মুক্তির খুশী লাভ করে।

রমযান পরবর্তী সময়ে আমাদের কি করণীয়? এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যারা রমযান আসলে ইবাদত করে ও কষ্ট করে এবং রমযান চলে গেলে আবার গাফেল হয়ে যায় তাদের ব্যাপারে আপনার

মন্তব্য কি? তিনি উত্তর দেন, 'তারা কতইনা বদ-নসীব যারা শুধু রমযানে আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে।' নেক আমল কবুলের লক্ষণ হলো, পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখা। যেমন নামায কবুলের লক্ষণ হলো, নফল নামায আদায় করার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া।

মাহে রমযান একটি ঈমানী পাঠশালা, সারা বছরের পাথেয় উপার্জন, সারা জীবনের মাকসাদকে শানিত করার জন্যে এটি একটি রুহানি ময়দান। যে ব্যক্তি মাহে রমযানে নিজেকে সংশোধন করতে পারল না সে আর কখন নিজের জীবন গঠন করবে?

মাহে রমযানই এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাতে আমরা নিজেদের আমল, শরিয়ত পরিপন্থী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ ও চরিত্র সংশোধন করে নিতে পারি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ পর্যন্ত কোন জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেয়। (সূরা রা'দ : আয়াত-১১)

যদি তুমি সত্যিকার অর্থে রমযান পেয়ে লাভবান হয়ে থাক আর মুত্তাকিদের গুণাবলি অর্জন করে রোযা, তারাবির নামায সম্পাদন করে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা কর। তাঁর শোকর আদায় কর এবং তার কাছে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার তাওফীক কামনা কর।

তুমি ঐ নারীর মতো হয়ো না, যে নাকি সুতা দিয়ে সুন্দর করে সুয়েটার বুনল, যখন তা তাকে আকৃষ্ট করল, তখন একটি একটি করে সুতা খুলে ফেলতে লাগল। মানুষ তার সম্পর্কে কী মন্তব্য করবে? রমযান শেষে যে পুনরায় গুনাহের দিকে ফিরে গিয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়, তার অবস্থাতো ঐ নারীর মতোই। আনুগত্য ও মুনাজাতের স্বাদ পাওয়ার পরেও পুনরায় গুনাহ ও অপরাধের দিকে কীভাবে ফিরে যায়?

সুহৃদয় পাঠকবর্গ! আমরা রমযানে আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছি তা ভঙ্গ করার অনেক চিত্র সমাজে ফুটে উঠেছে। যেমন–

১. ঈদের দিনেই জামাতে নামায আদায় ছেড়ে দেয়া। তারাবির মতো সুন্নাত নামাযে মসজিদ ভরা মুসল্লি থাকার পর এখন ফরজ নামাযের সময়ই মুসল্লির সংখ্যা খুব কমে যাওয়া।

২. গান-বাদ্য ও সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

৩. বেহায়া ও বেলেল্লাপনার সাথে হাট-বাজারে ও পার্কে ছেলে-মেয়েদের সহাবস্থান ইত্যাদি।

তাহলে কি এভাবেই আমরা মাহে রমযানকে বিদায় জানাব?

এত বড় নেয়ামতের এটাই কি শোকর আদায়, এটাই কি আমল কবুল হওয়ার নিদর্শন? নিশ্চয় নয়। বরং এটা আমল কবুল না হওয়ার আলামত। কেননা প্রকৃত রোযাদার ঈদের দিন রোযা ছেড়ে দিয়ে আনন্দিত হবে এবং রোযা পূর্ণ করার তাওফীক পাওয়ার দরুন তার প্রতিপালকের প্রশংসা করবে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সাথে সাথে এ ভয়ে কাঁদবে যে, না জানি আমার রোযা কবুল হয়নি। আমাদের পূর্বসূরীগণ মাহে রমযানের পর ছয় মাস পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে রোযা কবুল হওয়ার দোয়া করতেন। আমল কবুল হওয়ার

আলামত হলো, পূর্ববর্তী অবস্থার চেয়ে বর্তমান অবস্থা উন্নত হওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ .

মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত কর। (সূরা আল-হিজর : আয়াত-৯৯)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ .

বল, বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি, এবং অবিচল থাক। (মুসলিম)

সত্যিকার মু'মিন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর ইবাদত করবে। কোন নির্দিষ্ট মাস, জায়গা অথবা জাতির সাথে মিলে আমল করবে না, বরং সর্বদা সে ইবাদত করবে। মু'মিন বান্দা মনে করবে যিনি রমযানের প্রভু তিনি অন্যান্য সকল মাসেরও প্রভু। তিনি সকল কাল ও স্থানের প্রভু। রমজান শেষ হয়ে গেলেও শাওয়ালের ছয় রোযা, আশুরা, আরাফা, সোমবার, বৃহস্পতিবার ইত্যাদি নফল রোযা রয়েছে। তারাবীহের নামায শেষ হয়ে গেলেও তাহাজ্জুদ নামায বাকি আছে সারা বছর। অতএব, নেক আমল সব সময় সব জায়গাতেই করা যায়। হে ভাই ! তুমি নেক আমলের চেষ্টা করতে থাক। অলসতা কর না। যদি তুমি নফল আদায় করতে না চাও, তাহলে কমপক্ষে ফরজ, ওয়াজিব ছেড়ে দিয় না। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের ওপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

৬. বিভিন্ন মাসের নফল রোযার গুরুত্ব

রমযানের একটি মাস বাধ্যতামূলক রোযা শেষ করার পর বছরের বাকি এগারোটি মাসেও যাতে সিয়ামের অভ্যাস কিছু কিছু থাকে তার জন্য ঈদের পরদিন থেকেই প্রতি মাসের কিছু কিছু সিয়াম রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। তবে ঐ সিয়ামগুলো রমযানের মতো বাধ্যতামূলক নয় বরং ইচ্ছাধীন। কেউ ইচ্ছে করলে তা রাখতে পারে এবং বাড়তি সওয়াব পেতে পারে। কিন্তু না রাখলে কেউ গুনাহগার হবে না। তবে সে বাড়তি সওয়াব পাবে না। আরবি নফল শব্দের শাব্দিক অর্থ বাড়তি। তাই ঐ সিয়ামকে নফল সিয়াম বলা হয়। এজন্যই নবী ﷺ প্রত্যেক মাসে তিনটি করে (নফল) সিয়াম রাখতেন।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৫ পৃ. আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড- ৩২২ পৃ.)

এ রোযার মাহাত্ম্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মাত্র একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নিকট থেকে জাহান্নামকে একশ' বছর চলা-পথের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃ. তাবারানী কাবীর ও আওসাত, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৩য় ১৯৪ পৃ. কানযুল ওম্মাল ৪র্থ খণ্ড-২৮৮ পৃ.)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে যে, একশ' বছর চলার পথের ঐ দূরত্বটি স্বাভাবিক দেহী দ্রুতগামী ঘোড়ার একশ' বছর দৌড়ানো পথের দূরত্ব।

(তাবারানী কাবীর, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য়, ১৯৪ পৃ.)

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন এক ব্যক্তি যদি একদিন নফল রোযা রাখে তারপর তাকে যদি যমীন ভর্তি সোনা দেয়া হয় তাহলেও তার সওয়াব হিসাবের দিনের তুলনায় পুরোপুরি হবে না।

(আবূ ইয়ালা ও তাবারানী আওসাত, মজমাউয্যু যাওয়ায়িদ ৩য় ১৮২ পৃ.)

একদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঈসা (আ)-এর নিকট ইনজীলে এ ওয়াহী পাঠান যে, তুমি বনী ইসরাঈলদের নেতৃবর্গকে বলে দাও– আমার সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি রোযা রাখবে আমি তার শরীর সুস্থ রাখব এবং তার পুরস্কারকে বড় করে দেব। (আবূশ শায়খের আসসওয়া-ব, দায়লামী ও রাফিয়ী, কানযুল উম্মা-ল ৮ম খণ্ড- ২৯২ পৃ.)

এ কারণেই মনে হয় নবী ﷺ প্রত্যেক মাসে তিনটি করে সিয়াম ছাড়তেন না।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড- ২৫৬ পৃ, মিশকাত ১৮০ পৃ.)

১. শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম রাখল, তারপর এর পরপরেই শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়ামও পালন করল ও সে গুলো সারা বছরের সিয়ামের মতো হলো। (মুসলিম ১ম খণ্ড- ৩৬৯ পৃ. মিশকাত ১৭৯ পৃ. আবূ দাউদ ১ম খণ্ড-৩৩০ পৃ.)

একটি হাদীসে এক বছরের হিসাবটা রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দিয়েছেন, রমযানের এক মাসের সিয়াম দশ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি সিয়াম দু'মাসের সমান। এ হলো এক বছর। (ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড-২৯৮ পৃ. বাইহাকী ৪র্থ ২৯৮ পৃ.)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম ও শওয়ালের ছয়টি সিয়াম রাখে সে তার গুনাহ থেকে ঐভাবে বেরিয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। (তাবারানী আওসাত, মজমাউয যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড-১৮৪ পৃ.)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পালক পুত্র যায়েদের ছেলে উসামা (রা) হারাম মাসগুলোতে সিয়াম রাখতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে একদা বললেন, তুমি শাওয়ালে সিয়াম রাখ। তারপর তিনি হারাম মাসের সিয়াম ছেড়ে দেন এবং তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শাওয়ালের সিয়াম রাখতে থাকেন। (যিয়া মাকদিসী, কানযুল উম্মাল ৮ম খণ্ড-৪১০ পৃ.)

২. মুহাররম

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : রমযানের পর সর্বোত্তম সিয়াম মুহাররম মাসের সিয়াম। (মুসলিম ১ম-৩৬৮ পৃ. তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৩ পৃ. আবূ দাউদ ১ম খণ্ড-৩৩০ পৃ.)

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি মুহাররম মাসে একটি সিয়াম রাখবে সে একদিনের বদলে ত্রিশ দিনের নেকী পাবে।

(তাবারানী সাগীর, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৩য় খণ্ড-১৯০ পৃ.)

৩. আশুরার রোযা

একটি সহীহ হাদীসে নবী ﷺ বলেন : সিয়ামের ব্যাপারে কোন দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ততখানি নেই যতখানি শ্রেষ্ঠত্ব আছে রমযান মাসের এবং আশুরা (মুহাররমের দশম) দিনের। (তাবারানী কাবীর, মাজমাউয যাওয়া-যিদ ৩য় খণ্ড-১৮৬ পৃ.)

তিনি ﷺ বলেন : তোমরা আশুরার দিনে সিয়াম রাখ। কারণ এ দিনে বহু নবী সিয়াম রাখতেন। তাই তোমরাও সিয়াম রাখ।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, কানযুল উম্মাল ৮ম খণ্ড-৩৭৫ পৃ.)

তিনি ﷺ বলেন : আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি যে, আশুরার সিয়াম গত এক বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড-৩৬৭ পৃ. তিরমিযী, ১ম ৯৪ পৃ. আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড-৩২৯ পৃ. ইবনে মাজাহ ১২৫ পৃ. মিশকাত-১৭৯ পৃ.)

উপরিউক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে মুহাররম মাসে কেউ যদি একটি সিয়াম রাখতে চায় তাহলে সে যেন কেবলমাত্র দশই মুহাররমে সিয়াম না রাখে। বরং নয় ও দশ কিংবা দশ ও এগারোই মুহাররমে দু'টি সিয়াম রাখে। কারণ, মহানবী ﷺ-কে একবার আশুরার দিনে সিয়াম রাখা অবস্থায় বলা হলো যে, এ দিনটিকে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানেরা মহান দিন মনে করে। তখন তিনি বললেন, আগামী বছর যখন আসবে তখন আমরা নয় তারিখেও সিয়াম রাখব ইনশা-আল্লাহ! অতঃপর আগামী বছর আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান।

(মুসলিম ১ম খণ্ড-৩৫৯ পৃ. আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড-৩৩২ পৃ.)

তাই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা নয় ও দশ তারিখে সিয়াম রাখ এবং ইয়াহূদীদের বিপরীত কর। (তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৪ পৃ.)

অন্য একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আশুরার সিয়াম রাখ এবং এ ব্যাপারে ইয়াহূদীদের বিপরীত কর। তাই ওর আগে একদিন এবং পরে একদিন সিয়াম রাখ। (আহমদ, মাজমাউয যাওয়া-য়িদ ৩য় খণ্ড-১৮৮ পৃ.)

অন্য বর্ণনায় আছে, আশুরার আগে একদিন কিংবা পরে একদিন রোযা রাখ।

(ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড-২৯১ পৃ.)

৪. যুলহিজ্জাহ ও আরাফার রোযা

একটি য'ঈফ হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেন : যুলহিজ্জার মাসের প্রথম দশকের এক এক দিনের সিয়াম এক বছর সিয়াম রাখার সমান।

(তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৪ পৃ, ইবনে মাজাহ ১২৫ পৃ. মিশকাত ১২৭ পৃ.)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী বলেন, নবী ﷺ বরাবরই যুলহিজ্জার নয়টি সিয়াম রাখতেন। (নাসায়ী ১ম খণ্ড- ২৫২ পৃ. আবূ দাঈদ ১ম খণ্ড-৩৩১ পৃ, মিশকাত ১৮০ পৃ.)

উক্ত নয়টি সিয়ামের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিয়াম নবম তারিখের সিয়াম। যুলহিজ্জাহ মাসের নবম তারিখে হাজ্জের প্রধানতম অঙ্গ আরাফাতের মাঠে অবস্থান করতে হয় বলে ঐ দিনটিকে আরাফার দিন বলে। তাই ঐ দিনের গুরুত্বপূর্ণ রোযাটিকে আরাফার রোযা বলা হয়। এ রোযার ফযীলত সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন : আমি আল্লাহর নিকটে আশা রাখি যে, আরাফাহ দিনের রোযা গত এক বছর এবং আগামী এক বছর গুনাহের কাফফারা হবে। (মুসলিম ১ম খণ্ড-৩৬৭ পৃ. তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৩ পৃ. আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড-৩২৯ পৃ. ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড-২৮৮ পৃ. মিশকাত ১৭৯ পৃ. ইবনে মাজাহ ১২৫)

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারী হাজ্জব্রত পালনরত ব্যক্তিকে আরাফার রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড-৩১১ পৃ, ইবনে মাজাহ ১২৫)

৫. প্রতি মাসে তিনটি রোযার মাহাত্ম্য

নবী ﷺ বলেন : 'আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের খবর দেব না কি যা মানুষের মনের হিংসা দূর করে? তা হলো প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম রাখা।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড-২৫৩ পৃ.)

অন্য বর্ণনায় তিনি ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম রাখল সে যেন গোটা বছরই সিয়াম রাখল। (ঐ ২৫৬ পৃ. তিরমিযী ১ম খণ্ড- ৯৫ পৃ.)

হাফসাহ (রা) বলেন, চারটি জিনিসকে নবী ﷺ কখনোই ছাড়তেন না। তা হলো আশুরার রোযা, যুলহিজ্জার দশটি সিয়াম এবং প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম ও ফজরের আগে দু' রাক'আত সুন্নাত সালাত। (নাসায়ী ১ম খণ্ড-২৫৬ পৃ, মিশকাত ১৮০ পৃ.)

আবূ যার (রা) বলেন, আমাকে আমার বন্ধু ﷺ বিশেষ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, আমি যেন তিনটি জিনিস কখনই না ছাড়ি। তা হলো চাশতের সালাত, ঘুমাবার আগে বিতরের সালাত এবং প্রতি মাসে তিনটি সিয়াম। (নাসায়ী ১ম খণ্ড-২৫৬ পৃ.)

একদা নবী ﷺ আবূ যার (রা)-কে বলেন, তুমি যখন কোন মাসে কিছু সিয়াম রাখবে তখন মাসের তের, চৌদ্দ ও পনেরোই তারিখে সিয়াম রাখবে।

(নাসায়ী ১ম খণ্ড-২৫৭ পৃ, তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৫ পৃ, মিশকাত ১৮০ পৃ.)

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর বর্ণনায় নবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে সিয়াম গোটা বছরেরই সিয়াম। (নাসায়ী ১ম খণ্ড-২৫৬ পৃ.)

৬. সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম রাখার বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বান্দাদের 'আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমি সিয়াম থাকা অবস্থায় যেন আমার 'আমাল পেশ করা হয়। (তিরমিযী ১ম খণ্ড-৯৩ পৃ, মিশকাত ১৮০ পৃ. আবূ দাউদ ১ম খণ্ড-৩৩১ পৃ., নাসায়ী ১ম খণ্ড-২৫১ পৃ, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ্ ৩য় খণ্ড-৩৯৯ পৃ.)

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়াম খুঁজে বেড়াতেন। (নাসায়ী, ১ম খণ্ড-২৫১ পৃ.)

তাই তাঁকে একদা সোমবার রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি ﷺ বললেন : এ দিনে আমি জন্মেছি এবং এ দিনেই আমার ওপর কুরআন নাযিল (হওয়া শুরু) হয়েছে– (মুসলিম ১ম খণ্ড-২৬৮ পৃ. মিশকাত ১৭৯ পৃ.) অন্য বর্ণনায় এতটা বাড়তি আছে যে, ঐ দিনেই আমি মরব। (ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড-২৯৯ পৃ.)

তথ্য সূত্র : সিয়াম ও রমাযান, হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াবী।

৬. রমযান বিষয়ে জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ

১. রমযান নিকটবর্তী হলে আমরা অনেকে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করি তবে এমন লোক খুব কম আছি যারা এর শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা সম্পর্কে জানি–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ .

হে আল্লাহ! আপনি রজব ও শাবান মাসে আমাদের জন্য বরকত রাখুন এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত উপনীত হওয়ার তাওফিক দিন।

ইমাম আহমদ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে বলেন, আমাদেরকে বলেছেন আব্দুল্লাহ, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদা ইবনে আবির রাকাদ থেকে, তিনি যিয়াদ আননুমাইরি থেকে, তিনি সাহাবি আনাস ইবনে মালেক থেকে, তিনি বলেন : রজব মাস আসলে রাসূল ﷺ বলতেন–

ইবনুস সুন্নি ফিল আমালিল ইয়াওম ওয়াল লাইলাহ (৬৫৯) তিনি এ হাদীস ইবনে মুনি সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-কাওয়ারিরি। বায়হাকি ফি "শুআবিল ঈমান" (৩/৩৭৫), তিনি বর্ণনা করেন আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফেয সূত্রে, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুয়াম্মাল, তিনি বলেন আমাদেরকে বলেছে মুহাম্মদ ইবনে শারানি।

এ হাদীস বাযযার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে মালেক আল-কুশাইরি থেকে, সে যায়েদা থেকে।

এ হাদীসের সনদে দুটি দোষ বা সমস্যা রয়েছে, মুহাদ্দিসগণের নিকট যার পারিভাষিক নাম হচ্ছে ইল্লত, অর্থাৎ হাদীসে দুটি ইল্লত রয়েছে।

প্রথম ইল্লত : আলোচ্য হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন যায়েদা ইবনে আবির রাকাদ, তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মূল্যায়ন দেখুন : আবু হাতেম বলেছেন : যায়েদ ইবনে আবির রাকাদ যিয়াদ ইবনে নুমাইরি থেকে বর্ণনা করেছেন: যায়েদ ইবনে আবির রাকাদ যিয়াদ ইবনে নুমাইরি থেকে মারফূ সনদে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে, জানি না এ সমস্যা তার থেকে না তার উস্তাদ যিয়াদ থেকে। সে

যিয়াদ ছাড়া অন্য কারো হাদীস বর্ণনা করেছে কিনা তাও অবগত নই, যার সূত্র ধরে তার হাদীস যাচাই করব।

ইমাম বুখারী বলেছেন : তার হাদীস মুনকার।

আবু দাউদ বলেছেন : তার হাদীস সম্পর্কে কিছু জানি না।

নাসায়ী বলেছেন : তাকে চিনি না।

যাহাবি "দেওয়ানে দুয়াফাতে" উল্লেখ করেছেন : সে কোন দলিল নয়।

ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন : তার হাদীস মুনকার।

মুনকার হাদীস :

মুহাদ্দিসীনে কেরামের একটি পরিভাষা হচ্ছে "মুনকার" এর অর্থ সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেন :

اَلْحَدِيْثُ عَنِ الضُّعَفَاءِ قَدْ يُحْتَاجُ اِلَيْهِ فِيْ وَقْتٍ، وَالْمُنْكَرُ اَبَدًا مُنْكَرٌ.

অর্থ : দুর্বল রাবীদের হাদীস কখনো দরকার হয়, কিন্তু মুনকার সর্বদা মুনকার।"
(দেখুন : "ইলালুল মারওয়াযী" : হাদীস নং : ১৮৭, "মাসায়েল ইবনে হানি : ১৯২৫-১৯২৬, ইবনে রজব শারহুল ইলাল": ১/৩৮৫ গ্রন্থে ইবনে হানি থেকে তা বর্ণনা করেছেন)

ইমাম আহমদের কথার অর্থ হচ্ছে : মুনকার সর্বদা পরিত্যক্ত, এর বিপরীতে দুর্বল হাদীসের দরকার হলেও মুনকার কখনো গ্রহণ করা যাবে না।

দ্বিতীয় ইল্লত : আলোচ্য হাদীসের অপর বর্ণনাকারী যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ নুমাইরি আল-বিসরি, (যায়েদ ইবনে আবির রাকাদের উস্তাদ : তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের ভাষ্য হলো–

ইয়াহইয়া ইবনে মায়িন বলেছেন: তার হাদিস দুর্বল।

আবু হাতেম বলেছেন : তার হাদীস লেখা যাবে, কিন্তু দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না।

আবু উবাইদ আজুরির বলেছেন : আমি আবু দাউদকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন।

ইবনে হিব্বান 'মাজরুহ' বা দোষী ব্যক্তিদের আলোচনায় বলেন : তার হাদীস মুনকার। আনাস থেকে সে এমন কিছু বর্ণনা করে, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সাথে মিলে না, তার হাদীস দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা নাজায়েয।

দারাকুতনি বলেছেন : সে দলিল নয়।

ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন : সে দুর্বল।

شَهْرُ رَمَضَانَ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ.

২. "রমযান মাসের প্রথম অংশ রহমত, মধ্যম অংশ মাগফেরাতও **শেষ অংশ** জাহান্নাম থেকে মুক্তির।" আলোচ্য হাদীস মুনকার। (দেখুন : কিতাবুদ **দুয়াফা লিল** উকাইলি : ২/১৬২, আল কামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল লি ইবনে আদি : ১/১৬৫, কিতাব ইলালিল হাদীস লি ইবনে আবি হাতেম : ১/২৪৯, সিলসিলাতিল আহাদিসুস দায়িফা ওয়াল মাওদুয়াহ লিল আলবানী : ২/২৬২, ও ৪/৭০)

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.

৩. যে ব্যক্তি কোনো কারণ ব্যতীত রমযানের একদিন রোযা ভঙ্গ করল অথবা অসুস্থতা ব্যতীত, পুরো বছরের তার কাযা হবে না, যদিও সে পুরো বছর সওম পালন করে। (হাদীসটি দুর্বল)

ইমাম বুখারী (র) তার সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি টীকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রমযান : ৪/১৯৪, হাদীসটি তিনি দুর্বল ক্রিয়া দ্বারা উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীস আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফু হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ : ২৩৯৬, তিরমিযী : ৭২৩, ইবনে মাজাহ: ১৬৭২, ইবনে খুযাইমাহ : ৩/২৩৮, হাদীস নং ১৯৮৮, আহমদ : ২/৩৭৬, প্রমুখগণ সাওরি ও শুবা থেকে, তারা উভয়ে হাবিব ইবনে আবু সাবেত থেকে, সে উমারা ইবনে উমাইর থেকে সে আবুল মিতওয়াস থেকে, সে তার পিতা থেকে, সে আবু হুরায়রা থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا.

৪. "সাওম পালন কর সুস্থ থাক" হাদীসটি দুর্বল।

দেখুন : তাখরিজুল ইয়াহইয়া লিল ইরাকি : ৩/৭৫, আল-কামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল" লি ইবনে আদি : ২/৩৫৭, কিতাবুশ সাজারাহ ফিল আহাদিসিল মুশতাহেরা' লি ইবনে আহাদিসিল মাওদুয়াহ লিশ শাওকানি : ১/২৫৯, মাকাসিদুল হাসানাহ লিস সাখাভি : ১/৫৪৯, "আশফুল খাফা লিল আজুলনি : ২/৫৩৯, সিলসিলাতিন আহাদিসুস দায়িফা ওয়াল মাওদুয়াহ" লিল আলবানী : ১/২৪০)

اِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ ـ

৫. প্রত্যেক ইফতারের সময় জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কিছু মুক্তিপ্রাপ্ত বান্দা থাকে। হাদীসটি দুর্বল।

দেখুন : তানজিহুশ শারিয়াহ লিল কিনানি; ২/১৫৫, আল ফাওয়াদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসিল মাওদুয়াহ লিশ শাওকানি: ১/২৫৭, কাশফুল ইলাহি আন শাদিদিদ দায়িফ ওয়াল মাওদু ওয়াল ওয়াহি লিত তারাবুলসি: ১২/২৩০, জাখিরাতুল হিফাজ লিল কায়সারানি : ২/৯৫৬, শুআবুল ঈমান লিল বায়হাকি: ৩/৩০৪, আল-কামেল ফি দুয়াফায়ির রিজাল লি ইবনে আদি: ২/৪৫৫)

لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَافِيْ رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِيْ أَنْ يَكُوْنَ رَمَضَانَ السَّنَةَ كُلَّهَا، اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اِلَى الْحَوْلِ ـ

৬. বান্দারা যদি জানত যে, রমযানে কি রয়েছে, তাহলে তারা আশা করত সারা বছর যেন রমযান হয়, নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমযানের জন্য সুসজ্জিত করা হয়। হাদীসটি দুর্বল।

দেখুন : আল-মাওদুয়াত লি ইবনে জাওজি: ২/১৮৮, তানজিহুশ শারিয়াহ লিল কিনানি: ২/১৫৩, আল-ফাওয়াদুল মাজমুআহ ফিল আহাদিসিল মাওদুয়াহ লিশ শাওকানি: ১/২৫৪, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ লিল হায়সামি : ৩/১৪১)

অনুরূপ আরেকটি হাদীস :

اِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزْخَرَفُ وَتُنْجَدُ مِنَ الْحَوْلِ اِلَى الْحَوْلِ لِدُخُوْلِ رَمَضَانَ فَتَقُوْلُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ : يَارَبِّ، اجْعَلْ لَنَا فِيْ هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا ـ

নিশ্চয় জান্নাত এক বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রমযান আসার জন্য সজ্জিত ও পরিপাটি করা হয়। জান্নাতী হুরেরা বলে: হে আল্লাহ! এ মাসে তোমার বান্দাদের থেকে আমাদের জন্য স্বামী নির্বাচন কর। তাবরানি আওরাত ও "কাবির" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য হাদীসের সনদে ওলিদ ইবনুল ওলিদ আল আনাসি বিদ্যমান, সে দুর্বল।

اِنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَقُوْلُ عِنْدَ الاِفْطَارِ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

৭. নবী করীম ﷺ প্রত্যেক ইফতারের সময় বলত: হে আল্লাহ! আপনার জন্য সিয়াম সাধনা করছি এবং আপনার রিযকের দ্বারাই ইফতার করছি। হাদীসটি দুর্বল।

দেখুন : "খুলাসাতু বাদরুল মুমিন লি ইবনুল মুলাক্কিন: ১/৩২৭, হাদীস নং ১১২৬, তালখিসুল হাবিব লিল হাফেজ ইবনে হাজার : ২/২০২, হাদীস নং (৯১১) আল-আযকার" লিন নববী : পৃ. ১৭২, মাজমাউজ যাওয়ায়েদ লিল হায়সামি: ৩/১৫৬, দায়িফুল জামে" লিল আলবানী, হাদীস নং ৪৩৪৯)

جَاءَ اَعْرَابِیٌّ اِلَى النَّبِیِّ ﷺ فَقَالَ : اِنِّیْ رَاَیْتُ الْهِلَالَ قَالَ : اَتَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ یَا بِلَالُ اَذِّنْ فِی النَّاسِ اَنْ یَصُوْمُوْا غَدًا.

৮. এক বেইদুন নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বলে : আমি চাঁদ দেখেছি, তিনি বললেন তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল? সে বলল হ্যাঁ, তিনি বললেন, হে বেলাল! মানুষকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামীকাল সিয়াম সাধনা করে।

আবু দাউদ, ২৩৪০, তিরমিযী: (৬৯১, নাসায়ি ফিল কুবরা: ২৪৩৩, ২৪৩৪, ২৪৩৫, ২৪৩৬, ইবনে মাজাহ: ১৬৫২, তারা হাদীসটি বর্ণনা করেন সাম্মা ইবনে হারব সূত্রে, সে ইকরিমা থেকে, সে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে।

সাম্মাক ইবনে হারব সূত্রে বর্ণিত ইকরিমার হাদীসে ইজতেরাব রয়েছে, কখনো সে ইত্তেসাল সনদে বর্ণনা করে, কখনো মুরসাল সনদে। (নাসায়ী তার কুবরা ২৪৩৫, ও ২৪৩৬ গ্রন্থে বলেন : হাদীসটি মুরসাল)

হাফেজ ইবনে হাজার তালখিস গ্রন্থে বলেছেন : মূল বর্ণনাকারী থেকে সাম্মাক যখন একে বর্ণনা করবে, সেটা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

শায়খ আলবানি ইরওয়াউল গালিল (৯০৭) গ্রন্থে হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।

عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضی) عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ : اَلْغَنِیْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِی الشِّتَاءِ.

৯. আমের ইবনে মাসউদ নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : শীতকালীন সওম হচ্ছে ঠাণ্ডা গনিমত। অর্থাৎ কষ্টহীন পুণ্য। হাদীসটি দুর্বল।

১. আলোচ্য হাদীস ইবনে মাসউদ থেকে আহমদ, ৪/৩৩৫, তিরমিযী : ৭৯৪, ইবনে মাজাহ : ৩/৩০৯ প্রমুখগণ বর্ণনা করেছেন। এ সনদে দুটি ইল্লত : নুমাইর ইবনে আরিব অপরিচিত। দ্বিতীয়ত হাদীসটি মুরসাল।

২. আনাস ইবনে মালেক থেকে তাবরানি ফিল কাবির: ৭১৬, শাজারি তার আমালি গ্রন্থে : ২/১১১, এবং ইবনে আদি: ৩/১২১০, বর্ণনা করেছেন। এ সনদে তিনটি ইল্লত সায়িদ ইবনে বাশীর আযদি দুর্বল। ওলিদ ইবনে মুসলিম আনআনা দ্বারা বর্ণনা করছে এবং হাদীসটি মওকুফ।

অনুরূপ আরেকটি হাদীস :

শীতকাল হচ্ছে মু'মিনের বসন্তকাল" হাদীসটি দুর্বল, কিন্তু তার অর্থ সঠিক।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَحَبُّ عِبَادِيْ اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

১০. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমার নিকট প্রিয় বান্দা তারাই যারা দ্রুত ইফতার করে। (তিরমিযী : ৭০০০, আহমদ: ২/৩২৯, তিরমিযী বলেছেন : উক্ত হাদীস হাসান গরিব। শায়খ আহমদ শাকের আল-মুসনাদ: ১২/২৩১ গ্রন্থে হাদীসটি সহিহ বলেছেন, হাদীস নং ৭২৪০, এ হাদীসের সনদে কুররা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাইউল নামে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি বিতর্কিত ইমাম আহমদ বলেন, তার হাদীস খুব মুনকার্ ইমাম ইয়াহ ইবনে মায়িন বলেন : তার হাদীস দুর্বল।

ইমাম আবু জুরআহ বলেন : সে মুনকার হাদীস বর্ণনা করে।

ইমাম আবু হাতেম নাসায়ি বলেছেন : সে নির্ভরযোগ্য নয়।

ইমাম আবু দাউদ বলেছেন : তার হাদীসগুলো মুনকার।

ইমাম মুসলিম অন্যদের সাথে তার হাদীস বর্ণনা করেছেন এককভাবে তার কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : বিভিন্ন সহিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দ্রুত ইফতার করা সুন্নাত, তাতে রয়েছে উম্মতের কল্যাণ। কাজেই আমাদের উচিত এসব দুর্বল হাদীসের দিকে না তাকিয়ে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করা। যেমন :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

সাহাল ইবনে সাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মানুষ যত দিন পর্যন্ত দ্রুত ইফতার করবে, তারা কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(বুখারী : ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮)

ইবনে হাজার ফাতহুল বারি : ৪/১৯৮, গ্রন্থে বলেন : কোনো কোনো স্থানে নব সৃষ্ট ঘৃণিত কিছু বিদআত হচ্ছে রমযান মাসে ফজরের আধা ঘণ্টা বা পৌণে এক ঘণ্টা আগে আযান দেয়া, বাতি নিভিয়ে দেয়া ইত্যাদি, যা তাদের নিকট পানাহার নিষিদ্ধ হওয়ার নিদর্শন, তারা এভাবে ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে, অথচ এটা যে তাদের নিকট পানাহার বন্ধ করার আলামত অনেকে তা জানে। বস্তুত এভাবে তারা নিশ্চিত সময়ের আশায় বিলম্বে আযান দেয়, ফলে তাদের ইফতার হয় দেরিতে, আর সেহরি হয় দ্রুত। তারা এভাবে সুন্নাতের বরকত ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য তাদের মধ্য কল্যাণের সংখ্যা খুব কম, অনিষ্ট অনেক বেশি। আল্লাহ সাহায্যকারী।

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِالْاِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ.

১১. নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি ঘুমের সময় সুগন্ধি যুক্ত সুরমার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সওম পালনকারীর এর থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

আবু দাউদ ২৩৭৭, বুখারী ফিত তারিখিল কাবির : ৭/৩৯৮, আবু দাউদ বলেছেন : আমাকে ইয়াহ ইয়া ইবনে মায়িন বলেছেন : এটা মুনকার হাদীস, অর্থাৎ সুরমার হাদীস।

জায়লায়ি লিখেছেন : তানকিহ এর লেখক বলেছেন : মাবাদ ও তার ছেলে উভয় অপরিচিত, আর আব্দুর রহমানকে ইবনে মায়িন দুর্বল বলেছেন, আবু হাতেম আমাকে বলেছে সে সাদুক। (জায়লায়ি : ২/৪৫৭)

ইমাম তিরমিযী সুরমা বিষয়ে বলেন : এ অধ্যায়ে নবী করীম ﷺ থেকে কোনো হাদীস প্রমাণিত নয়।

আরেকটি হাদীস : لاَ تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَاَنْتَ صَائِمٌ.

সওম অবস্থায় দিনে সুরমা ব্যবহার কর না।"

আবু দাউদ ২৩৭৭, ইবনে মায়িন বলেছেন : এটা মুনকার হাদীস। সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস :

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اِشْتَكَتْ عَيْنِىْ اَفَاَكْتَحِلُ وَاَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ : نَعَمْ -

আনাস ইবনে মালেক বলেন : "এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলেন : আমার চোখে সমস্যা আমি সওম অবস্থায় সুরমা লাগাতে পারব? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিরমিযী : ৭২৬ তিনি বলেন আনাসের হাদীসের সনদ শক্তিশালী নয়। এ অধ্যায়ে নবী করীম ﷺ থেকে সহীহ কোনো বর্ণনা নেই, আবু আতেকাকে দুর্বল বলা হয়। আবু আতেকার মূল নাম হচ্ছে তারিফ ইবনে সালমান, তাকে সালমান ইবনে তারিফও বলা হয়।

আবু হাতেম বলেছেন সে হাদীস ভুলে যায়।

বুখারী বলেছেন : তার হাদীস মুনকার।

নাসায়ি বলেছেন : সে নির্ভরযোগ্য নয়।

দারাকুতনি বলেছেন : দুর্বল।

ইবনে হিব্বান বলেছেন : তার হাদীস খুব মুনকার। সে আনাস থেকে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যা তার হাদীসের অনুরূপ নয়, আবার কখনো তার থেকে এমন হাদীস নকল করে, যা তার হাদীস নয়।

সুরমা বিষয়ক আরেকটি হাদীস :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ -

মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ নিজ পিতা থেকে, সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন। ইবনে খুযাইমা : ২০০৮, হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ، وَنَزَلْتُ مَعَهُ، فَدَعَانِىْ بِكُحْلٍ اِثْمَدَ، فَاكْتَحَلَ فِىْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ اِثْمَدَ غَيْرِ مُمْسِكٍ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার আসেন, আমিও তার সাথে। **তিনি আমাকে ইসমিদের সুরমা আনতে বললেন, অত:পর তিনি সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করলেন। এ** ইসমিদ দেহের সাথে আঠার ন্যায় লেগে থাকা ইসমিদ নয়।

ইবনে খুযাইমা বর্ণনা করে বলেন : আমি কোনো দায়ভার নিচ্ছি না যে, এ সনদ মা'মার থেকে। অর্থাৎ এ মা'মার বর্ণনা করেছেন এর নিশ্চয়তা আমি দিতে পারবে না।

হাফেজ ইবনে হাজার তালখিস গ্রন্থে বলেন, ইবনে আবি হাতেম তার পিতা থেকে বলেছেন : এটা মুনকার হাদীস, তিনি মুহাম্মাদের বিষয়ে বলেছেন : তার হাদীস মুনকার, বুখারী অনুরূপ বলেছেন। আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওম পালনকারীদের সুরমা থেকে বিরত রাখার হাদীসগুলো বিশুদ্ধ নয়।

সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা জায়েয। জুমহুর আলেমদের দিকট নারী-পুরুষ সকলে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে সওম অবস্থায়।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّقِيْفَةِ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ يَقُوْلُ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ -

১২ . কাব ইবনে আসেম আশ'আরি (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। সফরে সওম পালন করা নেকির কাজ নয়। আহমদ : ৫/৪৩৪, তাবরানি ফল কাবির : ১৯/১৭২, হাদীস নং ৩৮৭, তাবরানি ইমাম আহমদের সন্তান আব্দুল্লাহ্ সূত্রে ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন এ শব্দে :

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّصِيَامُ فِى الْسَّفَرِ -

হাদীসটি বায়হাকি তার সুনান : ৪/২২, গ্রন্থে আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে বর্ণনা করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার তালখিসুল হাবিব : গ্রন্থে বলেছেন : ইমাম আহমদ কাব ইবনে কাসেম আশআরি থেকে এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেন।

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ -

এটা ইয়ামানের এক অঞ্চলের ভাষা, তারা মারেফার লাম, নির্দিষ্ট করণের লাম) "মিম" দ্বারা পরিবর্তন করে বলে। এমনও হতে পারে রাসূলে করীম ﷺ তাকে এভাবে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু এটা তার আঞ্চলিক ভাষা। আবার এমনও

হতে পারে আশআরি তা নিচের আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তন করে ব্যক্ত করেছেন। আর বর্ণনাকারীরা আশআরি থেকে তার শব্দ বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অভিমতটি আমার নিকট অধিক যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্ ভালো জানেন।'

إِنِّيْ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا .. رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِيْ يَلْهَثُ عَطَشًا كُلَّمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنِعَ وَطُرِدَ . فَجَاءَهُ صِيَامُهُ فَسَقَاهُ وَأَرْوَاهُ .

১৩. আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা আত-তাওয়িল এর হাদীস : আমি গত রাতে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি; আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখলাম পিপাসায় কাতরাচ্ছে যখনই সে আমার হাওজের নিকট আগমন করে তাকে নিষেধ করা হয় ও তাড়িয়ে দেয়া হয়, অত:পর তার সওম এসে তাকে পান করায় ও তার তৃষ্ণা নিবারণ করে।" তাবরানি দুটি সনদে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তার একটি সনদে রয়েছে সুলাইমান ইবনে আহমদ আল-ওয়াসেতি, আর অপরটি আছে খালেদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-মাখজুমি, তারা উভয়ে দুর্বল। দেখুন : ইতহাফুস সাদাতুল মুত্তাকিন: ৮/১১৯, ইবনে রজব হাদীসটি দুর্বল করেছেন।

اَلصَّائِمُوْنَ يُنْفَخُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ رِيْحَ الْمِسْكِ، وَيُوْضَعُ لَهُمْ مَائِدَةَ تَحْتَ الْعَرْشِ .

১৪. সওম পালনকারীদের মুখ থেকে মিসকের সুগন্ধি বের হবে এবং আরশের নিচে তাদের জন্য দস্তরখান বিছানো হবে "সুয়ূতি দুররুল মানসুর, ১/১৮২ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন , ইবনে রজম প্রমুখগণ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।

اَلصَّائِمُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهٗ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ .

১৫. সওম পালনকারীর নিকট যখন খাওয়া হয়, তার জন্য ফেরেশতাগণ তখন ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে।
(ইবনে খুজাইমা, তিরমিযী: ৭৮৪, ইবনে মাজাহ; ১৭৪৮, তায়ালিসি: ১৬৬৬, এ হাদীসটি দুর্বল। দেখুন : "সিলসিলাতুন আহাদিসুস দায়িফাহ" ১৩৩২)

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ .

১৬. সিয়াম সাধনাকারীর ঘুম ইবাদত হাদীসটি ইমাম সুয়ূতি "জামে সাগির: ৯২৯৩, গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বায়হাকির বরাতে উল্লেখ করে, বর্ণনাকারী

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফার কারণে হাদীসটি দুর্বল বলেন। জায়নুদ্দিন ইরাকি, বায়হাকি ও সুয়ূতি প্রমুখগণ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।

(দেখুন : আল-ফিরদাউস : ৪/২৪৮, ইতহাফুস সাদাত ৪/৩২২)

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهْرُ.

১৭. অনেক সিয়াম সাধনাকারী আছে, যাদের সওম হচ্ছে ক্ষুধা ও পিপাসা। অনেক রাত জাগরণকারী আছে, যাদের রাত জাগা হচ্ছে শুধু বিনিদ্রা রাত কাটানো। ইবনে মাজাহ : ১৬৯০, এর সনদে উসামা বিন যায়েদ আদাভি রয়েছে যে দুর্বল। তবে হাদীসের অর্থ সিয়াম সাধনা।

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِيْ جَمَاعَةٍ فِىْ رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

১৮. রমযানে এশার সালাত যে জামায়াতের সাথে আদায় করল, সে লাইলাতুল কদর লাভ করল। ইস্পাহানি ও আবু মূসা মাদিনী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালেক তার মুয়াত্তা ১/৩২১, গ্রন্থে হাদীসটি বালাগানি বলে উল্লেখ করেছেন, এটা মূলত ইবনুল মুসাইয়্যিব এর বক্তব্য। ইবনে খুযাইমাহ : ২১৯৫, ইবনুল মাদিনি বলেছেন, এর সনদে বিদ্যমান উকবা ইবনে আবিল হাসনা অপরিচিত সে দুর্বল।

كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَاغْتَسَلَ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ، وَجَعَلَ الْعِشَاءَ سَحُوْرًا.

১৯. রমযানের শেষ দিন আসলে রাসূলে করীম ﷺ স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকতেন ও দুই আযানের মধ্যবর্তী গোসল করতেন এবং রাতের খাবারকে সেহরি হিসেবে খেতেন। হাদীসটি বাতিল, এ সনদে হাফস ইবনে ওয়াকেদ রয়েছে। ইবনে আদি বলেছেন : আলোচ্য হাদীসটি আমাদের দেখা সব চেয়ে বেশি মুনকার। আরো কয়েকটি সনদে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি দুর্বল।

مَنْ صَامَ بَعْدَ الْفِطْرَ يَوْمًا فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ، وَحَدِيْثُ :

اَلصَّائِمُ بَعْدَ رَمَضَانَ كَالْكَارِ بَعْدَ الْفَارِ.

২০. ঈদুল ফিতরের পর যে ব্যক্তি একদিন সওম রাখল, সে যেন সারা বছর সওম পালন করল। হাদীস "রমযানের পর সওম পালনকারী পলায়নের পর ফিরে আসা ব্যক্তির ন্যায়। দেখুন কানজুল উম্মাহ : ২৪১৪২, মূলত: এটি কোনো বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়নি।

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَالْاَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২১. যে ব্যক্তি রমযান, শাওয়াল, বুধবার ও বৃহস্পতিবার সওম পালন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আহমদ; ৩/৪১৬, এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি, হাদীসটি দুর্বল এতে সন্দেহ নেই।

ذَاكِرُ اللّٰهِ فِيْ رَمَضَانَ مَغْفُوْرٌ لَهُ.

২২. রমযানে আল্লাহকে স্মরণকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত। হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সুয়ূতি জামেউস সাগির: ৪৩১২, গ্রন্থে, আওসাত গ্রন্থে তিনি তাবরানির বরাতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আরো উল্লেখ করেছেন বায়হাকি "শুআবুল ঈমান" গ্রন্থে। আলোচ্য হাদীসের সনদে হিলাল ইবনে আব্দুর রহমান বিদ্যমান সে দুর্বল।

اِسْتَعِيْنُوْا بِطَعَامِ السَّحْرِ عَلٰى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُوْلَةِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ.

২৩. তোমরা সেহরি দ্বারা দিনের সওম এবং দিনের কায়লুলা দ্বারা রাতের কিয়ামের জন্য সাহায্য গ্রহণ কর। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাকেম ও ইবনে মাজাহ, উক্ত হাদীসের সনদে জামআহ ইবনে সালেহ ও সালমা ইবনে হিরাম বিদ্যমান, তারা উভয়ে দুর্বল, তাই হাদীসও দুর্বল।

ثَلاَثَةٌ لاَ يَفْطُرْنَ الصَّائِمُ : اَلْحَجَّامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلَامُ.

২৪ তিনটি বস্তুর কারণে সিয়াম সাধনাকারী সওম ভঙ্গ হবে না; শিঙ্গা, বমি ও স্বপ্ন দোষ। (তিরমিযী : ৮১৯, তিনি হাদীসটি দুর্বল বলেছেন।)

স্বপ্ন দোষের কারণে সওম ভঙ্গ হবে না।

تُحْفَةُ الصَّائِمِ الدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ -

২৫. সওম পালনকারীর হাদিয়া হচ্ছে তৈল ও ধুপদানি। তিরমিযী : ৮০১, তিনি হাদীসটি দুর্বল বলেছেন, উক্ত সনদে বিদ্যমান সাদ ইবনে তারিফ যয়ীফ।

اِنَّ لِلّٰهِ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ سِتَّمِائَةِ اَلْفُ عَتِيْقٌ مِنَ النَّارِ، فَاِذَا كَانَ اٰخِرُ لَيْلَةٍ اَعْتَقَ اللّٰهُ بِعَدَدِ مَامَضٰى -

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ প্রতি রাতে ছয় রাখ লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, যখন সর্ব শেষ রাত আসে, তখন তিনি পূর্বের সমপরিমাণ মুক্ত করেন। বায়হাকি, এটা মুরসাল, হাসান বসরির কথা।

خِصَاءُ اُمَّتِىْ الصِّيَامُ -

২৭. আমার উম্মতের নপুংসকতা হচ্ছে সওম। আলবানি "মিশকাতুল মাসাবিহ" ১/২২৫, গ্রন্থে বলেন : এর সনদ জানতে পারিনি, কিন্তু শায়খ ক্বারি: ১/৪৬১, মিরাক থেকে বলেন, এতে সমস্যা রয়েছে।

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ -

২৮. সওম ধৈর্যের অর্ধেক। এর সনদে মূসা ইবনে উবাইদাহ বিদ্যমান তার দুর্বলতার বিষয়ে সবাই একমত। তিরমিযী: ৩৫১৯, ইবনে মাজাহ : ১৭৪৫, আহমদ ও বায়হাকি। আলবানী দায়িফুল জামে গ্রন্থে হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন।

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْعِيْدِ، وَفِىْ لَفْظٍ : مَنْ اَحْيَاهَا مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهٗ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ -

২৯. যে ঈদের রাত জাগ্রত থাকে অন্য বর্ণনায় আছে: যে ব্যক্তি ঈদের রাত সওয়াবের নিয়তে জাগ্রত থাকে, তার অন্তর মৃত্যুবরণ করবে না, যে দিন সকল অন্তর মারা যাবে।' ইবনে মাজাহ এ হাদীস দুর্বল।

لَيْسَ فِى الصَّوْمِ رِيَاءٌ -

৩০. সওমে রিয়া বা লৌকিকতা নেই। সনদটি দুর্বল।

صِيَامُ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ كَصِيَامِ أَلْفِ شَهْرٍ فِيْمَا سِوَاهُ، وَفِيْ لَفْظٍ : خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْبُلْدَانِ ـ

৩১. মদিনায় এক রমযান সওম, অন্যান্য শহরে হাজার মাসের সওমের সমান। অন্য বর্ণনায় আছে; পৃথিবীর অন্যান্য শহরে হাজার রমযানের তুলনায় উত্তম। বায়হাকি, তিনি হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। তাবরানি ফিল কাবির, দিয়া ফিল মুখতারাহ। হায়সামি বলেছেন : আলোচ্য হাদীসের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে কাসির বিদ্যমান সে, দুর্বল। ইমাম যাহারী তার মিজানুল ই'তিদাল গ্রন্থে বলেছেন : এর সনদ অন্ধকার।

سَيِّدُ الشُّهُوْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُوالْحِجَّةِ ـ

৩২, সকল মাসের নেতা হচ্ছে রমযান, সবচেয়ে বেশি সম্মানিত হচ্ছে জিলহজ্জ। (বাযযার ও দায়লামি। হাদীসটি সঠিক নয়।)

اِنَّ فِى السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ اسْتَأْذَنُوْا رَبَّهُمْ اَنْ يَحْضُرُوْا مَعَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَلاَةَ التَّرَاوِيْحِ ـ

৩৩. আসমানে এত বেশি ফেরেশতা রয়েছে, যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, যখন রমযান আগমন করে তখন তারা উম্মতে মুহাম্মদির সাথে রমযানের তারাবীতে শরীক হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে"।

বায়হাকি ফি শুআবুল ঈমান : ৩/৩৩৭, তিনি আলির কথা হিসেবে এটা বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতি দুররুল মানসুর : ৮/৫৮২, একে দুর্বল বলেছেন। কানজুল উম্মাল : ৮/৪১০)

اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَهُ فِطْرُهُ دَعْوَةٌ لاَتُرَدُّ ـ

৩৪. সিয়াম সাধনাকারীর ইফতারের সময় দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না। আহমদ : ২/৩০৫, তিরমিযী: ৩৬৬৮, ইবনে খুযাইমাহ: ১৯০১, ইবনে মাজাহ: ১৭৫২, এ হাদীসের সনদে বিদ্যমান ইসহাক ইবনে উবাদুল্লাহ মাদানী অপরিতি।

ইবনুল কাইয়্যেম হাদীসটি যাদুল মায়াদ গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। হাদীসটি দুর্বল।

জ্ঞাতব্য : আলেমদের সহীহ অভিমত অনুযায়ী দুর্বল হাদীসের ওপর আমল করা যাবে না, না ফাযায়েলে, না আহকামে, না অন্য কোনো ব্যাপারে। আমরা শুধু তারই অনুসরণ করব, যা নবী করীম ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। দুর্বল হাদীস নবী ﷺ সাথে সম্পৃক্ত করা নাজায়েয, তবে মানুষদের জানানোর জন্য ও দুর্বলতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হলে তা বর্ণনা করা যাবে। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার ওপর যে এমন কথা বলল, যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়। আল্লাহ ভালো জানেন।

* রজব মাসের ফযীলত সম্পর্কিত জাল হাদীস

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এর নামে বর্ণিত একটি জাল হাদীসে আছে, নবী ﷺ নাকি বলেন, রজব আল্লাহর মাস এবং শা'বান আমার মাস আর রমযান উম্মাতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের রোযা রাখে তার জন্য আল্লাহর মহাসন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দেবেন।

উক্ত বর্ণনাটি বিরাট বর্ণনা। ওতে এ বর্ণনাও আছে, যে ব্যক্তি রজবের মাসে দু'টি থেকে পনেরোটি রোযা রাখবে তার নেকী পাহাড়ের মতো হবে। ...... সে কুষ্ঠ ও শ্বেত এবং পাগলামি রোগ থেকে মুক্তি পাবে। .... জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে। .... জান্নাতের আটটি দরজা তার জন্য খোলা হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র) বলেন, এ হাদীসটি জাল।

(আললাআ-লিল মসনূআহ ফিল আহা-দীসিল মওযূআহ ২য় খণ্ড-১১৪-১১৫ পৃ.)

সাহাবী আনাস (রা)-এর নামে বর্ণিত আর এক জাল হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি সিয়াম রাখবে তার জন্য আল্লাহ এক মাসের সিয়াম লিখে দেবেন.....।

http://islamiboi.tk

এর একজন বর্ণনাকারী 'আমর ইবনে আযহাব হাদীস জাল করত।

(আললাআ-লিল মসনূআহ ফিল আহা-দীসিল মওযুআহ ২য় খণ্ড-১১৪-১১৫ পৃ.)

তাই এ হাদীসটি জাল। আনাসের নামে অন্য বর্ণনায় আছে, রজবের একটি রোযা এক বছর সিয়ামের মতো। ..... এ রজব মাসে নূহ (আ) জাহাজে চড়েন। তাই তিনি রোযা রাখেন এবং তিনি তাঁর সাথীদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন। .... ইবনে আসা-কিরের বর্ণনায় আছে, নূহ (আ) এবং তাঁর সাথী ও জন্তুরাও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রোযা রেখেছিলেন রজবের প্রথম তারিখে। আল্লামা সুয়ূতী এ বর্ণনাগুলো তাঁর রচিত উক্ত জাল হাদীসগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(আললাআ-লিল মসনূআহ ফিল আহা-দীসিল মওযুআহ ২য় খণ্ড-১১৬-১১৭ পৃ.)

সুতরাং এসব হাদীসই জাল।